পালিভাকস
প্রোতাভোস

স্টুডেন্ট / স্কুল লাইব্রেরী সিরিজ

কুয়াশা-র
বই

জোনাথন সুইফট

গালিভারস ট্রাভেলস

সম্পূর্ণ অনুবাদ

ভাষান্তর: চিরঞ্জীব সেন
প্রচ্ছদ / অলঙ্করণ: সন্তোষ গুপ্ত

SCHOOL LIBRARY SERIES

GULLIVER'S TRAVELS

Complete translation for teen-agers

by : CHIRANJIB SEN

প্রকাশিকার নিবেদন ৭
জোনাথন সুইফ্‌ট ৯

কোন্ কাহিনী কোন্ পাতায়

১। লিলিপুটদের দেশে ১৫
২। ব্রবডিংনাগদের দেশে ৭৯
৩। লাপুটা, বালনিবারবি, লাগনাগ, গ্লাবডাবড্রিব এবং জাপান ভ্রমণ ১৫১
৪। হুঁইনহঁমদের দেশে ২১৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী—১৯৩৮

কসমো স্ক্রিপ্ট, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯-এর পক্ষে তাপসী সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীদুর্গা প্রিণ্টার্স, ৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীদীপক কুমার ভুঞ্যা কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশিকার নিবেদন

কিশোর সাহিত্য বলতে আজও যে সব বইয়ের নাম মনে পড়ে তার মধ্যমণি 'গালিভারস্ ট্র্যাভেলস্'। লিলিপুটদের কথা আজও ঘুমপাড়ানি গল্পের মতো কিন্তু সে তো চার ভ্রমণ কাহিনীর একটি। আর এক কাহিনীতে গালিভার নিজেই লিলিপুট। আরো একটিতে অদ্ভুত এক ভাসমান দ্বীপের কথা—যেখানে জ্যামিতিক আকারের যাবতীয় খুটিনাটি, সমুদ্রের বুকে ঈগল পাখীর মতো দ্বীপটি উড়ে বেড়ায়। ছিপ ফেলে ফেলে মাঝে মাঝে বাসিন্দারা তোলে মাছ। এ ছাড়াও আছে আরো একটি চমকদার দেশের কাহিনী। যেখানে প্রভু হুইনহ্ম অর্থাৎ একটি অশ্বের সঙ্গে অনেক মনের কথার আদান প্রদান করেছে গালিভার। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের প্রতিটি ছত্রই কিশোরদের উপযোগী। পাতায় পাতায় ছবিতে ভরপুর। এর আগে এমন ভাবে এ গ্রন্থের অনুবাদ হয়নি।

এই অনুবাদে সক্রিয় সহযোগিতা করার জন্য শ্রী প্রদীপ কুমার সেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—তাপসী সেনগুপ্ত

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন শহরে জোনাথন সুইফট জন্মগ্রহণ করেন। পিতারও নাম জোনাথন সুইফট। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরে পুত্র জোনাথন সুইফট জন্মগ্রহণ করে। পিতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, শুধু জানা যায় যে তাঁর নাম ছিল রেভারেণ্ড টমাস। সুইফট ধর্মযাজক ছিলেন কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের সমর্থক ছিলেন বলে তিনি নিপীড়িত হয়ে দেশ-ত্যাগ করে আয়ারল্যাণ্ডে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। আয়ারল্যাণ্ডে এসে তিনি ইংল্যাণ্ডের লিস্টার জেলার মেয়ে অ্যাবিগেল এরিককে বিয়ে করেন। স্বামী মারা যাবার পর অ্যাবিগেল খুব দুর্দশায় পড়েছিল।

ছোট জোনাথন সুইফটকে তার ধাইমা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যায়। সেখানে হোয়াই হ্যাভেন গ্রামে কিছুকাল বসবাস করার পর জোনাথনের বয়স চার বৎসর হলে তার ধাইমা তাকে আবার আয়ারল্যাণ্ডে ফিরিয়ে এনে তার কাকা গডউইন সুইফটের জিম্মায় করে দেন। জোনাথনকে কাকা কিলকেনিতে ইস্কুলে পড়তে পাঠান। চৌদ্দ বছর বয়সে জোনাথন ডাবলিনে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনদিনই তার সুনাম ছিল না। ১৬৮৫ সালে বিশেষ গ্রেস নম্বর পেয়ে সে কোনরকমে ডিগ্রি লাভ করে। ১৬৮৮ পর্যন্ত জোনাথন ট্রিনিটি কলেজে ছিল তারপর লিস্টারে গিয়ে মায়ের সঙ্গে কিছুদিন (১৬৮৯) বাস করেছিল। তারপর ফার্নহ্যামের কাছে মুর পার্কে স্যার উইলিয়ম টেম্পল নামে কূটনীতিকের সেক্রেটারির চাকরি পায়। ভদ্রলোকের সাহিত্যিক হিসাবে কিছু খ্যাতি ছিল। মাঝে দু'বার বিরতি ব্যতীত (১৬৯০-৯১) অ্যায়ারল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন 'হোলি অর্ডার' গ্রহণ করতে এবং ১৬৯৪-৯৫ সালে প্রায় পনেরো মাস বেলফাস্টের কাছে কিলরুট এ ছিলেন। তিনি ১৬৯৯ পর্যন্ত মুর পার্কে ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত মিঃ টেম্পলের দক্ষিণ হস্ত রূপে বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন।

কর্মসূত্রে তাকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হত (ফলে কলেজে শিক্ষার ঘাটতি পূরণ হয়ে গিয়েছিল) এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে (রাজা তৃতীয় উইলিয়ম অন্যতম) আসতে হয়েছিল যার ফলে তিনি রাজনীতি ও সামাজিক ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এই মুর পার্কেই তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল এসথার জনসনের সঙ্গে—বলা হয় ইনি নাকি স্যার উইলিয়ম টেম্পলের অবৈধ কন্যা—যিনি তাঁর জীবনের অনেকটা অংশ জুড়ে ছিলেন। এসথারই হল সুইফট এর 'জর্নাল'-এর স্টেলা। তাঁদের প্রথম সাক্ষাতের সময় এসথারের বয়স ছিল আট বছর এবং সুইফট এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল শিক্ষক ও ছাত্রীর।

কাব্যরচনা নিয়ে সুইফট এর সাহিত্যজীবন শুরু এবং গোড়ার দিকের তিনটি দীর্ঘ রচনা তাঁর কাব্য সংকলনে স্থান পেয়েছে। গালিভারস ট্র্যাভেলস বাদ দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বিদ্রুপাত্মক রচনা 'এ টেল অফ এ টাব' ১৬৯৭-৯৯ সালে লেখেন। এই সময়েই তিনি আরও দুটি ছোট রচনা 'ব্যাটল অফ দি বুকস' এবং 'মেকানিক্যাল অপারেশন অফ দি স্পিরিট' লেখেন। এই তিনটি বই একত্রে ১৭০৪ সালে প্রকাশিত হয়।

১৬৯৯ সালে স্যার উইলিয়ম টেম্পল মারা যান। সুইফটের নামে কিছু সম্পত্তি এবং তাঁর স্মৃতিকথা 'মেময়ারস' বিক্রির লভ্যাংশও উইল করে যান। ঐ বছরেই হেমন্ত-কালে সুইফট আয়ারল্যাণ্ডের অন্যতম লর্ড জাস্টিস আর্ল অফ বার্কলের পারিবারিক পাদ্রী নিযুক্ত হন। তাঁরই আনুকুল্যে যথাসময়ে ডাবলিনের কাছে লারাকর গ্রাম-বাসীদের এবং সেন্ট প্যাট্রিকস ক্যাথিড্রাল থেকে সুইফট খ্রীষ্টীয় ধর্মপালন বাবদ নিয়মিত উপস্বত্বের অধিকারী হন। প্রথমে তিনি 'ডাবলিন ক্যাসল'-এ যেয়ে বাস করতে থাকেন এবং পরে লারাকর গ্রামের ধর্মযাজকের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় উঠে যান এবং সেখানে তিনি কিছুকাল সাধারণ পাদ্রী হিসাবে বাস করেন। তিনি প্রায়ই ডাবলিন যেতেন এবং ওখান থেকে তিনি ডক্টর অফ ডিভিনিটি ডিগ্রী লাভ করেন ও অচিরে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন।

১৭০১ সালে এসথার জনসনের (স্টেলা) বয়স যখন কুড়ি তখন সে এবং তার বান্ধবী রেবেকা ডিংলে লারাকরের কাছে বাস করতে আসে এবং এই সময় থেকে সুইফট ও 'স্টেলা'র মধ্যে এমন একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা তারা অব্যাহত রেখেছিল। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সুইফট একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। অবশ্য এই অনিচ্ছুকতার সমর্থনে সুইফটের যুক্তি থাকলেও তার মানসিক গঠনও ছিল বিবাহের বিরুদ্ধে। সুইফট নানারকম মানসিক বৈকল্যতে ভুগতেন তার ওপর সাময়িক বধিরতা, মাথাঘোরা এবং বমনেচ্ছায় ভুগতেন, বর্তমানে যে রোগকে মেনিয়ারাস ডিজিজ বলা হয় সেই রোগ আর কি।

১৭০১ থেকে ১৭০৪-এর মধ্যে সুইফট কয়েকবার লিস্টার এবং লণ্ডনে গিয়ে-ছিলেন এবং অ্যাডিসন, পোপ ও স্টীল-এর বন্ধুত্ব লাভ করেন। তাঁর লণ্ডন পর্যায় (লণ্ডন পিরিয়ড) আরম্ভ হয় ১৭০৭ সালে। এই বছর সরকারী চার্চ মিশনে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়েছিল। তিনি তাঁর অভীষ্ট কাজ শেষ করেন নি। যাইহোক তাঁর অনেক বন্ধু জুটেছিল এবং রসিক ব্যক্তি ও 'এটেল অফ এ টাব' গ্রন্থের রচয়িতা রূপে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। লণ্ডনে বাস করবার সময় তিনি চার্চ সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন নিয়ে কয়েকখানি পুস্তিকা এবং লণ্ডন-জীবন নিয়ে কয়েকটি কবিতা লেখেন যেগুলি 'ট্যাটলার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৭০৯ সালে তিনি আয়ারল্যাণ্ডে ফিরে আসেন কিন্তু পরের বছরেই হেমন্তে তাঁকে আবার লণ্ডনে ফেরত পাঠান হয়। এই দ্বিতীয়বার লণ্ডনে থাকবার সময় তিনি প্রবল রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়েন এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথমে তিনি ছিলেন 'হুইগ' দলে পরে 'টোরি' দলে চলে গিয়ে 'একজামিনার' পত্রিকায় (ভাইকাউন্ট বলিংব্রুক প্রতিষ্ঠিত সাময়িক পত্রিকা) প্রবন্ধ এবং কয়েকটি পুস্তিকা যথা 'দি কন্ডাক্ট অফ দি অ্যালিজ' (১৭১১) এবং 'দি পাবলিক স্পিরিট অফ দি হুইগস' মারফত টোরিদলকে আক্রমণ করতে থাকেন। প্রথমোক্ত পুস্তিকাটি রাজনৈতিক প্রচার কৌশলের মধ্যে সর্বকালের তীক্ষ্ণতম পুস্তিকা হিসেবে স্বীকৃত। জনমতের ওপর পুস্তিকাটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে ফলে স্পেনের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ থেকে ইংলন্ড সরে আসে এবং ১৭১৩ সালে ইট্রেক্ট শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

খ্রীশ্চান ধর্ম সম্বন্ধে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সরকারের অনুকূলে প্রচুর কাজ করা সত্বেও সুইফট কিন্তু ইংলন্ডের ডীন পদবী এমন কি বিশপের মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি যদিও তা পাওয়া তাঁর পক্ষে উচিত ছিল। যাইহোক ১৭১৩ সালে তাঁকে কিছু স্বীকৃতি দেওয়া হয়, লর্ড অক্সফোর্ডের চেষ্টায় তাঁকে ডাবলিনের সেন্ট প্যাট্রিকস চার্চের ডীন-এর মর্যাদা দেওয়া হয়। পরের বছর কুইন অ্যান-এর মৃত্যু হয় এবং হুইগ দল মন্ত্রীত্ব গঠন করে। এর অর্থ লন্ডনে সুইফটের রাজনৈতিক প্রভাবের অবসান এবং সেই সঙ্গে তাঁর সকল আশা আকাংখার মৃত্যু। ইংলন্ড ছিল তাঁর আধ্যাত্ম ও চিন্তা শক্তি বিকাশের বাসভূমি আর আয়ারল্যান্ডে ফিরে আসা মানে নির্বাসনে যাওয়া।

ইংলন্ডে থাকাকালীন সুইফট এসথার জনসনকে পরপর অনেক চিঠি লিখেছিলেন অধিকাংশই দিনলিপি হিসেবে। এই চিঠি লেখার কাল ছিল ১৭১০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৭১৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত। এই চিঠিগুলি বই আকারে 'জর্নাল টু স্টেলা' নামে প্রকাশিত হয়ে রসিক সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছিল। ইংলন্ডে থাকবার সময় সুইফট আর একটি যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তারও প্রথম নাম এসথার, এসথার ভ্যানোম্রাই ('ভ্যানেসা')। এই যুবতীটিকেও সুইফট অনেক চিঠি লিখেছিল এবং 'ক্যাডিনাম অ্যান্ড ভ্যানেসা' নামে একটি কবিতাও লিখেছিল। 'ভ্যানেসা' প্রবলভাবে সুইফটের প্রেমে পড়েছিল এবং তার সঙ্গে আয়ারল্যান্ডেও গিয়েছিল। 'স্টেলা' এবং 'ভ্যানেসা' ডাবলিনে বা কাছেই বাস করত কিন্তু পরস্পরের অস্তিত্ব জানত না। এই দুই মহিলার সঙ্গে সুইফটের সম্পর্ক সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা প্রগাঢ় ছিল তবু সুইফট নাকি একে প্রেম বলত না। সুইফট সম্ভবতঃ 'স্টেলা'কে গোপনে বিবাহ করেছিল কিন্তু তার সঙ্গে কখনও একত্রে বাস করে নি। ১৭২৩ সালে 'ভ্যানেসা' মারা যায় আর 'স্টেলা' পাঁচ বছর পরে।

সেন্ট প্যাট্রিকের ডীন হিসেবে এবং কয়েকজন বন্ধু পরিবৃত হয়ে সুইফট তার অবসর জীবন যাপন করত। আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে সুইফট তার প্রচুর ক্ষমতা ব্যয় করেছিল যার ফলে অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর লিখিত "ড্রেপিয়ারস লেটার" আয়ারল্যান্ডে 'উডস হাফ পেন্স'-এর প্রচলন বন্ধ

করেছিল যার জন্যে তিনি জাতীয় বীরের সম্মান অর্জন করেছিলেন। এরপর থেকে আইরিশদের কাছে তিনি শুধুই 'দি ডীন' নামে পরিচিত হতেন।

'গ্যালিভারস ট্র্যাভেলস' প্রকাশের জন্যে তিনি ১৭২৬ সালে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন যা তিনি পাঁচ বছর আগে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। এই একমাত্র বই যা লিখে তিনি প্রকাশকের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছিলেন (২০০ পাউণ্ড)। বই প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাফল্য। ১৭২৭ সালে তিনি আবার ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। পোপের কাছে থাকতেন, আগেও তাই থাকতেন। পরের বছরে স্টেলা মারা যায়।

এরপর কয়েক বছর সুইফটের জীবন অপরিবর্তিতভাবে চলতে থাকে। অনেক কবিতা লিখতেন এবং চার্চ ও আইরিশ সমস্যা নিয়ে প্রচারপত্রও লিখতেন। ইংলণ্ডে বন্ধুদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন এবং তাদের গ্রামের বাড়িতে যাওয়া আসাও করতেন। ক্রমশঃ দৈহিক পীড়ায় তিনি জর্জরিত হয়ে পড়েন ফলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, অসামাজিক হয়ে পড়েন অদ্ভুত সব চিন্তা করতেন এবং মাঝে মাঝে দপ্ করে রেগে উঠতেন। তাঁর ভয় ছিল তিনি বুঝি উন্মাদ হয়ে যাবেন এবং তাই হয়েছিলেন তবে তখন তার শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছিল।

১৭৪৫ সালের ১৯ অকটোবর তাঁর মৃত্যু হয়। সেণ্ট প্যাট্রিক ক্যাথিড্রালে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। কবরের ওপরে স্মৃতিস্তম্ভে যে কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে তা তিনি নিজেই লিখে রেখে গিয়েছিলেন।

এইচ ডি আর।

প্রথম ভাগ

লিলিপুটদের দেশে

প্রথম পরিচ্ছেদ

লেখক তাঁর নিজের এবং তাঁর পরিবারের কিছু ইতিহাস দিচ্ছেন। তাঁর প্রথম আগ্রহ। জাহাজ ডুবি হল, প্রাণ বাঁচাতে সাঁতার কাটতে হল, নিরাপদ তীরে পৌঁছলেন কিন্তু দেশটা হল লিলিপুটদের। বন্দী হলেন, লিলিপুটরা তাদের দেশে লেখককে নিয়ে গেল।

নটিংহ্যামশায়ারে আমার বাবার ছোট একটা জমিদারী ছিল, আমি হলুম বাবার পাঁচ ছেলের মধ্যে তৃতীয়। আমার বয়স যখন চৌদ্দ তখন বাবা আমাকে কেমব্রিজে এমানুয়েল কলেজে পাঠালেন। সেখানে আমি তিন বছর ছিলুম এবং বেশ মন দিয়েই লেখাপড়া করছিলুম। কিন্তু কলেজে পড়ার আমার যে খরচ (যদিও আমার জন্য বরাদ্দ অর্থ যৎসামান্যই ছিল) বাবার আয়ের তুলনায় বেশী ছিল। অতএব আমার পড়া বন্ধ হল এবং আমাকে বাধ্য হয়েই লণ্ডনের বিখ্যাত সার্জন মিঃ জেমস বেটসের কাছে শিক্ষানবিশির কাজ নিতে হল। মিঃ বেটসের কাছে আমি চার বছর ছিলুম। বাবা আমাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাতেন। আমি সেই টাকায় জাহাজ চালানর বিদ্যা এবং দেশ ভ্রমণে কাজে লাগতে পারে গণিতের সেই সব তথ্য শিখতে লাগলুম কেননা আমি বিশ্বাস করতুম যে সমুদ্রযাত্রায় কোনো না কোনো সময়ে আমার ভাগ্য ফিরবে। মিঃ বেটসের কাজ ছেড়ে আমি বাবার কাছে ফিরে এলুম। বাবা এবং জন কাকা এবং কয়েকজন আত্মীয়র কাছ থেকে আমি চল্লিশ পাউণ্ড সংগ্রহ করলুম আর বছরে তিরিশ পাউণ্ডের প্রতিশ্রুতি পেলুম। আমার উদ্দেশ্য আমি লাইডেন যাব। সেখানে আমার খরচ চালাতে হবে। লাইডেনে দু বছর সাত মাস ধরে আমি ফিজিক্স পড়লুম, দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় এ বিদ্যা খুবই প্রয়োজনীয়।

লাইডেন থেকে ফিরে আসার পর আমার কল্যাণকামী মনিব মিঃ বেটস আমাকে ক্যাপটেন আব্রাহাম প্যানেলের কাছে পাঠালেন। তিনি 'সোয়ালো' জাহাজের কমাণ্ডার। জাহাজের সার্জন পদটি খালি ছিল। মিঃ বেটস অনুমোদন করায়

চাকরিটি আমি পেলুম। ঐ জাহাজে আমি ছিলুম সাড়ে তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে লেভান্ট এবং আরও কয়েকটি বন্দরে বা দেশে যাওয়া আসা করলুম। দেশে ফিরে স্থির করলুম লণ্ডনে বসবাস করব। আমার মনিব মি· বেটস আমাকে উৎসাহ দিলেন এবং তাঁর মারফত আমি কয়েকজন রোগীও পেলুম। ওল্ড জুরি পাড়ায় একটা বাড়ির অংশ ভাড়া নিলুম এবং বন্ধুদের পরামর্শে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে আমি নিউ গেট স্ট্রীটের হোসিয়ারী ব্যবসায়ী মিঃ এডমণ্ড বার্টসের মেজ মেয়ে মিস মেরি বার্টনকে বিয়ে করে যৌতুক স্বরূপ চারশ পাউণ্ড পেলুম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমার সেই কল্যাণকামী মনিব মিঃ বেটস দু বছর পরে মারা গেলেন। আমার পরিচিত সংখ্যা বেশি না থাকায় আমার ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়তে আরম্ভ করল। তাছাড়া আমার সমব্যবসায়ীদের কুনীতি অনুসরণ করতে আমার বিবেকে বাধল। অতএব আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে এবং কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে পরামর্শ করে আবার সমুদ্রযাত্রায় যাওয়াই স্থির করলুম। আমি পরপর দুটো জাহাজে সার্জন ছিলুম এবং ছ বছর ধরে ইস্ট এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এ কয়েকবার সমুদ্রযাত্রার ফলে কিছু অর্থ সঞ্চয় করলুম। অবসর সময়ে আমি প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের ভাল ভাল বই পড়তুম। বইয়ের কোনো অভাব ছিল না। তাছাড়া আমি যখনই কোনো দেশে অবতরণ করতুম তখনই আমি সেই দেশের ভাষা ও মানুষের আচার ব্যবহার রীতিনীতি আয়ত্ত করতুম। আমার স্মরণশক্তি প্রখর থাকায় এসব শিখতে আমায় বেগ পেতে হয় নি।

শেষ সমুদ্রযাত্রাটা আমার পক্ষে সৌভাগ্যজনক হয় নি। আমি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লুম, সমুদ্র যেন আর ভাল লাগে না তাই আমি ঠিক করলুম স্ত্রী ও পরিবার নিয়ে এবার বাড়িতেই থাকা যাক। ওল্ড জুরি পাড়া থেকে আমি ফেটার লেনে উঠে গেলুম এবং সেখান থেকে ওয়াপিং পল্লী, আশা যে এখানে নাবিকদের মধ্যে আমার পেশা ভাল জমবে। কিন্তু তা হবার নয়। তিন বছর অপেক্ষা করলুম কিন্তু বরাত ফিরল না তখন ভাগ্যক্রমে একটা চাকরি জুটে গেল। ক্যাপটেন উইলিয়ম রিচার্ড তাঁর 'অ্যান্টিলোপ' জাহাজ নিয়ে সাউথ সি যাচ্ছেন। ১৬৯৯ সালের ৪ঠা মে আমরা ব্রিস্টল থেকে যাত্রা করলুম এবং গোড়ার দিকে তরতরিয়ে এগিয়ে চললুম।

এই সব সমুদ্রে আমাদের সমুদ্র অভিযানের বিবরণী দিয়ে পাঠকদের পীড়িত করা ঠিক হবে না। তবে এইটুকু বলে রাখা ভাল যে ইস্ট ইণ্ডিজ পার হবার পর আমরা প্রবল ঝড়ের টানে ভ্যান ডাইমেন আইল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিম দিকে ভেসে গেলুম। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে আমরা ৩০ ডিগ্রী অক্ষাংশ অতিক্রম করে দক্ষিণে খানিকটা চলে এসেছি। কঠোর পরিশ্রম আর খারাপ খাদ্য আমাদের বারোজন নাবিকের মৃত্যুর কারণ হল আর বাকিরা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। নভেম্বরে এখানে গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়। পাঁচ তারিখে আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন কিন্তু এরই মধ্যে আমাদের একজন নাবিক জাহাজ থেকে মাত্র আট কেবল্ মানে তিনশ ফুট আন্দাজ দূরে একটা পাহাড় দেখতে পেল। কিন্তু বাতাস এত প্রবল বেগে বইছিল যে পাহাড়টা

কিছুতেই এড়ানো গেল না, জাহাজ সজোরে সেই পাহাড়ে ধাক্কা মারল। আমি এবং আরও পাঁচজন নাবিক সমুদ্রে একটা নৌকো নামাতে পেরেছিলুম তাই কোনোরকমে একটা বাতাস এসে আমাদের নৌকোটাকে ধাক্কা দিয়ে সব এলোমেলো করে দিল। আমার নৌকোর সঙ্গীদের কি হল কিংবা যারা পাহাড়টার ওপর পালাতে পেরেছিল কিংবা যারা জাহাজে থেকে গিয়েছিল, এদের সকলের ভাগ্যে কি ঘটেছিল আমি কিছুই জানি না তবে আমার বিশ্বাস তারা সকলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমার ভাগ্য অন্যরকম যে জন্যে আমি সাঁতার কেটে বা বাতাস ও জোয়ারের ধাক্কায় এগিয়ে যেতে পারছিলুম। মাঝে মাঝে আমি জলে পা ডুবিয়ে জলের গভীরতা জানবার চেষ্টা করছিলুম কিন্তু তল পাচ্ছিলুম না। অবশেষে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লুম, হাত পা-আর চলছে না তখনই আমি পায়ের নিচে জমি পেলুম, ইতিমধ্যে ঝড়ও বেশ কমে গেছে। সাগরের গভীরতা কম এখানে। প্রায় মাইল খ্যানেক হেঁটে ডাঙ্গায় উঠলুম। আমার মনে হল এখন সন্ধ্যা আটটা হবে। ডাঙায় উঠে আধ মাইল খানেক হাঁটলুম কিন্তু কোনো বাড়ি বা বাসিন্দা চোখে পড়ল না, তবে আমি এতই দুর্বল হয়ে পড়ে-

আমার হাত পা আর মাথার লম্বা চুল কেউ বা কারা জমির সঙ্গে বেশ মজবুত করে বেঁধে দিয়েছে

ছিলুম যে সেগুলি আমার নজরেই পড়েনি। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। তারপর বেশ গরম মনে হচ্ছিল, জাহাজ ছাড়ার আগে আধ পাঁইট ব্র্যান্ডিও খেয়েছিলুম,

এইসব কারণে ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছিল। আমি ছোট ছোট ও নরম ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লুম। এত গভীর ভাবে আমি কখনও ঘুমুইনি। মনে হয় আমি ন ঘণ্টারও বেশি ঘুমিয়েছিলুম। যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। আমি ওঠবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু একি? আমি নড়তে পারছি না কেন? কারণটা বুঝলুম। আমি চিৎ হয়ে শুয়েছিলুম। আমার দুই হাত ও দুই পা আর আমার মাথার লম্বা চুল কেউ বা কারা জমির সঙ্গে বেশ মজবুত করে বেঁধে দিয়েছে। আমার বুক ও উরুর ওপর দিয়েও বেড় দেওয়া হয়েছে। পাশ ফিরতে পারছিলুম না তাই ওপর দিকেই চেয়েছিলুম। রোদ ক্রমশ গরম হচ্ছে, আলো চোখকে পীড়া দিচ্ছে। আমাকে নিয়ে কারা বুঝি কিছু বলাবলি করছে কিন্তু আমি যে ভাবে শুয়ে আছি তাতে আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটু পরেই আমার মনে হল আমার বাঁ পায়ের ওপর কিছু একটা জীবন্ত প্রাণী চলে বেড়াচ্ছে এবং সেটা আস্তে আস্তে আমার বুকে এসে উঠল এবং প্রায় আমার চিবুকের সামনে এসে থামল। যতটা পারি চোখ নামিয়ে আমি দেখলুম সেটা মনুষ্যাকার একটা প্রাণী, বড়জোর ছ ইঞ্চি লম্বা, হাতে তীর, ধনুক, পিঠে তীর রাখবার তূণীর। ইতিমধ্যে আমি দেখলুম প্রথম ক্ষুদে মানুষটিকে অনুসরণ করে আরও চল্লিশজন (আমার তাই মনে হল) এগিয়ে আসছে। আমি ত ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম এবং এত জোরে চিৎকার করে উঠলুম যে ওরা ভয় পেয়ে পালাতে আরম্ভ করল। পরে শুনছিলুম যে আমার দেহ থেকে নিচে লাফাতে গিয়ে কয়েকজন আহত হয়েছিল। যাইহক একটু পরে তারা আবার ফিরে এল এবং আমার পুরো মুখখানা দেখবার জন্য একজন সাহস করে এগিয়ে এল। সে প্রশংসার ভঙ্গিতে দু হাত ও চোখ তুলে পরিষ্কার ও তীক্ষ্ম স্বরে চিৎকার করে উঠল 'হেকিনা দেউল'। তার সঙ্গীরাও শব্দ দুটি সমস্বরে কয়েকবার উচ্চারণ করল কিন্তু তার যে কি অর্থ তা আমি জানি না। কি তারা বলতে চাইছে? পাঠকরা বুঝতেই পারছেন আমি বেশ অসোয়াস্তিতেই সারাক্ষণ শুয়ে আছি। অবশেষে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টায় আমি বলপ্রয়োগ করলুম ফলে যেসব গোঁজের সঙ্গে সরু দড়ি দিয়ে ওরা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ছিল সেগুলো মাটি থেকে পটাপট উঠে গেল। দড়িও ছিঁড়ল। বাঁ হাতটা আগে মুক্ত করলুম। এবার বুঝলুম ওরা আমাকে কি ভাবে বেঁধেছে কিন্তু মাথা তুলতে পারছি না, বাঁ দিকের চুল গুলো কোথাও আটকাচ্ছে তবুও জোরে একটা ঝাঁকুনি দিলুম, বেশ আঘাত লাগল কিন্তু উপায় কি? যাইহোক মাথাটা এখন ইঞ্চি দুয়েক ঘোরাতে পারলুম। তাদের একটাকেও ধরবার আগেই তারা আবার পালিয়ে গেল এবং এবারও আগের মতো সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার থামবার পর শুনলাম একজন জোরে বলছে 'তোলগো ফেনাক'। আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম আমার বাঁ হাতের ওপরের দিকে শতখানেক তীর এসে বিঁধল। মনে হল যেন শত শত ছুঁচ ফুটল। তারপর আমরা ইউরোপে যেমন বোমা ছুঁড়ি ওরাও সেইরকম আকাশের দিকে কিছু ছুঁড়ল এবং তা ফেটে আমার ওপর কিছু অংশ পড়তে

লাগল কিন্তু যা পড়ল তা এতই হালকা যে আমি কিছুই অনুভব করলুম না। তীর বৃষ্টি শেষ হল, আমি ব্যথা অনুভব করছি, বাঁধন খোলবার চেষ্টা করছি এমন সময় প্রথম বার অপেক্ষা আরও বেশী পরিমাণ একঝাঁক তীর এসে আমাকে বিঁধল। এ তীরগুলো আগের চেয়ে বড়। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র বর্শা হাতে আমাকে আক্রমণ করল, ভাগ্যক্রমে আমার গায়ে ছিল পুরু রাফ্ জার্কিন যা ঐ বর্শাগুলো ভেদ করতে পারল না। আমি ভাবলুম এখন চুপচাপ পড়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাত্রি পর্যন্তই এইভাবে থাকব। বাঁহাতটাও আলগা হয়েছে অতএব নিজেকে সহজে মুক্ত করতে পারব। আর তারপর এই সব বাসিন্দারা, এরা সবাই যদি এমন ক্ষুদে হয় এবং আরও বড় দল নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে তাহলেও আমি এদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারব। কিন্তু আমার ভাগ্যে অন্যরকম লেখা ছিল। বাসিন্দারা যখন দেখল আমি চুপচাপ পড়ে আছি তখন তারাও তীর ছোঁড়া বন্ধ করল। কিন্তু কোলাহল বাড়ছে, তাহলে ভিড়ও বাড়ছে। আমার ডান কান থেকে চার গজ দূরে দুমদাম আওয়াজ শুনতে পেলুম। ঘণ্টা খানেক এই আওয়াজ চলল, লোকজন কাজ করছে। বাঁধন থাকা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ঘাড় ফেরালুম, কি হচ্ছে দেখা দরকার। আমি দেখলুম, জমি থেকে ফুট খানেক উঁচু একটা মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। মঞ্চে জনা চার মানুষের জায়গা হতে পারবে, মঞ্চে ওঠবার জন্য দুটো তিনটে মইও লাগানো হচ্ছে। মঞ্চে একজন উঠলেন, দেখে মনে হল কেউকেটা, তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে একটা বক্তৃতা দিলেন যার একবর্ণও আমি বুঝলুম না। আমার বলা উচিত যে সেই কেউকেটা ভদ্রলোক তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করার পূর্বে তিনবার 'লাংরো দেহুল সান' শব্দ-গুলি চিৎকার করে বললেন (শব্দ তিনটির অর্থ আমাকে পরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল)। বলার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশজন বাসিন্দা এসে আমার মাথার ও বাঁদিকের বাঁধন কেটে দিল। ফলে আমি ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে সেই বক্তাকে দেখতে পেলুম। দেখে মনে হল মানুষটি আধাবয়সী এবং তার সঙ্গে যে তিনজন মানুষ রয়েছে তাদের চেয়েও সে লম্বা। তিনজনের মধ্যে একজন তার বালক-ভৃত্য বা 'পেজ', বক্তার লম্বা কোটের পিছন দিকটা ধরে আছে। ছেলেটা আমার মাঝের আঙুলের চেয়ে একটু বেশি লম্বা হবে, আর বাকি দু'জন বক্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তার রক্ষাকারী। বক্তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিই সুপরিস্ফুট, কখনও নরম কখনও গরম কখনও শাসানি আবার কখনও অনুরোধ। ভাষা না বুঝলেও কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি শুনে ও দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে এবং অল্প কথায় জবাব দিলুম। সূর্যের দিকে চেয়ে যেন সূর্যকে সাক্ষী রেখে, বাঁ হাত তুলে এবং ডান হাত দিয়ে বার বার আমার মুখ দেখাতে দেখাতে সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমি তাঁকে বোঝাতে চাইলুম যে আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর। সেই জাহাজ ছাড়ার পর থেকে আমার পেটে একটাও দানা পড়ে নি, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। 'হুরগো' (সর্বোচ্চ নেতাকে ওরা এই বলে সম্বোধন করে, এসব অবশ্য পরে জেনেছিলুম) আমার মনোভাব বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলেন। তিনি মঞ্চ

থেকে নেমে এসে আদেশ করলেন আমার দুদিকে মই খাড়া করা হক। মই খাড়া হতেই কয়েক শত ক্ষুদ্র মানুষ বা বামন মই বেয়ে উঠতে লাগল, টুকরি ভর্তি মাংস নিয়ে তারা আমার মুখের দিকে এগিয়ে এল। সেই সর্বোচ্চ নেতা অর্থাৎ রাজা নাকি আমার বিষয় জানতে পেরেই আমার আহারের আয়োজন করেছিলেন। এখন সেই আহার তিনি আমার কাছে পাঠাবার আদেশ দিয়েছেন। খেতে খেতে বুঝতে পারলুম যে বিভিন্ন কয়েক প্রকার প্রাণীর মাংস আমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু স্বাদ গ্রহণ করে তাদের চিনতে পারলুম না। মাংসর টুকরোগুলির মটনের টুকরোর মতো গর্দান, রাং ইত্যাদি চেনা যাচ্ছিল কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র। আমি ত একসঙ্গে দুটো তিনটে মুখে পুরছিলুম। আর পাঁউরুটি? সেগুলিও আমার বন্দুকের বুলেটের চেয়েও ছোট, তাও একসঙ্গে তিনটে করে গালে পুরছিলুম। যত তাড়াতাড়ি পারছিল তারা আমার খাবার জুগিয়ে যাচ্ছিল এবং এত দ্রুত সব সাফ হয়ে যেতে তারাও অবাক হয়ে যাচ্ছিল, চোখ বড় বড় করে দেখছিল। হয়ত ভাবছিল কোথা থেকে একটা রাক্ষস এল। আমার ক্ষিধেও পেয়েছিল ভীষণ। তারপর আমি ইসারা করলুম যে আমার কিছু পানীয় চাই। আমার খাওয়ার বহর দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছিল কি পরিমাণ পানীয় আমার লাগবে। ক্ষুদে হলেও ওদের ছোট্ট মাথায় বুদ্ধি আছে। ওরা ওদের সবচেয়ে বড় পিপে এনে কায়দা করে আমার মুখের কাছে ধরল। আমি তা এক চুমুকেই শেষ করলুম। কতটুকুই বা আর হবে, বড়জোর হাফ পাঁইট। বেশ সুস্বাদু অনেকটা বার্গাণ্ডির মতো। ওরা আরও এক পিপে নিয়ে এল, তাও শেষ করে আবার আনতে বললুম। কিন্তু ওদের আর মজুদ নেই, ভাঁড়ার শেষ। ওরা আমার কাণ্ড কারখানা দেখে আনন্দে উল্লসিত। আমার বুকের ওপর উঠে নৃত্য আরম্ভ করে দিল এবং আগের মতো 'হে কিনা দেগুল' ধ্বনি দিতে থাকল। ওরা এবার আমাকে ইসারা করে বলল পিপে দুটি ফেলে দিতে। সেই সঙ্গে তারা জনতাকে সতর্ক করে দিল, সরে যাও, সরে যাও। 'বোরাচ মিভোলা' বলে তারা চিৎকার করতে লাগল। জনতা সরে গেল। আমি পিপে দুটোকে আকাশের দিকে ছুড়ে দিলুম, তাদের তাই না দেখে সে কি উল্লাস। আবার তারা 'হে কিনা দেগুল' ধ্বনি দিতে থাকল। আমার দেহের ওপর দিয়ে যখন বামনরা দলে দলে ছোটাছুটি করছিল তখন আমার ভারি লোভ হচ্ছিল যে গোটা পঞ্চাশ বামনকে ধরে মাটিতে আছাড় মারি। তবে ওরা আমাকে কিছু আঘাত করলেও আমার ত কোনো ক্ষতি হয়নি। তাছাড়া ওদেরও আমি ইঙ্গিতে জানিয়েছি ক্ষতি করার ইচ্ছে আমারও নেই এবং তাদের আমি সম্মান করি। অতএব আমি আমার কুচিন্তা মন থেকে দূর করলুম। তাছাড়া আতিথ্যের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। ওরা ইতিমধ্যেই আমার জন্যে প্রচুর ব্যয় করেছে, যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছে। এই ক্ষুদে মানবগুলির নির্ভীকতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আমার ডান হাত মুক্ত ছিল, ইচ্ছে করলে ওদের প্রচণ্ড আঘাত করতে পারতুম তথাপি ওরা আমাকে দানবসদৃশ জেনেও নির্ভয়ে আমার দেহের ওপর হেঁটে চলে বেড়িয়েছে। কিছুক্ষণ পরে যখন তারা বুঝল যে আমি আর মাংস খেতে চাইছি না

তখন আমার কাছে মহামান্য সম্রাট প্রেরিত একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এলেন, তিনি আমার ডান পায়ের দিক থেকে উঠে আমার দেহের ওপর দিয়ে বরাবর হেঁটে আমার মুখের কাছে এলেন, সঙ্গে অবশ্য বারোজন অনুচর। তারপর তিনি সীল-মোহরাংকিত একটি পরিচয়পত্র আমার চোখের সামনে আন্দোলিত করতে করতে এবং কোনো রকম রাগ প্রকাশ না করে প্রায় দশ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিলেন। ভাষা না বুঝলেও এবং কোনো ঝাঁজ না থাকলেও তিনি যা বললেন বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন এবং কথা বলার সময় মাঝে মাঝে সামনের দিকে আঙুল দেখাতে লাগলেন। যেদিকে আঙুল দেখাচ্ছিলেন পরে জেনেছিলুম সেদিকে আছে রাজধানী, প্রায় আধ মাইল দূরে। সপারিষদ সম্রাটের ইচ্ছা যে রাজধানীতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর কথা শেষ হতে আমি উত্তরে কিছু বললুম। অবশ্য আমার ভাষা তাঁরা বুঝলেন না, তারপর আমি সাবধানে আমার মুক্ত বাঁ হাত তুললুম যাতে নাকি সেই রাজকর্মচারী ও তাঁর অনুচরদের দেহে আঘাত না লাগে এবং আমার শরীরের বন্ধন দেখিয়ে ইসারায় বোঝালুম যে আমাকে বন্ধন মুক্ত করা হক। তাঁর পরবর্তী ভঙ্গি দেখে বুঝলুম যে তিনি আমার কথা বুঝেছেন কিন্তু ঘাড় নেড়ে জানালেন আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। আমাকে বন্দী করেই রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপরে আমাকে ইসারায় জানালেন যে আমাকে যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হবে এবং ভাল ব্যবহারও করা হবে। বন্দী করা হবে ? ভাল লাগল না। ভাবলুম বাঁধন ছিঁড়ে ফেলি কিন্তু তখনি মনে পড়ল ক্ষুদে বামনদের ছুঁচের মতো ধারালো তীর তখনও আমার মুখে ও অন্যত্র বেশ কয়েকটা বিঁধে রয়েছে, যেখানে বিঁধেছিল সে জায়গাগুলো তখনও জ্বালা করছে। এখন ওরা দলে আরও ভারি, আমি বাঁধন ছিঁড়তে গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ হবে। তখন আমি ইসারা করে জানালুম ওরা আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে সৌজন্য প্রকাশ করে এবং হাসিমুখে অনুচরসহ 'হুরগো' নেমে গেল। একটু পরেই আমি খুব গোলমাল শুনলুম এবং একটা কথা 'পেপলম সেলান' বারবার শোনা যেতে লাগল। আমার বাঁ দিকে অনেক মানুষ এসে আমার বাঁধনগুলি তাড়াতাড়ি খুলে দিল ফলে আমি ডান পাশে ফিরতে পারলুম এবং অনেকক্ষণ যাবৎ আটকে রাখা মূত্র-ত্যাগ করতে লাগলুম। এই দৃশ্য দেখে এবং মূত্র-বন্যাস্রোতে ভেসে যাবার আতংকে ক্ষুদে মানুষগুলো ইতস্ততঃ ছিটকে পড়ল। ইতিমধ্যে তারা আমার মুখে ও হাতে তীরলাগা আহত স্থানগুলতে সুগন্ধী একটা মলম লাগিয়ে দিয়েছিল যার ফলে আমার সকল জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হয়েছিল। ওরা আমাকে পর্যাপ্ত আহার ও পানীয় দিয়েছিল, পেট ভরে খেয়েছি। এখন যন্ত্রণারও উপশম হল ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। আমি প্রায় আটঘণ্টা ঘুমিয়েছিলুম এবং পরে শুনেছিলুম যে সম্রাটের আদেশে রাজ-চিকিৎসক মদের পিপেতে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি অনুমান করলুম যে আমি দ্বীপে পা দেওয়ার পর ঘুমিয়ে থাকার সময় কোন দূত মারফত সম্রাট খবর পেয়ে গিয়েছিলেন। সম্রাট তখন মন্ত্রীসভার

সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে বেঁধে ফেলার হুকুম দেন (যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখনই আমাকে বেঁধে ফেলা হয়েছিল) এবং কিভাবে বাঁধা হয়েছিল তাও আমি আগে বলেছি। তখন এও স্থির করা হয় যে আমার জন্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় পাঠান হবে এবং রাজধানীতে আমাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটা কোনো মেসিন তৈরি করা হবে।

সিদ্ধান্তটি দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক মনে হতে পারে। তবে আমার বিশ্বাস যে এমন অবস্থায় ইউরোপের কোনো রাজা এমন আয়োজন করতেন না। আমার মতে এরা যা করেছে তা বিবেচনাপ্রসূত ও উদার। কারণ আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলুম তখন ওরা তীর ছুঁড়ে ও বর্শার আঘাত করে আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে পারত। তাহলে প্রথম আঘাতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হত এবং ক্রোধান্বিত হয়ে আমি বলপ্রয়োগ করে আমার বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হত্যা করতে পারতুম, ওরা বাধা দিতে পারত না। আমার দয়াও আশা করতে পারত না। এই ক্ষুদে মানুষগুলি গণিত বিদ্যায় পারদর্শী এবং সম্রাটের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ওরা যথেষ্ট কারিগরীজ্ঞান আয়ত্ত করেছে। গাছের গুঁড়ি ও ভারি ওজন বইবার জন্যে রাজকুমার কয়েকটা মেসিনের চাকা বসিয়েছে। বনে যেখানে উপযুক্ত কাঠ পাওয়া যায় সেখানে বড় বড় যুদ্ধজাহাজ তৈরি করেছে যার মধ্যে কয়েকটা ন'ফুট লম্বা। তারপর সেগুলো ঐ চাকাওয়ালা এঞ্জিনে চড়িয়ে তিন চারশ গজ দূরে সমুদ্রে নিয়ে গেছে। সর্বাপেক্ষা বড় এঞ্জিন তৈরি করবার জন্যে তারা অবিলম্বে পাঁচশ ছুতোর ও এঞ্জিনিয়ার লাগিয়ে দিল। কাঠের একটা ফ্রেম তৈরি হল সাত ফুট লম্বা চার ফুট চওড়া, মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঁচু যাতে বাইশটা চাকা লাগানো হল। আমি দ্বীপে পৌঁছবার চার ঘণ্টা পরেই এটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছিল। একটু আগে যে গোলমাল শুনে-ছিলুম তা হল ঐ এঞ্জিনটির আগমন। আমার পাশেই ওটি সমান্তরালভাবে রাখা হল কিন্তু মূল সমস্যাটা হল আমাকে সেই যানটির ওপর তোলা। এইজন্যে এক ফুট লম্বা আশিটা খুঁটি পোঁতা হল। ওদের মান অনুযায়ী মোটা দড়ির ডগায় হুক লাগানো হল, আমার গলায়। হাতে বুকে পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল। সেই ব্যাণ্ডেজে হুক আটকে আমাকে তোলা হবে আর কি। খুঁটির মাথায় এবার পুলি (চাকা) লাগানো হল। তারপর হুকগুলি ব্যাণ্ডেজে আটকে ন'শো জন পালোয়ান হেঁইও হেঁইও করে প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আমাকে সেই গাড়িতে তুলে আষ্টে পৃষ্টে বাঁধল। এই কাজটা করা হয়েছিল যখন আমি সুরার সঙ্গে মেশানো সেই ঘুমের ওষুধ খেয়ে গভীর ঘুমে অচেতন ছিলুম। সম্রাটের সবচেয়ে বড় পনের শর্তটি ঘোড়া যেগুলির উচ্চতা প্রায় সাড়ে চার ইঞ্চি, সেই গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল তারপর টানতে টানতে আধ মাইল দূরে আমাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

আমাদের যাত্রা আরম্ভ হওয়ার চার ঘণ্টা পরে একটা মজার দুর্ঘটনার ফলে আমার ঘুম ভেঙে গেল। পথে গাড়ি বিকল হয়ে যাওয়ায় মেরামতের জন্য থামান হয়েছিল। সেই সময়ে আমি কেমন করে ঘুমোচ্ছি তা দেখবার জন্য কৌতুহল দমন

করতে না পেরে দু তিনটি স্থানীয় ছোকরা গাড়ির ওপর উঠে পড়ে তারপর আমার গায়ের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমার মুখের ওপর এসে ওঠে। তাদের মধ্যে একজন বুঝি ছিল রক্ষীদের হাবিলদার, সে আমার নাকের ভেতর তার বর্শার অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দেয় ফলে আমার নাকে সুড়সুড়ি লাগে এবং আমি সজোরে ও সশব্দে এমন হাঁচি দি যে ওরা উড়ে যায়। আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণটা আমি তিন সপ্তাহ পরে জানতে পেরেছিলুম। বাকি সময়টা দীর্ঘ যাত্রা। রাত্রি হল। বিশ্রাম নেবার জন্য এক জায়গায় থামা হল। আমার দুদিকে পাঁচশ রক্ষী, তাদের অর্ধেকের হাতে মশাল বাকি অর্ধেকের হাতে তীর ধনুক। আমি নড়বার চেষ্টা করলেই আমাকে তীরবিদ্ধ করা হবে। পরদিন সকালে আবার যাত্রা এবং দুপুর নাগাদ নগর তোরণের দুশো গজের মধ্যে এসে পৌঁছলুম। আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে সভাসদসহ সম্রাট স্বয়ং এসেছেন। কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা তাঁকে কিছুতেই আমার শরীরের ওপর উঠতে দেবেন না, কে জানে যদি তাঁর কিছু বিপদ ঘটে!

আমাদের গাড়ি যেখানে থামল তার কাছেই ছিল একটি প্রাচীন মন্দির, সারা রাজত্বে সবচেয়ে বড়। কিছুদিন পূর্বে এই মন্দিরে একটি অস্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সেজন্য মন্দিরটি কলুষিত বলে বিবেচিত হত। মন্দির থেকে সমস্ত রত্ন ও অলংকার এবং আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং মন্দিরটি বর্তমানে অন্য সাধারণ কাজে ব্যবহৃত হত। সাব্যস্ত হল যে এই ভবনে আমাকে রাখা হবে। উত্তর দিকে সামনের ফটক চার ফুট উঁচু এবং প্রায় দু ফুট চওড়া। গুটিয়ে গুটিয়ে আমি এর ভেতর দিয়ে ঢুকতে পারি। গেটের দুপাশে দুটি ছোট জানলা, জমি থেকে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু। বাঁ দিকের জানলায় রাজার কামার একানব্বইটি শেকল লাগিয়ে দিল। ইউরোপে মেয়েদের ঘড়ি থেকে যেমন চেন ঝোলে এই শেকলগুলি সেইরকম। সেই শেকল টেনে এনে আমার বাঁ পায়ে লাগিয়ে ছত্রিশটা তালা আটকে দেওয়া হল যাতে আমি পালাতে না পারি। এই মন্দিরের বিপরীত দিকে কুড়ি ফুট দূরে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটা গম্বুজ রয়েছে। আমাকে দেখবার জন্যে সম্রাট তাঁর দরবারের কয়েকজন অমাত্যকে নিয়ে সেই গম্বুজে উঠলেন। আমাকে দেখবার জন্যে আমার ত মনে হল শহর থেকে লাখখানেক মানুষ এসেছিল এবং প্রহরীদের বাধা উপেক্ষা করে হাজার দশ মানুষ মই বেয়ে আমার ওপর উঠেছিল। কিন্তু একটি রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা আমার ওপর ওঠা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। আদেশ উপেক্ষা করলে মৃত্যুদণ্ড। কর্মীরা যখন বুঝল যে আমার পক্ষে পলায়ন অসম্ভব তখন তারা আমার দেহবন্ধনগুলি কেটে দিল। তখন আমি উঠে দাঁড়ালুম যদিও আমার মেজাজ যারপর নেই বিরক্ত। কিন্তু আমাকে উঠে দাঁড়াতে এবং চলতে দেখে তারা বিহ্বল হয়ে যে সোরগোল তুলল তা আর বলা যায় না। আমার বাঁ পায়ে যে শেকল আটকে দেওয়া হয়েছিল তা প্রায় দু গজ লম্বা। ফলে আমি অর্ধ-বৃত্তাকারের মধ্যে আগু পিছু করে চলতে পারছিলুম। কিন্তু গেট থেকে মাত্র চার ইঞ্চি তফাতে আমার বাঁ পা শেকলে বাঁধা তবুও আমি গুঁড়ি মেরে মন্দিরের মধ্যে পুরো শরীরটা ঢুকিয়ে দিতে পারছিলুম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লিলিপুটদের সম্রাট কয়েকজন অমাত্যসহ লেখককে তার বন্দী অবস্থায় দেখতে এলেন। সম্রাটের চেহারার ও স্বভাবের বর্ণনা। লেখককে দেশের ভাষা শেখাবার জন্যে পণ্ডিত নিযুক্ত। তার অমায়িক ব্যবহারের জন্যে রাজানুগ্রহ লাভ। লেখকের পকেট সার্চ এবং তার তলোয়ার ও পিস্তল বাজেয়াপ্ত।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আমার চারদিক দেখলুম এবং স্বীকার করতেই হবে যে চারদিকের দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ। সারা দেশটাই মনে হল একটা বাগান আর ঘেরা জায়গাগুলো যা চল্লিশ বর্গ ফুট মতো হবে যেন এক একটি ফুলের কেয়ারি। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ তবে সবচেয়ে লম্বা গাছগুলো সাত ফুটের বেশি নয়। আমার বাঁ দিকে শহর ঠিক যেন স্টেজে আঁকা সীন। যাইহক আমার প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পাদনের চাপ অসহ্য হয়ে উঠছিল। এসব কাজগুলো দুদিন বন্ধ আছে। আমি বাধ্য হয়ে গুঁড়ি মেরে আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে কাজটা শেষ করলুম বটে কিন্তু মনে মনে বেশ বুঝলাম অন্যায় হয়েছে। পরদিন প্রত্যুষে লোকজন আসবার আগেই আমি বাইরে আমার শেকলের গণ্ডীর মধ্যেই কাজটা সেরে ফেলতুম এবং দু'জন লোক ঠেলাগাড়ি এনে সব পরিষ্কার করে নিয়ে যেত। এসব বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং আমি মানুষটা যে অবিবেচক বা অপরিষ্কার নই তা বোঝাবার জন্যেই এই অনভিপ্রেত প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হল।

দুঃসাহসিক কাজটা শেষ করার পর আমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলুম এবং কিছু তাজা বাতাস অনুভব করলুম। ইতিমধ্যে সম্রাট সেই গম্বুজ থেকে নেমে এসেছেন এবং ঘোড়ায় চেপে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। ঘোড়াটি সুশিক্ষিত হলেও আর একটু হলেই দুর্ঘটনা ঘটতে পারত কারণ ঘোড়াটি চলন্ত পাহাড় দেখতে অভ্যস্ত নয়, অতএব অভুতপূর্ব এক দৃশ্য দেখে সে পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে, খাড়া উঠে দাঁড়াল। সম্রাট নিজেও সুকৌশলী অশ্বারোহী, ঘোড়ার পিঠ থেকে তিনি ছিটকে পড়লেন না। অবিলম্বে রক্ষীরা ছুটে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে চার পায়ের

ওপর দাঁড় করাল এবং সম্রাট ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন। ঘোড়া থেকে অবতরণ করে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। অবশ্য আমার শেকল থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে। তারপর সম্রাট তাঁর পাচক ও সুরাভাণ্ডারীকে আদেশ দিলেন, আমাকে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করতে। সব কিছু প্রস্তুত ছিল, তারা অবিলম্বে আদেশ পালন করল। চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির ওপর খাদ্য ও পানীয় সম্ভার থরে থরে সাজিয়ে তারা গাড়িগুলি আমার দিকে ঠেলে দিল। কুড়িটি গাড়িতে ছিল আমিষ খাদ্য আর দশটিতে সুরা। দুটি বা তিনটি গাড়ির খাবার দ্বারা আমি মুখ ভর্তি করতে লাগলুম আর সেই দশ পাত্র ভর্তি সুরাও শেষ হল। সুরা ভর্তি করা হচ্ছিল মাটির পাত্রে। এক এক পাত্র এক চুমুকেই শেষ। রাজকুমার রাজকুমারী ও কয়েকজন অভিজাত মহিলা সহ রাণীও এসেছেন। তাঁরা দূরে চেয়ারে বসে আছেন কিন্তু ঘোড়া ক্ষেপে যাওয়ার পর তারা চেয়ার ছেড়ে উঠে রাজার কাছে এসেছিলেন। রাজাকে দেখতে কেমন? তাঁর সভাসদ অপেক্ষা রাজা বেশ লম্বা, শরীরের গঠন মজবুত ও পুরুষোচিত। অস্ট্রিয়ানদের মতো তাঁর ঠোঁট এবং ধনুকের মতো নাক, অলিভের মতো দেহবর্ণ, উন্নত কপাল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যেও বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। চলন বলন রাজসিক কিন্তু একটা মাধুর্য্য আছে। বয়সে যৌবন উত্তীর্ণ, আটাশ বছর পার হয়েছে। তার মধ্যে তিনি সাত বছর সগৌরবে রাজ্য শাসন করছেন। তাঁকে ভাল করে দেখবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে তাঁর দিকে পাশ ফিরলুম যাতে আমি তাঁর মুখ ভাল করে দেখতে পাই। তিনি তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরে অবশ্য আমি তাকে অনেকবার আমার হাতের ওপর তুলে নিয়েছিলুম এবং তাঁকে ভাল করে লক্ষ্যও করেছি ও তাঁর নিখুঁত বর্ণনাই পেশ করেছি। তাঁর পোশাক বেশ সাধারণ ও সরল। পোশাকের ফ্যাশন বলতে গেলে বলতে হয় তাঁর পোশাকটি না এশিয় না ইউরোপীয়। মাথায় ছিল রত্ন-খচিত স্বর্ণমুকুট যার শীর্ষে পালক শোভা পাচ্ছিল। যদি আমি আক্রমণ করি এই আশংকায় আত্মরক্ষার জন্যে হাতে রেখেছিলেন খোলা তলোয়ার। তলোয়ারটি প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা। তলোয়ারের হাতল এবং খাপ যা কোমরে ঝুলছিল তা সোনার, ওপরে উজ্বল হীরে বসানো। তাঁর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন কিন্তু উচ্চারণ বেশ স্পষ্ট ও সাবলীল এবং আমি উঠে দাঁড়ালেও তার কথা বেশ শুনতে পাচ্ছিলুম। মহিলা ও সভাসদদের পোশাক বেশ আড়ম্বরপূর্ণ। তারা সকলে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটি মনে হচ্ছিল যেন সোনা রুপোর কাজকরা মহিলাদের রঙিন সায়া বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহামান্য সম্রাট প্রায়ই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমিও উত্তর দিচ্ছিলুম কিন্তু আমরা কেউ কারও কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছিলুম না। কয়েকজন পুরোহিত ও আইনবিদও (তাঁদের পোশাক দেখে আমি অনুমান করলুম) ছিলেন। রাজা তাঁদের আদেশ করলেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এবং আমিও কখনও উচ্চস্বরে, কখনও কোমল স্বরে নিজের ভাষায় এবং আমার যত ভাষা জানা ছিল যথা ডাচ, ল্যাটিন, ফরাসি, স্পেনীয়, ইটালিয়ান ভাষায় কথা বললুম কিন্তু বৃথা। প্রায় দু ঘণ্টা পরে সপারিষদ সম্রাট চলে গেলেন এবং কিছু অতি কৌতুহলী দর্শকদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবার জন্যে কড়া পাহারা রেখে গেলেন। তবুও দর্শকদের

ঠেকানো যায় না। কয়েকজন বেশ খানিকটা এগিয়ে এসে আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে লাগল, একটা তীর ত আর একটু হলেই আমার বাঁ চোখে বিঁধে যেত। রক্ষীবাহিনীর কর্ণেল ওদের ছ জনকে ধরে ফেললেন। তিনি ভাবলেন আমার হাতে ছেড়ে দিলেই ওদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। এই মনে করে সে সেই ছ'জনকে আমার হাতের কাছে নিয়ে এল তার বর্শার খোঁচা দিতে দিতে। আমি আমার ডান হাত দিয়ে তাদের খপ করে ধরে ফেললুম, পাঁচজনকে আমার পকেটে রাখলুম এবং একজনকে আমার হাতে তুলে নিয়ে আমার মুখের সামনে এনে এমন ভঙ্গি করলুম যে তাকে বুঝি জ্যান্ত খেয়েই ফেলব। বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগল। তারপর আমি পকেট, থেকে যখন আমার পেনসিলকাটা ছুরি বার করলুম তখন ত কর্ণেল ও

আমি পকেট থেকে যখন আমার পেন্সিলকাটা ছুরি বার করলুম

তার সঙ্গীরা সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু আমি তাদের ভয় ভেঙে দিলুম। বন্দীর বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিতেই সে ছুটে পালাল। পকেটে যারা ছিল তাদেরও একে একে বার করে আমি ছেড়ে দিলুম। লক্ষ্য করলুম যে আমার রক্ষীগণ ও সমবেত জনতা আমার এই দয়া দেখে বেশ প্রীত হল এবং তারা এই ঘটনাটি আমার অনুকুলে রাজসভায় জানিয়েছিল।

রাত্রে আমার বাড়িতে ঘুমোতে বেশ অসুবিধে হত তবুও পনেরো দিন আমাকে স্রেফ মাটির ওপর মেঝেতে বেশ কষ্ট করে শুতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে রাজামশাই আমার জন্যে বিছানা তৈরি করার হুকুম দিয়েছিলেন। গাড়ি বোঝাই করে ওদের মাপের ছশো বিছানা আনা হল এবং দেড়শটি করে বিছানা প্রথমে আমার মাপ অনুযায়ী সেলাই করে চারভাঁজ করা হল। তারপর সেই মাপে বিছানার চাদর, ঢাকা ও গায়ে দেবার কম্বলও তৈরি করে দেওয়া হল। এ মন্দের ভাল হল কারণ আমাকে কষ্ট করে শুতে হচ্ছিল পাথরের মেঝেতে।

আমার আগমনবার্তা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ধনী, দরিদ্র, অলস বা কৌতূহলী মানুষ শয়ে শয়ে আমাকে দেখতে আসতে লাগল। ফলে গ্রাম খালি হয়ে যেতে লাগল, চাষ ও ঘর গেরস্থালী কাজের ক্ষতি হতে লাগল। তখন সম্রাট ঘোষণা করলেন কাজের ক্ষতি করে এভাবে দলে দলে আসা চলবে না। আমাকে দেখতে হলে রাজসভায় সচিবের কাছে ফি জমা দিয়ে অনুমতি পত্র নিতে হবে এবং আমার বাড়ির পঞ্চাশ গজের মধ্যে আসা চলবে না।

ইতিমধ্যে সম্রাট তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ করছেন আমাকে নিয়ে কি করা হবে। পরে আমি আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু যিনি রাজসভার অনেক গুপ্ত খবর জানতেন তাঁর কাছে শুনেছিলুম যে আমাকে নিয়ে ওরা বেশ অসুবিধেয় পড়েছেন। তাঁদের ভয় আমি যে কোনো সময়ে আমার শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারি। তারপর আমাকে খাওয়ানো এক বিরাট সমস্যা, খরচ ত অনেক বটেই উপরন্তু দেশে দুর্ভিক্ষ হয়ে যেতে পারে আমাকে খাওয়াতে যেয়ে। এক সময়ে ওরা স্থির করেছিল আমাকে অনাহারে রেখে মেরে ফেলবে কিংবা আমার মুখে ও হাতে বিষাক্ত তীর মেরে আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু আর এক সমস্যা। মরে গেলে আমার বিরাট মৃতদেহ নিয়ে কি করবে? সেটা ত পচবে, শহরে মড়ক দেখা দেবে। সারা রাজ্যেও মড়ক ছড়িয়ে যেতে পারে। আমাকে নিয়ে যখন এই আলোচনা চলছে তখন সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন অফিসার মন্ত্রণাসভার দ্বারে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হল। তাঁরা আমার বিষয়ে একটা বিবৃতি দেন। বিশেষ করে আমি যে ছ'জন অপরাধীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছি তা শুনে মহামান্য সম্রাট এবং তাঁর সভাসদ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে মত পরিবর্তন করেন। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে এক ঘোষণা জারী করেন যে রাজধানীর ন'শো গজের মধ্যে যে সমস্ত গ্রাম আছে তাদের আমার আহারের জন্য প্রতিদিন সকালে ছ'টি গরু, চল্লিশটি ভেড়া এবং অন্যান্য আহার্য দ্রব্য সরবরাহ করতে হবে এবং সেইসঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে রুটি, সুরা ও অন্যান্য পানীয়ও দিতে হবে। এইসবের যথাযোগ্য দাম দেবার জন্যেও সম্রাট তাঁর কোষাগারকে নির্দেশ দিলেন। রাজার নিজস্ব খাস ভূসম্পত্তি থেকে আয় আছে কিন্তু তা সত্ত্বেও জরুরী সময়ে প্রজাদের ওপর এরকম চাপ মাঝে মাঝে পড়ে, যেমন যুদ্ধের সময়ে। আমার ঘর-গেরস্থালী কাজের জন্যে একটি সংস্থা গঠিত হল যেজন্যে ছ'শো ব্যক্তি নিযুক্ত করা হল। তাদের থাকবার

জন্যে আমার সুবিধামতো আমার বাড়ির দুধারে তাঁবু ফেলা হল এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বেতনেরও ব্যবস্থা করা হল। দেশের ফ্যাশন অনুযায়ী আমার পোশাক তৈরির জন্যে তিনশ দর্জি নিয়োগ করা হল। সম্রাটের সেরা ছ'জন পণ্ডিতকে নিয়োগ করা হল আমাকে দেশের ভাষা শেখাবার জন্যে। সম্রাট

সেরা ছ'জন পণ্ডিতকে নিয়োগ করা হল আমাকে দেশের ভাষা শেখাবার জন্যে

আরও নির্দেশ দিলেন যে তাঁর এবং মান্যবর ব্যক্তিদের ও সম্রাটের রক্ষীদের অশ্বারূঢ়বাহিনী এখন থেকে আমার সামনে কুচকাওয়াজ করবে যাতে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় সহজ হয় এবং আমিও তাদের রীতিনীতি জানতে পারি। সম্রাটের সমস্ত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হতে থাকল এবং আমিও প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদের ভাষা অনেকটা শিখে ফেললুম। এই সময়ের মধ্যে সম্রাট কয়েকবার আমার কাছে এসে আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং ভাষা শিক্ষাদানে আমার শিক্ষকদের সঙ্গে তিনি যোগ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আপাততঃ আমরা উভয়ে কাজচালানো ভাষায় কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেছিলুম। প্রথম যে শব্দগুলি আমি আয়ত্ত করেছিলুম তার দ্বারা আমি প্রতিবারই নতজানু হয়ে রাজার কাছে আবেদন করতুম তিনি যেন আমাকে মুক্তিদান করেন। তিনি বললেন আমার মুক্তিদানের ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ, মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে এবং তার আগে আমাকে অবশ্যই তাঁর প্রতি এবং তাঁর রাজ্যের প্রতি আমার তরফ থেকে শান্তির

প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। তিনি আরও বললেন যে আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে এবং ইতিমধ্যে আমি যেন ধৈর্য সহকারে তাঁর এবং তাঁর প্রজাদের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করতে শিখি। তিনি এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন যে আমাকে যদি সার্চ করার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে আমি যেন কিছু মনে না করি কারণ আমার কাছে যেসব অস্ত্র আছে সেগুলি বিপজ্জনক। বুঝলুম যে প্রজাদের ভয় থেকে মুক্তি দেওয়াই রাজার উদ্দেশ্য। আমি কথায় ও ইসারায় রাজাকে বললুম যে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে আমি আমার পোশাক খুলে ফেলতে প্রস্তুত আছি এবং আমার পকেটগুলি উলটে তাঁকে দেখাতে পারি। তিনি বললেন যে রাজ্যের আইন অনুসারে আমাকে তাঁর দু'জন অফিসার সার্চ করবেন তবে এজন্যে তাঁরা আমার অনুমতি নেবেন ও আমার সহযোগীতা চাইবেন। আমার উদারতা ও বিচার বুদ্ধির ওপর তাঁদের বিশ্বাস জন্মেছে এবং তিনি আমাকে সার্চ করবার জন্য নির্ভয়ে অফিসার প্রেরণ করতে পারেন কারণ আমি তাদের কোনো ক্ষতি করব না। অফিসাররা যদি আমার কোনো জিনিস আটক করে তাহলে আমি যখন এই দেশ ছেড়ে চলে যাব তখন সেগুলি আমাকে ফেরত দেওয়া হবে অথবা আমি যে দাম ধার্য করে দোব তাঁরা সেইমতো দাম মিটিয়ে দেবেন। দুজন অফিসার এলেন, আমি তাঁদের আমার হাতের চেটোয় তুলে নিলুম তারপর প্রথমে আমি তাদের আমার কোটের পকেটে এবং অন্য পকেটে নামিয়ে দিলুম কিন্তু আমার যে ঘড়ির বা চোরা পকেট ছিল সেগুলি তাদের দেখতে দিলুম না কারণ সেইসব পকেটে আমার একান্ত ব্যক্তিগত কিছু সামগ্রী আছে যা কারও কাজে লাগবে না। ঘড়ির পকেটে আমার রুপোর ঘড়ি ছিল এবং একটি চোরা পকেটে একটা থলেতে কিছু সোনা ছিল। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কালি, কলম ও কাগজ ছিল। আমাকে সার্চ করে তারা যা দেখেছে তার একটা বিস্তারিত তালিকা লিখে ফেলল। তালিকাটি তারা সম্রাটকে দেখাবে। ওদের তালিকা দেখে আমি সেটি যথাযথ ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিলুম। তালিকাটি এরকম ঃ—প্রারম্ভে। বিশাল মানুষ-পাহাড়ের (ওদের 'কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন' শব্দ দুটির অনুবাদ) ডান দিকের কোটের বুকপকেট খুঁটিয়ে সার্চ করে আমরা এমন একটা চৌকো মোটা কাপড় পেলুম যেটি মহামান্য সম্রাটের স্টেটরুমে বিছিয়ে দেওয়া যায়। বাঁদিকের পকেটে পাওয়া গেল রুপোর একটি মস্ত বড় বাক্স যার ঢাকাটিও ঐ একই ধাতুর তৈরি কিন্তু আমরা অনুসন্ধানকারীরা ঢাকাটি তুলতে পারছিলুম না। আমরা সেটি খুলতে চাই কিন্তু পারছি না। অবশেষে বাক্স খোলা গেল তখন আমাদের একজন বাক্সর মধ্যে নামতেই একটা নরম গুঁড়ো পদার্থের মধ্যে তার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল এবং সেই গুঁড়ো পদার্থ কিছুটা ছিটিয়ে পড়তে আমাদের নাকে মুখে লাগল এবং আমরা হাঁচতে আরম্ভ করলুম। তার ওয়েস্টকোটের ডান দিকের পকেটে কোনো সাদা পাতলা পদার্থের বেশ পুরু একটা বাণ্ডিল। বাণ্ডিলটি তার দিয়ে বাঁধা এবং কালো সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত। বোধহয় কিছু লেখা আছে। প্রতিটি অক্ষর আমাদের হাতের চেটোর সমান। বাঁদিকে এঞ্জিনের মতো কি একটা

রয়েছে যা থেকে লম্বা লম্বা দাড়া বেরিয়েছে। আমাদের অনুমান এইটি দিয়ে মানুষ পাহাড় তার চুল আঁচড়ায়। অনুমান এই জন্যে যে আমরা তাকে বার বার প্রশ্ন করে বিরক্ত করি নি কারণ আমাদের কথা তাকে বোঝাতে বেগ পেতে হচ্ছিল। তার কোমরের নিচে পরিহিত রানফু-লো (ব্রিচেস)-এর ডান বড় পকেটে এক মানুষ সমান লম্বা ফাঁপা লোহার তৈরি একটা স্তম্ভ পেলুম আর সেই স্তম্ভের সঙ্গে কাঠ ও লোহার তৈরি কিছু লাগানো রয়েছে। এটি কি বস্তু আমরা বুঝতে পারলুম না। বাঁদিকের পকেটে অনুরূপ একটি এঞ্জিন ছিল। ডানদিকে একটি ছোট পকেটে কতকগুলো সাদা ও লাল ধাতু নির্মিত চাকতি রয়েছে, কয়েকটা সরু বা মোটা কিংবা ছোট ও বড়, নানা আকারের। সাদা চাকতিগুলো বোধহয় রুপোর তৈরি কিন্তু এত ভারি যে সেগুলো আমরা তুলতেই পারছিলুম না। বাঁদিকের পকেটে বিচিত্র আকারের দুটো কালো থামের মতো বস্তু ছিল কিন্তু আমরা পকেটের নিচে থাকায়, ওপরটা দেখতে পাচ্ছিলুম না তবু আমাদের মনে হয়েছিল সে দুটি বিপজ্জনক কিছু হবে। তখন আমরা তাকে প্রশ্ন করলুম। সেদুটি সে বার করে আমাদের খুলে দেখিয়ে বলল যে একটি দিয়ে সে দাড়ি কামায়, আর অপরটি দিয়ে মাংস কাটে। তার সেই রানফু-লো-এর ওপরে কোমরে দুটো ছোট ছোট পকেট রয়েছে যার মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে পারি নি। ডান দিকের পকেট থেকে ঝুলছিল রুপোর একটা চেন। চেনের শেষে কি আছে তা দেখবার জন্য আমরা সেটি বার করতে বললুম। চেনটিতে টান দিয়ে সে বেশ বড় গোলাকার একটি বস্তু বার করল যার এক পিঠ ধাতু নির্মিত আর অপর পিঠ কোনো স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে ঢাকা। সেই স্বচ্ছ পদার্থের ভেতর দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোলাকার পদার্থটির ভেতর কিনারা বরাবর একই মাপ বজায় রেখে বেশ বড় দাগ আর ফাঁকে ফাঁকে ছোট দাগ। দাগগুলি আমরা হাত দিয়ে স্পর্শ করতে গেলুম কিন্তু সেই স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করতে পারলুম না। বস্তুটি সে আমাদের কানের কাছে নিয়ে এল। ভেতরে ক্রমাগত একটা শব্দ হচ্ছে যেন ওয়াটার মিল চলছে। আমরা অনুমান করলুম এটা কোনো অচেনা প্রাণী অথবা তার পুজো করবার নিজস্ব কোনো দেবতা। দেবতাই হবে বোধহয় কারণ আমরা তাকে প্রশ্ন করতে সে বলল ওরই নির্দেশে সে চলে তার সঙ্গে পরামর্শ না করে সে কিছু করে না এবং তার জীবনের সব কাজের সময় সে ঠিক করে দেয়। বাঁ দিকের ছোট পকেট থেকে সে একটা জালের থলে বার করল। সেটা আমাদের জেলেদের জালের মতো বড় হবে। থলেটা বেশ খোলা ও বন্ধ করা যায়। থলের ভেতর থেকে সে কতকগুলো বেশ ভারি হলদে ধাতব পদার্থ বার করল। সেগুলি যদি সোনা হয় তাহলে ত অনেক দাম।

মহামান্য সম্রাট আপনার আদেশ অনুসারে পাহাড়-মানুষের সমস্ত পকেট সার্চ করে দেখলুম তার কোমরে পুরু চামড়ার একটা কোমরবন্ধনী রয়েছে। কোমর বন্ধনীটা বিরাট একটা পশুর চামড়া থেকে তৈরি নিশ্চয়। কোমর বন্ধনীর বাঁ দিক থেকে ঝুলছে একটা তলোয়ার যা লম্বায় আমাদের মতো পাঁচটা মানুষের সমান

হবে। কোমর বন্ধনীর ডান দিকে রয়েছে একটা ব্যাগ যার দুটো ভাগ। প্রতি ভাগে সম্রাটের তিনজন প্রজার স্থান হতে পারে। একটি ভাগে অনেকগুলি ধাতব বল বা গুলি রয়েছে। এক একটা বল আমাদের মাথার সমান। বেশ ভারি, তুলতে শক্তির দরকার। ব্যাগের অপর ভাগে গুঁড়ো গুঁড়ো দানার মতো কিছু পদার্থ রয়েছে, কালো রং তবে দানাগুলি ভারি নয়। আমরা আমাদের হাতে পঞ্চাশটি পর্যন্ত দানা তুলতে পারছিলুম। পাহাড়-মানুষের দেহ সার্চ করে আমরা যা পেয়েছি তার তালিকা পেশ করলুম। উনি মহামান্য সম্রাটের আদেশ পালন করেছেন এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন। মহামান্য সম্রাটের শাসনারম্ভ থেকে উননব্বইতম চন্দ্রের চতুর্থ দিবসে আমাদের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সীল মোহরাংকিত করে পেশ করা হল।

ক্লেফরেন ফ্রেলক, মারসি ফ্রেলক

এই তালিকা সম্রাটকে শোনানো হল, তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন কতকগুলি সামগ্রী দাখিল করতে,প্রথমে চাইলেন আমার তলোয়ারটি। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর বাছা বাছা তিন হাজার সৈন্যকে আদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন আমাকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের ধনুক নিয়ে প্রস্তুত থাকে, আদেশ পেলেই তীর ছুঁড়বে। কিন্তু আমার দৃষ্টি সেদিকে ছিল না, আমি পুরোপুরি সম্রাটের দিকেই চেয়ে ছিলুম। সম্রাট বললেন তলোয়ারটি বারকরতে। সমুদ্রের জল লেগে তলোয়ারটির কোনো কোনো জায়গায় সামান্য মর্চে পড়ে গেলেও প্রায় সবটাই খুব ঝকঝকে ছিল। আমি খাপ থেকে সড়াৎ করে তলোয়ারটা বার করে নাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা ভয়ে চমকে উঠল। চকচকে তলোয়ারের ওপর থেকে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। ভেবেছিলুম সম্রাটও ভয় পাবেন কিন্তু তাঁর সাহস আছে। তিনি অবাক হলেও ভয় পান নি। আমাকে বললেন তলোয়ারটি খাপে পুরে মাটিতে আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখতে। আমি আমার পায়ে বাঁধা শেকল থেকে ছ ফুট দূরে সেটি নামিয়ে রাখলুম। তারপর তিনি চাইলেন লোহার ফাঁপা থামওয়ালা যন্ত্রটি অর্থাৎ আমার পিস্তলটি। তাঁর ইচ্ছানুসারে আমি পিস্তলটি বার করলুম এবং সেটি কি করে ব্যবহার করতে হয় তা দেখিয়ে দিতে চাইলুম। আমি পিস্তলে আপাততঃ শুধু বারুদ ভরলুম। সমুদ্রের জলে কিছু বারুদ ভিজে গিয়েছিল তবুও অধিকাংশ শুকনো ছিল। আমি শুকনো বারুদই ভরলুম এবং সম্রাটকে বললুম এবার যা ঘটবে সেজন্যে যেন তিনি ভয় পান না। তারপর আমি আকাশের দিকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুঁড়লুম। আমার তলোয়ার দেখে তাদের যতখানি চমক লেগেছিল তার চেয়ে পিস্তলের আওয়াজ ওদের অনেক বেশি চমকিত করল। কয়েকশত মানুষ ত এমনভাবে মাটিতে পড়ে গেল যেন তারা মরে গেছে। রাজা যদিও প্রকাশ করলেন না তবুও বোঝা গেল তিনি বেশ ভয় পেয়েছেন। আমি যেভাবে তলোয়ারটি দিয়েছিলুম ঠিক সেইভাবে পিস্তল এবং বারুদ ও বুলেটের ব্যাগ নামিয়ে রেখে রাজাকে সতর্ক করে দিয়ে বললুম ব্যাগটি যেন তিনি আগুন থেকে দূরে

রাখেন কারণ এতে একটি স্ফুলিঙ্গ লাগলেই যে বিস্ফোরণ ঘটবে তাতে সম্রাটের প্রাসাদ উড়ে যাবে। আমার ঘড়িটিও আমি একইভাবে নামিয়ে রাখলুম। ঘড়িটি সম্বন্ধে রাজাকে

কয়েকশত মানুষ এমনভাবে মাটিতে পড়ে গেল যেন তারা মরে গেছে

যথেষ্ট কৌতুহলী মনে হল। তিনি তাঁর দুজন দীর্ঘতম দেহরক্ষীকে বললেন ঘড়িটির মাথার রিং-এর মধ্যে একটা ডাণ্ডা ঢুকিয়ে ঘড়িটা তুলে ধরতে; ইংলণ্ডে এইভাবে মদের পিপে বয়ে নিয়ে যায়। ঘড়ির অবিরত টিক টিক শব্দ রাজাকে অবাক করে দিল। ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন, ওদের দৃষ্টিও খুব প্রখর। মিনিটের কাঁটাটি আপনা আপনি এগিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি অবাক। ঘড়ি সম্বন্ধে তিনি তাঁর পণ্ডিতদের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন তবে তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে লাগল তা আমি ভাল শুনতেও পেলুম না, বুঝতেও পারলুম না। তারপর আমি আমার রুপোর ও তামার মুদ্রাগুলি, ন'টি বড় ও কিছু ছোট

সোনার টুকরো সমেত থলেটি, ছুরি ও ক্ষুর, চিরুনি, রুপোর নস্যদানি, রুমাল এবং দিনলিপির খাতা রাজার সামনে একে একে রাখলুম। তলোয়ার পিস্তল এবং বারুদ ও বুলেটের পাউচ সম্রাট তাঁর ভাণ্ডারে তুলে রাখবার নির্দেশ দিলেন কিন্তু বাকি জিনিসগুলি আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

আমার আর একটি গুপ্ত পকেট ছিল সেটি অনুসন্ধানকারীরা দেখতে পায় নি। সেই পকেটে আমার চশমা ছিল। আমার দৃষ্টির কিছু ত্রুটি আছে তাই মাঝে মাঝে সেটি পরি, একটি পকেটে দূরবীন এবং আরও কয়েকটা টুকিটাকি। এগুলি রাজার কোনো কাজে লাগবে না তাই আমি আর ওগুলি পকেট থেকে বার করলুম না। তাছাড়া আমার ভয় ছিল যে ওগুলি আমার হাতছাড়া হলে ভেঙে বা হারিয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লেখক সম্রাট ও তাঁর পুরুষ ও নারী সভাসদদের কিছু ক্রীড়াকৌশল দেখালেন। লিলিপুটদের ক্রীড়ানুষ্ঠান। কয়েকটি শর্তে লেখককে স্বাধীনতা দেওয়া হল।

আমার সংব্যবহার, ভদ্রতা, সম্রাট ও তাঁর সভাসদ, সামরিক বিভাগ ও জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। তাঁরা সকলেই সন্তুষ্ট বলে আমার মনে হচ্ছে। আমার আরও মনে হচ্ছে যে শীঘ্রই আমি মুক্তি লাভ করব। যাতে আমি সকলের মন যুগিয়ে চলে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারি। আমি সেই চেষ্টাই করতে লাগলুম। স্থানীয় ব্যক্তিরাও ক্রমশঃ বুঝতে পারছে যে আমি তাদের কোনো ক্ষতি করব না। যেমন আমি মাঝে মাঝে শুয়ে পড়তুম এবং সেই সময়ে পাঁচ ছ'জন লিলিপুট যদি আমার হাতের চেটোয় উঠে নৃত্য আরম্ভ করে দিত তাহলে আমি কখনও বাধা দিতুম না। ছোট ছেলেমেয়েরাও ক্রমশঃ সাহসী হয়ে আমার চুলের মধ্যে লুকোচুরি খেলত। আমি এখন ওদের ভাষা বেশ বুঝতে পারি এবং ওদের ভাষাতে কথাও বলতে পারি। সম্রাটের একদিন ইচ্ছে হল দেশীয় কিছু ক্রীড়া দেখিয়ে আমার চিত্তবিনোদন করবেন। নানারকম খেলাধুলায় লিলিপুটরা বেশ পারদর্শী এবং অনেক দেশের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। মাটি থেকে বারো ইঞ্চি ওপরে ও দু ফুট দীর্ঘ দড়ির (আমার চোখে সুতো) ওপর তাদের খেলাগুলি দারুণ। পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি হলেও আমি এ বিষয়ে কিছু বলব। রাজসভায় যারা বড় চাকরির প্রার্থী তাদের এই দড়ির খেলা শিখতে হয়। যে কোনো পরিবারের অথবা অল্প শিক্ষিত প্রার্থীরা যুবা বয়স থেকেই এই দড়ির খেলা শিখতে থাকে। যখনই কোনো বড় পদ খালি হয়, সে মৃত্যুর জন্যই হক বা অসাধুতার জন্যে কর্মচ্যুত হলে, প্রার্থীরা উক্ত শূন্য পদের জন্যে আবেদন করে। তখন সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের

মনোরঞ্জনের জন্যে দড়ির খেলা দেখাতে হয়। মাটিতে না পড়ে যে সবচেয়ে উঁচু লাফাতে পারবে শূন্য পদটি তাকেই দেওয়া হয়। প্রধান মন্ত্রীকে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্যে এবং তিনি যে তাঁর কর্মকুশলতা অব্যাহত রেখেছেন তা দেখাবার জন্যে সম্রাট তাঁকেও দড়ির খেলা দেখাতে আহ্বান করেন। কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপকেও মাঝে মাঝে লাফিয়ে দড়ি ডিঙোতে বলা হয় তবে এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যের যে কোনো সম্মানীয় প্রতিযোগী অপেক্ষা তাঁর জন্য দড়ি এক ইঞ্চি উঁচুতে ধরা হয়। কোষাধ্যক্ষ মশাই এই খেলাটি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত কৌশলও দেখাতেন। পক্ষপাতিত্ব না করেও বলতে পারি যে আমার বন্ধু ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কীয় মুখ্য সচিব রেলড্রিসালও বড় কম যায় না, কোষাধ্যক্ষের পরেই তাঁর স্থান আর বাকি সব বড় অফিসাররা মোটামুটি কৌশলী।

এই প্রতিযোগিতায় মাঝে মাঝে মারাত্মক দুর্ঘটনাও ঘটে, সংখ্যা বড় কম নয়। আমি নিজেই দু'তিন জন প্রার্থীকে হাত পা ভাঙতে দেখেছি। কিন্তু বিপদটা আরও বড় আকারে দেখা যায় যখন মন্ত্রীরা স্বয়ং প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। কারণ তাঁরা তাঁদের সহকর্মী অপেক্ষা যে সেরা তা প্রমাণ করবার জন্যে নিজ ক্ষমতা অপেক্ষা শক্তি প্রয়োগ করে ফলে তারা প্রায়ই আহত হয়। আমি এই দ্বীপে আসবার দু'এক বছর আগে আমার বন্ধু ফ্লিমন্যাপ তার ঘাড় ভেঙে ফেলত যদি না ভাগ্যক্রমে রাজার একটি কোমল কুশন তার পতনের স্থানে পড়ে থাকত।

আরও একটি ক্রীড়া আছে। কিন্তু সেটি বিশেষ উপলক্ষে কেবল সম্রাট ও তাঁর প্রথম সারির মন্ত্রীদের সমক্ষে দেখান হয়। সম্রাট তাঁর টেবিলের ওপর ছ'ইঞ্চি মাপের সিলকের তিনটি সরু সুতো রাখেন। প্রথমটি নীল, দ্বিতীয়টি লাল এবং তৃতীয়টি সবুজ। সম্রাট যদি কাউকে বিশেষভাবে অনুগ্রহ দেখাতে চান তখন এইগুলি তাদের শক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ উপহার দেওয়া হয়। তবে তাদের প্রতি-যোগিতায় যোগ দিতে হয়। প্রতিযোগিতাটি হয় সম্রাটের আড়ম্বর পূর্ণ চেম্বার অফ স্টেট হলে। এখানে প্রার্থীদের যে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হয় তা আগের প্রতিযোগিতা থেকে ভিন্ন এবং এ ধরনের ক্রীড়া আমি পৃথিবীর কোথাও দেখি নি।

সম্রাট দিকচক্রবালের সঙ্গে উভয় প্রান্ত সমান্তরাল রেখে হাতে একটি ছড়ি ধরেন এবং প্রার্থীদের কখনও ছড়িটি কয়েকবার লাফিয়ে, অতিক্রম করতে হয়, আবার কখনও সামনে দিয়ে বা পিছন ফিরে ছড়ির নিচ দিয়ে যেতে হয়। সম্রাট অবশ্য ছড়িটি ইচ্ছামতো উঁচু নিচু বা এ পাশ ও পাশ করেন। সময় সময় তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছড়ির অপর প্রান্ত ধরেন আবার কখনও প্রধান মন্ত্রী একাই ছড়িটি ধরেন। যে সর্বাপেক্ষা সহজে ছড়ির ওপর বা নিচে দিয়ে ছড়িটি অতিক্রম করতে পারে তাকে নীল সুতো উপহার দেওয়া হয়। পরবর্তী স্থানাধিকারীকে দেওয়া হয় লাল সুতো এবং তৃতীয় ব্যক্তি পায় সবুজ সুতো। বিজয়ীরা এই রঙিন সুতো তাদের কোমরে বাঁধে। কোমরে এরকম রঙিন বন্ধনীযুক্ত অনেক অফিসারকে রাজসভায় দেখা যায়।

রাজার অশ্বশালার যোদ্ধাদের ঘোড়াগুলিও আমাকে চিনে নিয়েছিল। তারা আমাকে আর ভয় পেত না এবং আমার পায়ের খুব কাছে আসত। আমি

আমি মাটিতে হাত পাততুম আর অশ্বারোহী লাফিয়ে আমার হাতে নামত

মাটিতে হাত পাততুম আর অশ্বারোহী লাফিয়ে আমার হাতে নামত। একবার সম্রাটের একজন শিকারী তো তার ঘোড়ায় চড়ে আমার জুতোসমেত পা লাফিয়ে পার হয়েছিল। নিশ্চয় খুব কৃতিত্বের ব্যাপার। সম্রাটকে কতকগুলি অন্যরকমের খেলা দেখাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার নিজের খেলা নয়, লিলিপুটদের দিয়েই আমি খেলা দেখিয়েছিলুম। আমি সম্রাটকে বললুম দু'ফুট লম্বা এবং সাধারণ একগাছা বেতের মতো পুরু কিছু ছড়ি আমাকে আনিয়ে দিন। সম্রাট তখনি তাঁর বনবিভাগের মন্ত্রীকে সেইমতো আদেশ দিলেন। পরদিন সকালেই ছ'খানা আটঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে ছ'জন কাঠুরিয়া ছড়ি এনে হাজির। আমি ছড়ি বলছি কিন্তু ওদের কাছে এগুলি কাঠের মোটা গুঁড়ির সমান। আমি ন'খানা ছড়ি বেছে নিলুম তারপর সেগুলো আড়াই ফুট চৌকো জায়গার মধ্যে পুঁতে ফেললুম। আমি আরও চারটে ছড়ি নিয়ে সেগুলো চারদিকে পোঁতা ছড়িগুলোর সঙ্গে মাটিতে শুইয়ে বেঁধে রাখলুম। তারপর আমি আমার রুমালখানা বেশ টান টান করে ঐ ন'টা ছড়ির মাথায় লাগিয়ে মাটিতে পোঁতা কাঠিগুলোর সঙ্গে বেঁধে দিলুম। তার মানে একখানা সামিয়ানা টাঙানো হল আর কি। কিন্তু ঢিলেঢালা

নয় বেশ মজবুত করেই বেঁধে দিলুম। আমার কাজ শেষ করে আমি সম্রাটকে অনুরোধ করলুম বাছা বাছা চব্বিশজন অশ্বারোহীকে আনতে। তারা আমার খাটানো এই সামিয়ানার ওপর তাদের ক্রীড়াকৌশল দেখাবে। আমার প্রস্তাব সম্রাট অনুমোদন করলেন এবং অশ্বারোহী আনবার জন্যে হুকুম দিলেন। অশ্বারোহীরা আসতে আমি তাদের সবাইকে কাপ্তেন ও অস্ত্রশস্ত্র সমেত আমার খাটানো রুমাল-সামিয়ানার ওপর তুলে দিলুম। তারা সার দিয়ে দাঁড়ালো। এরপর ওরা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং তাদের তলোয়ার ও ভোঁতা তীর বা ভোঁতা বর্শা বার করে নকল যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল। একদল আক্রমণ করে, অপর দল আক্রমণ প্রতিহত করে এবং পাল্টা আক্রমণ করে। বেশ মজার অথচ উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। এমন চমৎকার কুচকাওয়াজ আমি দেখি নি। আমার রুমালটি বেশ মজবুত করেই বাঁধা ছিল, ওদের অসুবিধে হচ্ছিল না, যেন মাঠেই খেলা দেখাচ্ছে। এই কুচকাওয়াজ দেখে রাজা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করলেন এবং এই খেলা পরপর কয়েকদিন চলবার আদেশ দিলেন। সম্রাট খেলাটি এতদূর উপভোগ করলেন যে তিনি আমাকে বললেন তাঁকে সামিয়ানার ওপর তুলে দিতে। তখন তিনি নিজেই তাঁর ঘোড়সওয়ারদের আদেশ দিতে লাগলেন। শুধু তাই নয় তিনি আমাকে বললেন সিংহাসন সমেত মহারাণীকে তুলে ধরে রাখতে যাতে তিনিও খেলাটি ভাল করে দেখতে ও উপভোগ করতে পারেন। আমি মহারানীকে মঞ্চ থেকে দু'গজ দূরে তুলে ধরে রাখলুম। সেখান থেকে তিনিও খেলা দেখে খুব আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। আমার ভাগ্য ভাল যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। কেবল একটা তেজী ঘোড়া রুমালে একটা সরু ছিদ্রে পা ঢুকিয়ে ফেলেছিল ফলে সে নিজেও পড়ে যায় এবং তার আরোহী কাপ্তেনকেও ফেলে দেয়। আমি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে ওদের তুলে দিয়েছিলুম। পরে আমি একহাত দিয়ে ফুটোটি বন্ধ করে অপর হাত দিয়ে ঘোড়সওয়ারদের একে একে সামিয়ানার ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছিলুম। যে ঘোড়াটা পড়ে গিয়েছিল তার বাঁদিকের কাঁধে আঘাত লেগেছিল কিন্তু কাপ্তেনের কোনো আঘাত লাগে নি। রুমালটি আমি মেরামত করে নিয়েছিলুম তবে ঐ খেলার পুনরাবৃত্তি করতে আমি আর সাহস করি নি। রুমালটির ওপর দিয়েও ধকল গেছে, জীর্ণ হয়েছে।

আমি মুক্তিলাভের দু'তিন দিন আগে যখন নানা অনুষ্ঠান মারফত সম্রাটের চিত্তবিনোদন করছিলুম সেই সময় একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত ছুটে এসে সম্রাটকে খবর দিল যে দ্বীপে যেখানে আমি অবতরণ করেছিলুম সেখানে মস্ত বড় কালো রঙের একটা জিনিস পড়ে আছে। জিনিসটার আকার বড় অদ্ভুত। মাঝখানটা মানুষ সমান উঁচু আর চারদিক ঘিরে চওড়া বারান্দা মতো। প্রথমে ভেবেছিল এটা বুঝি কোনো প্রাণী কিন্তু পরে লক্ষ্য করে দেখল ওটা ঘাসের ওপর শুধু পড়ে আছে, নিশ্চল। কেউ কেউ সাহস করে একজনের ঘাড়ে চেপে জিনিসটার মাথায় উঠল। মাথাটা চ্যাপ্টা, পা চেপে বোঝা গেল ওটা ফাঁপা। তাদের অনুমান

জিনিসটি পাহাড়-মানুষের এবং মাননীয় সম্রাট আদেশ দিলে ওরা পাঁচটি ঘোড়া নিয়ে গিয়ে জিনিসটি নিয়ে আসতে পারে। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি ওরা কি জানাতে চাইছে। খবরটা পেয়ে আমি আনন্দিতই হলুম। জাহাজ ধ্বংস হবার পর নৌকোয় উঠে টুপিটা মাথায় ভাল করে বসিয়ে দড়ি দিয়ে আটকে দিয়েছিলুম। নৌকোতে ত প্রচুর ধকল গেছে, দড়িটা কোনো সময়ে ছিঁড়ে গেছে। তারপর আমি দ্বীপে অবতরণ করে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তখন কোনো এক সময়ে টুপিটা আমার মাথা থেকে খুলে পড়ে গিয়ে হয়ত বাতাসে দূরে কোথাও ছিটকে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম সমুদ্রে সাঁতার দেবার সময় টুপিটা হয়ত আমার মাথা থেকে খসে গেছে। আমি সম্রাটকে অনুরোধ করলুম যত শীঘ্র সম্ভব টুপিটি আনিয়ে দিতে। জিনিসটি কি ও তার ব্যবহার কি তা আমি সম্রাটকে বুঝিয়ে
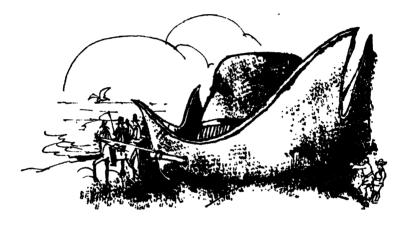
পরদিনই এক দল ঘোড়-সওয়ার টুপিটি নিয়ে এল

দিলুম। পরদিনই এক দল ঘোড়সওয়ার টুপিটি নিয়ে এল। কিন্তু টুপির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ওরা টুপির কানায় দুটো বড় বড় ফুটো করেছে। সেই ফুটোয় হুক আটকে দিয়েছে। হুকে দড়ি বেঁধে ঘোড়ার সঙ্গে লাগিয়ে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে, তা প্রায় আমাদের আধ মাইলটাক হবে। তবু ত জমি এবড়োখেবড়ো নয়, বেশ মসৃণ বলা যায় তা নইলে টুপির দফা রফা হয়ে যেত।

এই ঘটনার দুদিন পরে। সম্রাট সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ রাজধানীর আশে পাশে ব্যারাকে থাকত। রাজামশাইয়ের কি খেয়াল হল তিনি বাহিনীর সেনাপতিকে আদেশ দিলেন যে পাহাড়-মানুষ তার দুই পা যতদূর সম্ভব ফাঁক করে দাঁড়াবে সৈন্যবাহিনী পতাকা উড়িয়ে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে সেই দুই পায়ের তলা দিয়ে মার্চ করে যাবে। সেনাপতি সমরবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং আমার অনুরক্ত। আদেশ পেয়ে সেনাপতি তাঁর বাহিনীকে সাজাতে আরম্ভ করলেন। কোন বাহিনীর পর কোন বাহিনী, পদাতিক কতজন থাকবে, অশ্বারোহীরা পাশাপাশি

ক'জন থাকবে, কাদের হাতে পতাকা থাকবে, কোন সুরে ব্যান্ড বাজবে ইত্যাদি সব তিনি সম্পূর্ণ করে ফেললেন। তিন হাজার পদাতিক এবং হাজার অশ্বারোহী কুচকাওয়াজে যোগ দেবে। সম্রাট কঠোর আদেশ জারি করলেন যে সৈন্যরা যেন তাদের শালীনতা ও শোভনতা বজায় রাখে, কেউ যেন আমাকে উপহাস না করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। কিন্তু ছোকরা সৈন্য বা অফিসারদের দোষ দেওয়া যায় না। আমার পরনের ব্রিচেস জোড়ার যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল তা দেখে ওদের মধ্যে যে কেউ হাসি সম্বরণ নাও করতে পারে। তবে কেউ আমাকে বিদ্রূপ করে নি।

আমি আমার মুক্তি দাবি করে সম্রাটের কাছে বার বার আবেদন করতে লাগলুম। সম্রাট তখন প্রথমে তাঁর মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনা করলেন ও পরে জাতীয় প্রতিনিধি মণ্ডলীর পূর্ণ অধিবেশনে আমার মুক্তি প্রসঙ্গটি পেশ করলেন। কেউ আপত্তি করল না। ব্যতিক্রম শুধু স্কাইরেস বলগোলাম। কে জানে কেন বিনা প্ররোচনায় সে আমার দুষমন হয়ে গেল। সে একা কি করবে? আমার মুক্তির বিরুদ্ধে আর কেউ আপত্তি করল না। এবং সম্রাট স্বয়ং আমার মুক্তি সমর্থন করলেন। রাজার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী হলেন গালবেত, অভিজ্ঞ রাজনীতিক। আমার মুক্তির শর্তগুলি তিনি রচনা করলেন অবশ্য স্কাইরেস বলগোলামের দাবিতে। নইলে হয়ত আমার মুক্তির জন্যে কোনো শর্তই আরোপ করা হত না। সেই শর্তগুলি স্কাইরেস স্বয়ং আমার কাছে নিয়ে এল, সঙ্গে এনেছিল দুজন আণ্ডার-সেক্রেটারি এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। শর্তগুলি আমাকে পড়ে শুনিয়ে শপথ নিতে বলা হল। শপথ নিতে হবে প্রথমে আমার স্বদেশে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ও পরে লিলিপুটদের দেশের নির্ধারিত আইন মোতাবেক। শপথ নেবার সময় আমাকে বাঁ হাত দিয়ে আমার ডান পা ধরতে হবে। আমার ডান হাতের মাঝের আঙুল দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করতে হবে আর বুড়ো আঙুলটি রাখতে হবে আমার ডান কানের ডগ ছুঁয়ে। সেই বিচিত্র দেশের জনগণের আচার ব্যবহার ইত্যাদি এবং আমার মুক্তির শর্তগুলি জানবার জন্য পাঠকদের নিশ্চয় কৌতুহল হচ্ছে। অতএব তাঁদের কৌতুহল নিবারণের জন্যে আমি সেগুলি প্রতি শব্দ অনুসারে যথাসাধ্য অনুবাদ করে প্রকাশ করলুম।

গোলবাস্টো মোমারেন এভলেম গুরডিলো শেফিন মুলি উলি গিউ, লিলিপুটদের সর্বশক্তিমান সম্রাট যিনি বিশ্বের একাধারে আনন্দ ও ভীতি, পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পাঁচ হাজার ব্লুস্টুগ (বারো মাইল আন্দাজ পরিধি) ব্যাপী যার সাম্রাজ্য, যিনি রাজার রাজা, মানবপুত্রগণ অপেক্ষা দীর্ঘ, যার পদভারে মেদিনী কাঁপে, যার মস্তক সূর্য স্পর্শ করে এবং যার ঈষৎ অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবীর যে কোনো রাজার জানু কম্পিত হয়, যিনি বসন্তের মতো মনোরম গ্রীষ্মের মতো আরামপ্রদ শরতের মতো ফলপ্রসূ কিন্তু শীতের মতো ভয়ংকর এ হেন মহামহিম রাজাধিরাজ সম্রাট আমাদের স্বর্গরাজ্যে

সদ্য আগত পাহাড়-মানুষের জন্য নিম্নোক্ত শর্ত আরোপ করছেন যা তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ নিয়ে কঠোর ভাবে পালন করতে হবে।

এক। আমাদের মহামান্য সম্রাটের পাঞ্জাযুক্ত অনুমতি পত্র ব্যতিত পাহাড়-মানুষ আমাদের রাজ্য ছেড়ে যেতে পারবে না।

দুই। আমাদের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সে আমাদের রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং রাজধানীতে আসবার আগে তাকে অন্তত দু ঘণ্টার সতর্কতামূলক নোটিস দিতে হবে যাতে নগরবাসীরা নিজ নিজ আবাসে আশ্রয় নিতে পারে।

তিন। উক্ত পাহাড়-মানুষ কেবলমাত্র নগরের বড় রাস্তা দিয়েই চলবে এবং কখনও মাঠ বা শস্যক্ষেতের ওপর দিয়ে হাঁটবে না বা সেখানে শয়ন করবে না।

চার। রাস্তা দিয়ে সে যখন হাঁটবে তখন যেন বিশেষভাবে নজর রাখে যাতে সে আমার প্রিয় কোনো নাগরিক ও তাদের ঘোড়া বা গাড়ি পদদলিত না করে ফেলে এবং রাজি না হলে কোনো নাগরিককে যেন নিজের হাতে তুলে না নেয়।

পাঁচ। জরুরি প্রয়োজন হলে পাহাড়-মানুষ জরুরি বার্তা দ্রুত বহনের জন্য অশ্বসমেত অশ্বারোহী দূতকে তার পকেটে বহন করে নিরাপদে নিয়ে যাবে এবং প্রয়োজন হলে নিরাপদে সম্রাটের কাছে ফিরিয়ে আনবে। এ কাজ তাকে করতে হবে যে কোনো এক চন্দ্রের ছ' দিন।

ছয়। ব্লেফুসকু দ্বীপবাসীরা আমাদের শত্রু, তারা আমাদের আক্রমণ করবার তোড়জোড় করছে। যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে পাহাড়-মানুষকে আমাদের মিত্র হতে হবে এবং ওদের নৌবহর ধ্বংস করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে।

সাত। উক্ত পাহাড়-মানুষ তার অবসর সময়ে আমাদের শ্রমিকদের সাহায্য করবে। আমাদের প্রধান পার্কটির দেওয়াল গাঁথবার জন্য অথবা কোনো রাজপ্রাসাদ তৈরি করার সময় ভারি ভারি পাথরও তাকে তুলে দিতে হবে।

আট। উক্ত পাহাড়-মানুষ দুই চাঁদ সময়ের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রটা পায়ে হেঁটে ঘুরে এসে তার মাপ দাখিল করবে।

সর্বশেষে আমরা বিশ্বাস করি উক্ত পাহাড়-মানুষ এই শপথ গ্রহণ করবে এবং শর্ত-গুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। এজন্যে তাকে প্রতিদিন আমাদের ১৭২৮ জনের ভরণ-পোষনের উপযুক্ত মাংস ও পানীয় সরবরাহ করা হবে। আমাদের রাজপুরুষদের কাছে সে যেতে পাররে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও তাকে দেওয়া হবে। আমাদের শাসনের একানব্বুইতম চন্দ্রের দ্বাদশ দিবসে বেলফ্যাবোরাক প্রাসাদে এই চুক্তি সম্পাদিত হল।

আমি শপথ গ্রহণ করলুম এবং শর্তগুলি আনন্দের সঙ্গে মেনে নিলুম। যদিও কয়েকটা শর্ত আমার পক্ষে সম্মানজনক ছিল না। সেই শর্তগুলি নৌবহরের প্রধান স্কাইরেস বেলগোলাম আমার প্রতি হিংসাবশে আরোপ করতে তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। শপথ গ্রহণ এবং শর্ত মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শেকল খুলে দেওয়া হল। এবং আমি মুক্ত হলুম। আমি স্বাধীন। এই অনুষ্ঠানের পুরো

সময় সম্রাট আমার কাছে ছিলেন। আমি তাঁর পদতলে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলুম। তিনি আমাকে উঠতে আদেশ করলেন এবং তারপর অনুগ্রহ

শপথ গ্রহণ ও শর্ত মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শেকল খুলে নেওয়া হল

করে আমার প্রতি যেসব প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করলেন তার পুনরাবৃত্তি করলে আমার অহংকার প্রকাশ করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে আমি তাঁর উপযুক্ত ভৃত্য হব এবং আমার প্রতি যে আনুকুল্য দেখানো হয়েছে ও ভবিষ্যতে দেখানো হবে আমি তার মর্যাদা রাখব।

পাঠক বোধহয় লক্ষ করেছেন যে আমার মুক্তিদান উপলক্ষে আমার শেষ শর্তে সম্রাট অনুগ্রহ করে আমার জন্যে যে খাদ্য ও পানীয় বরাদ্দ করেছেন তা ১৭২৮ জন লিলিপুটবাসীর উপযুক্ত। কিছুদিন পরে রাজপরিষদে আমার এক বন্ধুকে আমি

জিজ্ঞাসা করেছিলুম যে তারা ঠিক কি করে ১৭২৮ জনের হিসাব করলেন, আনুমানিক নয় একেবারে যথার্থ সংখ্যা।

উত্তরে আমার সেই বন্ধু বললেন যে সম্রাটের গাণিতিকরা কোয়াড্রাণ্টের সাহায্যে আমার দেহটা মেপে নিয়ে তাদের নিজের একজন মানুষের দেহের তুলনা করেছে এবং সেই অনুপাতে তারা হিসেব করে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অতএব এই হিসেব থেকেই পাঠক লিলিপুটবাসীদের মেধা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লিলিপ্রটদের প্রধান নগর মিলডেনডো এবং সম্রাটের প্রাসাদের বর্ণনা। প্রথম সারির একজন মুখ্য সচিবের সঙ্গে লেখকের বাক্যালাপ এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। যুদ্ধের সময় লেখক কর্তৃক সম্রাটের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি।

স্বাধীনতা লাভের পর আমি সম্রাটের কাছে যে অনুরোধ করলুম তা হল যে আমি মিলডেনডো নগরটি দেখতে চাই। সম্রাট আমার অনুরোধ মঞ্জুর করলেন কিন্তু বললেন সাবধান, কোনো নাগরিক বা তার বাড়ির যেন কোনো ক্ষতি কোরো না। আমি নগর দেখতে যাব এ কথা ঘোষণা করা হল। যে দেওয়াল নগরটি ঘিরে রেখেছে তার উচ্চতা আড়াই ফুট এবং অন্ততঃ এগারো ইঞ্চি চওড়া। একটা ঘোড়ার গাড়ি স্বচ্ছন্দে দেওয়ালের ওপর দিয়ে যেতে পারে। দেওয়ালের ওপর দশফুট অন্তর একটা মজবুত টাওয়ার আছে। পশ্চিম দিকের বড় ফটক আমি ডিঙিয়েই পার হলুম। আমি কোট খুলে রেখে শুধু ওয়েস্ট কোট পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলুম কারণ আমার আশংকা ছিল যে কোটের প্রান্তের আঘাত লেগে বাড়ি অথবা শহরের রমণীদের ক্ষতি হতে পারে। আমি নিচের দিকে ভাল করে নজর রেখে সাবধানে পা ফেলতে লাগলুম, সর্বদা ভয় কাউকে না মাড়িয়ে ফেলি। যদিও আদেশ জারি হয়েছিল যে আমি যখন শহর ভ্রমণে যাব তখন যেন কোনো মানুষ রাস্তায় না থাকে, থাকলেও দায়িত্ব তার। তবুও বলা যায় না ত কোনো মানুষ হয়ত কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে রাস্তায় চলে আসতে পারে। বারান্দা, ছাদ ও জানালাগুলি কৌতুহলী দর্শকের সমাবেশে পরিপূর্ণ। কৌতুহলী দর্শকের এমন ভিড় আমি দেখি নি। শহরটি একটি সমচতুষ্কোণ, প্রতিদিকের দেওয়াল পাঁচশ ফুট দীর্ঘ। প্রধান দুটি রাস্তা যা পরস্পরকে ছেদ করেছে সে দুটি পাঁচ ফুট চওড়া। ছোট রাস্তা বা গলির ভেতর আমি ঢুকতে পারি নি, সেগুলি বারো থেকে আঠার ইঞ্চি চওড়া। শহরটির জনসংখ্যা পাঁচ লক্ষ

পর্যন্ত হতে পারে। বাড়িগুলি তিন থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঁচু। দোকান বাজার বেশ রমরমা।

শহরের কেন্দ্রে যেখানে প্রধান রাস্তা দুটি পরস্পরকে ছেদ করেছে সেইখানে সম্রাটের প্রাসাদ। মূল প্রাসাদ থেকে কুড়ি ফুট দূরে দু'ফুট উঁচু পাঁচিল দিয়ে প্রাসাদটি ঘেরা। সম্রাটের অনুমতি নিয়ে আমি পাঁচিল ডিঙিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলুম। ভেতরে প্রশস্ত জায়গা থাকায় আমি ঘুরে ঘুরে সমস্ত প্রাসাদটি দেখলুম। প্রাসাদের বাইরের উঠোনটির চারদিক চল্লিশ ফুট। এ ছাড়া আরও উঠোন রয়েছে। রাজকীয় কক্ষগুলি ভেতরের দিকে। সেগুলি দেখবার জন্যে ভেতরে যাওয়া দুঃসাধ্য। উঠোনগুলি ঘিরে যে পাঁচিল বা ফটক রয়েছে তা মাত্র আঠার ইঞ্চি উঁচু এবং সাত ইঞ্চি চওড়া। ওগুলো সহজে অতিক্রম করতে পারলেও ওপারে পা রাখার জায়গা নেই কারণ সেখানে অন্য বাড়ি আছে যেটি পাঁচ ফুট উঁচু। বাড়িটি আমার পক্ষে ডিঙানো সম্ভব নয়। তাছাড়া এই বাড়ির দেওয়াল ও গঠন বেশ মজবুত হলেও ডিঙোবার চেষ্টা করলে আমার পায়ের আঘাতে তার ক্ষতি হতে পারে। অথচ সম্রাটের ইচ্ছে যে আমি তাঁর প্রাসাদের আড়ম্বর দর্শন করি। এজন্যে আমাকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এই তিন দিনের মধ্যে আমি একটা কাজ করলুম। শহর থেকে একশ গজ দূরে রাজার বাগান থেকে আমার ছুরি দিয়ে কয়েকটা বেশ বড় বড় গাছ কেটে নিলুম। সেই সব গাছ থেকে আমি দুটো টুল বানালুম, প্রতিটা টুল তিন ফুট উঁচু এবং বেশ মজবুত, আমার ভার বইতে পারবে। নগরবাসীদের আর একবার নোটিস দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হল যে আমি প্রাসাদের দিকে যাচ্ছি। টুল দু'টো হাতে নিয়ে আমি প্রাসাদে এলুম। বাইরের উঠোনে এসে আমি একটা টুল পেতে তার ওপর উঠে দাঁড়ালুম। অপর টুলটা আমার হাতে। এই টুলটা আমি প্রাসাদের ছাদ পার করে ওধারের উঠোনে রাখলুম। এই উঠোনটা আট ফুট চওড়া। আমি তখন এধারের টুলে একটা পা রেখে ছাদ ডিঙিয়ে ওধারের টুলে অপর পা রেখে প্রাসাদ সহজেই পার হলুম। ওধারের উঠোনে নেমে একটা আঁকশির সাহায্যে এধার থেকে টুলটা তুলে আনলুম। ভেতরের এই উঠোনে আমি শুয়ে পড়ে প্রাসাদের মাঝের তলার জানালা দিয়ে প্রাসাদের ভেতর দেখতে পেলুম। আমি যাতে দেখতে পাই এজন্যে ভেতরের জানালাগলি খোলা ছিল। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে আমি প্রাসাদের জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হলুম। সম্রাজ্ঞী ও রাজকুমারদের দেখলুম, তাঁরা নিজ নিজ আবাসে রয়েছেন. সঙ্গে সেবক সেবিকা। সম্রাজ্ঞী আমাকে দেখতে পেয়ে হাসলেন। এবং চুম্বন করবার জন্যে অনুগ্রহ করে জানালা দিয়ে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন।

রাজপ্রাসাদের অন্যান্য বিবরণী আমি আপাততঃ দিতে পারছি না, সে আমি পরে হয়ত বিস্তারিতভাবে জানাব। আপাততঃ আমি যে কাজটি সম্পন্ন করছি তাহল এই সাম্রাজ্যটির সাধারণ বিবরণ; সাম্রাজ্য কিভাবে গঠিত হল, কতজন রাজা শাসন করলেন, তাদের যুদ্ধ ও রাজনীতির বিবরণ, আইনকানুন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং

ধর্ম, দেশের গাছপালা, জীবজন্তু, দেশের মানুষের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, আমার দৃষ্টিতে তাদের বৈশিষ্ট ইত্যাদি আমি লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করলুম।

চুম্বন করবার জন্যে অনুগ্রহ করে জানালা দিয়ে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন

আমি লিলিপুটদের রাজ্যে প্রায় ন মাস ছিলুম সেই সময়ে সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাও আমি লিখে রেখেছি।

আমি মুক্তি পাবার প্রায় একপক্ষ পরে ব্যক্তিগত ব্যাপার সমূহের মুখ্যসচিব (তাঁকে এই পদমর্যাদাই দেওয়া হয়েছে) রেলড্রেসাল একজন মাত্র ভৃত্য নিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। তাঁর গাড়িটা তিনি কিছু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন এবং আমাকে বললেন তাঁকে এক ঘণ্টা সময় দিতে হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলুম কারণ লোকটির ব্যক্তিগত অনেক সদগুণ আছে এবং তিনি আমার অনেক উপকার করেছেন। আমি শুয়ে পড়তে চাইলুম যাতে তিনি আমার কানের কাছে আসতে পারেন, তাহলে তাঁর কথাগুলি আমি ভালভাবে শুনতে পাব। কিন্তু তিনি বললেন তার চেয়ে আমি তাঁকে আমার হাতে তুলে নিলে ভাল হয়, তাতে তাঁর কথা বলা

সুবিধে হবে। আমি মুক্তিলাভ করায় তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং আমার মুক্তিলাভের ব্যাপারে তাঁরও যে কিছু অবদান আছে সেকথাও সবিনয়ে জানালেন। তিনি আরও বললেন যে দেশের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা কিছু জটিল নচেৎ আমাকে নাকি এত শীঘ্র ও সহজে মুক্তি দেওয়া হ'ত না। বর্তমানে দেশে দুটি চরম সংকট দেখা দিয়েছে। একটি হল আভ্যন্তরীণ আর অপরটি হল দেশ আজ এক প্রবল শত্রুর আক্রমণ আশংকা করছে; শীঘ্রই যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা তোমাকে বলতে হলে সত্তর চাঁদ পিছিয়ে যেতে হবে। তখনই শুরু। ট্র্যামেকসান এবং স্ল্যামেকসান নামে দুটি রাজনীতিক দলের মধ্যে বিবাদের তখনই শুরু। দু'দলই ক্ষমতা দখল করতে চায়। জুতোর গোড়ালির উচ্চতার তফাত অনুসারে দল দুটি পরিচিত।

এই রকম বলা হয় যে উঁচু গোড়ালি বা হাই হিল পার্টি দেশের প্রাচীন সংবিধানে বিশ্বাসী। কিন্তু সম্রাট লো-হিল পার্টির প্রতি অনুরাগী এবং রাজসভায় মন্ত্রণা পরিষদে ও বিভিন্ন দফতরে তিনি লো-হিল পার্টির প্রভাব অনুমোদন করেন কারণ সম্রাটের রাজকীয় জুতোর গোড়ালি তাঁর সভাসদ অপেক্ষা এক ড্রুর (এক ড্রুর হল এক ইঞ্চির চোদ্দ ভাগের এক ভাগ) নিচু। বর্তমানে এই দুই পার্টির মধ্যে মনোমালিন্য এমন সীমায় পেঁাছেছে যে ওরা একত্রে আহার ও পান করে না এমন কি পরস্পরের সঙ্গে কথাও বলে না। হাই হিল বা ট্র্যামেকসান পার্টি, দলে ভারি কিন্তু মূল ক্ষমতা পুরোপুরি আমাদের হাতে। আমরা আশংকা করছি যে রাজমুকুটের মহামহিম উত্তরাধিকারী হাই-হিল পার্টির দিকে ঝুঁকছেন কারণ তাঁর এক পায়ের জুতোর একটি গোড়ালি কিছু উঁচু যে জন্যে তিনি ঈষৎ খুঁড়িয়ে হাঁটেন। এই অশান্তির জন্যে আমরা বিব্রত ও চিন্তিত কারণ আমরা অপর দ্বীপ ব্লেফুসকু থেকে আক্রমণ আশংকা করছি। ঐ রাজ্যটিও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ, ক্ষমতায় আমাদের মহামান্য সম্রাটের সমতুল এবং আকারেও প্রায় আমাদের সমান। আমরা তোমার মুখেই শুনেছি যে এই পৃথিবীতে আরও অনেক সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্র আছে যেখানে তোমার মতো দীর্ঘকায় মানুষ বাস করে কিন্তু আমাদের পণ্ডিতদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাঁরা অনুমান করেন যে তুমি চাঁদ বা কোনো নক্ষত্র থেকে পড়ে গেছ কারণ এই পৃথিবীতে তোমার মতো একশটা মানুষ থাকলেই তারা আমাদের সম্রাটের রাজত্বের সমস্ত ফল ও গবাদি পশু অতি অল্প সময়ে হজম করে ফেলবে। তাছাড়া আমাদের ছ'হাজার চাঁদের ইতিহাসে আমরা লিলিপুট এবং ব্লেফুসকু, এই দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনো সাম্রাজ্যের উল্লেখ পাই নি। গত বত্রিশ চাঁদ ধরে এই দুই রাষ্ট্রে দুর্দম যুদ্ধ মাঝে মাঝেই চলে আসছে। এইসব যুদ্ধের সূত্রপাত কি করে হল সেই কথাই তোমাকে বলি। দেশে ডিম খাওয়ার একটা প্রাচীন পদ্ধতি ছিল, ডিমের মোটাদিক ভেঙে খাওয়া। কিন্তু বর্তমান সম্রাটের ঠাকুর্দা যখন বালক ছিলেন তখন ডিম খাবার সময় প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে ডিমের মোটাদিক ভাঙতে গিয়ে আঙুল কেটে

ফেলেন, বোধহয় ছুরি দিয়ে ডিম ভাঙছিলেন। তখন তাঁর বাবা এ আদেশ জারি করলেন যে এখন থেকে ডিম খাবার আগে ডিমের সরুদিক ভাঙতে হবে। এই আইনের ফলে দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। আমাদের ইতিহাস বলে এই আইন উপলক্ষ্য করে প্রজারা ছ'বার বিদ্রোহী হয়েছিল ফলে একজন সম্রাট তাঁর প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং আর একজন তাঁর মুকুট হারিয়েছিলেন। এই গৃহযুদ্ধে ব্লেফুসকুর রাজারা ইন্ধন যোগাতো এবং পরে বিপ্লব দমন করলে বিদ্রোহীরা ঐ দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিত। একটা হিসেবে জানা যায় যে বিভিন্ন সময়ে এগারো হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল তবুও তারা ডিমের সরুদিক ভাঙতে রাজি হয়নি। এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কয়েক শত বই লেখা হয়েছে। 'বিগ-এণ্ডিয়ান'দের বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সেই দলের কেউ যাতে চাকরি না পায় সেজন্যে আইন জারি করা হয়েছে।

এইসব গন্ডগোল চলাকালে ব্লেফুসকুর সম্রাটরা মাঝে মাঝে তাদের রাষ্ট্রদূত মারফত অনুযোগ করত যে আমাদের ধর্মনেতা মহান লুসট্রগ পবিত্র গ্রন্থ ব্রুন্ডেকাল-এ (ওদের 'আলকোরান') যে মূল মতবাদ প্রচার করেছেন তা আমরা ভঙ্গ করছি, ধর্মাচরণে বিভেদ সৃষ্টি করছি এবং মহান ধর্মনেতার অপমান করছি।

কিন্তু এসবই মূল বইয়ের বিষয়টি বিকৃত করে বলা হয়েছে। কারণ বইয়ে শুধু লেখা আছে যে 'সকল সৎ ব্যক্তি সুবিধামতো দিকে ডিম ভাঙবেন' তাহলে সুবিধামতো দিক কোনটি? আমার ক্ষুদ্র মতে সে বিচারের ভার ডিম ভগ্নকারীর ওপর অথবা প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভাল। এদিকে 'বিগ-এণ্ডিয়ান' নির্বাসিতেরা ব্লেফুসকু রাজ্য তথা সম্রাটের কাছ থেকে প্রচুর প্রশ্রয় পাচ্ছে এবং স্বদেশেও তাদের পার্টি গোপনে তাদের নানাভাবে সাহায্য করছে ফলে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ছত্রিশ চাঁদব্যাপী রক্তাক্ত সংগ্রাম চলতে থাকে। এই যুদ্ধ চলাকাল সময়ে আমরা চল্লিশটি বড় যুদ্ধজাহাজ এধং আরও বেশি সংখ্যক ছোট জাহাজ হারিয়েছি। আমাদের তিরিশ হাজার নাবিক ও সৈন্য মারা গেছে এবং অনুমান করা হয় যে শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতি আরও বেশি হয়েছে। যাইহক বর্তমানে তারা একটা নৌবহর গঠন করেছে এবং আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। আমাদের মহামান্য সম্রাট বাহাদুর তোমার সাহস ও শক্তির ওপর প্রচুর আস্থাবান এবং সেজন্যে এই সংকটের সময় তোমার কাছে সবকিছু বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন।

আমি তখন মুখ্য সচিব মশাইকে বললুম যে সম্রাটের প্রতি আমার কর্তব্য আমি নিশ্চয় পালন করব তবে আমি বিদেশী এবং কোনো দলীয় ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। শুধু সম্রাটের জীবন ও তাঁর রাজ্য বাঁচাবার জন্যে আমি আমার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যথাসাধ্য করব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক অসাধারণ কৌশল বলে লেখক একটা আক্রমণ প্রতিহত করল। তাকে উচ্চ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হল। ব্লেফুসকুর রাষ্ট্রদূত এসে সন্ধি প্রস্তাব করলেন। দুর্ঘটনাক্রমে সম্রাজ্ঞীর কক্ষে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রাসাদের বাকি অংশ রক্ষা করতে লেখকের কৃতিত্ব।

ব্লেফুসকু সাম্রাজ্য যে দ্বীপে অবস্থিত সেই দ্বীপটি লিলিপুট দ্বীপের উত্তর-পূর্বদিকে। মাঝে আটশত গজ প্রশস্ত একটি প্রণালী দ্বারা বিভক্ত। ঐ দ্বীপ আমি এখনও দেখি নি এবং পাছে জাহাজ থেকে বা অন্যভাবে শত্রুপক্ষ আমাকে দেখে ফেলে এই ভয়ে আমি সমুদ্রতীরে যেতুম না। এদেশে আমার আগমনের খবর ওরা এখনও জানে না কারণ যুদ্ধকালে দুইদেশের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগাযোগ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে মৃত্যুদণ্ড। সম্রাট দুই দেশের মধ্যে জাহাজ চলাচল আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। আমাদের গুপ্তচর খবর এনেছে যে শত্রুপক্ষের পুরো নৌবহর এখন অনুকূল বাতাসের জন্যে বন্দরে অপেক্ষা করছে। কিভাবে আমি শত্রুপক্ষের নৌবহরটা আটক করব তারই একটা পরিকল্পনা সম্রাটের কাছে পেশ করলুম। প্রণালীটির গভীরতা সম্বন্ধে আমি সর্বাধিক অভিজ্ঞ কয়েকজন নাবিকের সঙ্গে পরামর্শ করলুম। এ পথে তারা বহুবার চলাচল করেছে। তারা আমাকে বলল প্রণালীর মাঝখানটাই সবচেয়ে গভীর। জোয়ারের সময় সত্তর গ্লামগ্লাফ গভীর অর্থাৎ ইউরোপীয় মাপে ছ'ফুট। আর বাকি অংশ বড়জোর পঞ্চাশ গ্লামগ্লাফ। আমি হেঁটে ব্লেফুসকুর উত্তর-পূর্বতীরের দিকে গেলুম এবং পকেট থেকে দূরবিন বার করে একটা ছোট পাহাড়ের আড়াল থেকে ওদের নৌবহর লক্ষ্য করতে লাগলুম। দেখলুম যে পঞ্চাশটা যুদ্ধজাহাজ অনেক ছোট জাহাজ বা নৌকো রয়েছে। আমি বাড়িতে ফিরে এলুম। আমাকে আদেশ জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, সেই আদেশবলে আমি বললুম আমার

অনেক মজবুত দড়ি ও লোহার বার চাই। ওরা যে দড়ি আনল তা টুন সুতোর চেয়ে একটু মোটা আর লোহার রডগুলি সুচের মতো লম্বা ও মোটা। আমি তিনখানা করে সুতো নিয়ে পাকিয়ে মোটা করলুম আর লোহার রডগুলো বেঁকিয়ে হুক তৈরি করে দড়ির ডগায় বাঁধলুম। তারপর আমি আবার উত্তর-পূর্ব তীরে ফিরে গেলুম। আমার, কোট, মোজা ও জুতো খুলে ফেললুম, গায়ে রইল শুধু চামড়ার জার্কিন। জোয়ার আসবার আধঘণ্টা আগে জলে নামলুম, মাঝখানে তিরিশ গজ আন্দাজ সাঁতরে পার হয়ে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলুম। আধ ঘণ্টার আগেই আমি ওদের নৌবহরের কাছে পৌঁছে গেলুম। আমাকে দেখে শত্রুরা এত ভয় পেয়ে গেল যে ওরা জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পারে উঠল। পারে তখন হাজার তিরিশ ক্ষুদে সৈন্য জমায়েত হয়েছে। আমি তখন হুক বাঁধা দড়িগুলি বার করে ছিপ ফেলার মতো সেগুলি পর পর ছুঁড়ে মাছ ধরার মতো করে জাহাজগুলি গাঁথতে লাগলুম। ইতিমধ্যে আমার হাতে ও দেহের অন্য অংশে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর এসে বিঁধছে। খুবই বিরক্তিকর। মুখে যেগুলো বিঁধছিল সেগুলো আমাকে বেগ দিচ্ছিল। আমার ভয় হচ্ছিল চোখে যদি তীর বেঁধে তাহলে অন্ধ হয়ে যাব। কিন্তু চটকরে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। চশমাজোড়া আমার পকেটেই রয়েছে। সম্রাটের অনুসন্ধান-কারীরা আমাকে সার্চ করার সময় সেটা দেখতে পায় নি। আমি সেটা পকেট থেকে বার করে চট করে পরে নিলুম। এবার শত্রুর তীর উপেক্ষা করে সাহস করে এগিয়ে গেলাম। কিছু তীর এসে আমার চশমার কাঁচে আঘাত করল কিন্তু ঐ পর্যন্তই, কোনো ক্ষতি করতে পারল না। জাহাজগুলিতে আমার হুক লাগানো হয়ে গেল, এবার সব দড়ি একত্র করে টান মারলুম কিন্তু জাহাজ নড়ল না। বুঝলুম নোঙ্গর বাঁধা আছে। পকেট থেকে ছুরি বার করে নোঙ্গরের দড়িগুলো কচাকচ কেটে দিলুম। এদিকে শত শত তীর বর্ষিত হচ্ছে, হাতে ও মুখে তীর বিঁধছে। ভ্রূক্ষেপ না করে এবার সব দড়ি ধরে টান মারতেই জাহাজগুলো বন্দর থেকে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করল এবং পঞ্চাশটা যুদ্ধজাহাজ আমি টানতে টানতে নিয়ে ফিরে চললুম।

ব্লেফুসকুডিয়ানরা প্রথমে আমার মতলব বুঝতে পারে নি। কিন্তু পরে তারা আমার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক ও বিহ্বল হয়ে গেল। তারা আমাকে নোঙ্গরের দড়ি কাটতে দেখেছিল, তখন ভেবেছিল আমি বোধহয় জাহাজগুলোকে এদিক ওদিক ভাসিয়ে দোব। কিংবা জাহাজগুলো ভেঙে দোব। কিন্তু যখন দেখল জাহাজগুলোর কোনো ক্ষতি না করে সেগুলো জড়ো করে আমি টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছি তখন তারা হতাশ হয়ে এমন চেঁচামেচি করতে লাগল যে তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আমি যখন বুঝলুম আর বিপদের সম্ভাবনা নেই তখন আমি থামলুম এবং আমার মুখ ও হাত থেকে বিদ্ধ তীরগুলি পটাপট তুলে ফেললুম। এই দ্বীপে নামবার পর যখন আমি শরাহত হয়েছিলুম তখন লিলিপুটেরা আমাকে

যে মলম লাগিয়ে দিয়েছিল, এখন আমার কাছে সেই মলম খানিকটা ছিল। আমি তীর লাগা জায়গায় সেই মলম লাগিয়ে দিলুম। ইতিমধ্যে জোয়ার এসে গিয়েছিল তাই

সব দাঁড় ধরে টান মারতেই জাহাজ গুলো বন্দর থেকে বেরিয়ে আসতে আরম্ভ করল

আমি প্রায় এক ঘন্টা অপেক্ষা করলুম। জোয়ার কমে গেলে আবার চলতে আরম্ভ করলুম। চশমাটা খুলে পকেটে রাখলুম। জাহাজ বাঁধা দড়িগুলো বেশ করে ধরে জল ভেঙে এগিয়ে চললুম। এবং অবশেষে নিরাপদে লিলিপুট দেশের রাজবন্দরে পেঁছিলুম। অভিযানের ফলাফল জানবার জন্যে সম্রাট তাঁর সভাসদদের নিয়ে তীরে আমার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা দেখছিলেন জাহাজের বহর অর্ধচন্দ্রাকার বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু আমাকে তারা দেখতে পাচ্ছে না। তখন আমি এক বুক জলে এবং যখন প্রণালীর মাঝখানে গভীরতম জায়গাটিতে এসেছি তখন ত আমার একগলা জল, শুধু মুন্ডটি ভাসছে। সম্রাট তখন ভাবছিলেন আমি বুঝি ডুবে গেছি এবং শত্রুপক্ষের জাহাজ সার বেঁধে তাঁদের আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু অবিলম্বে তাঁর ভয় দূর হয়েছিল। ইতিমধ্যে জলের গভীরতা কমে গেছে এবং আমার দেহটাও ক্রমশঃ জল থেকে ওপরে উঠছে। এইভাবে আমি দ্বীপের কাছে এসে গেলুম এবং ওদের কথাও আমার কানে আসতে লাগল। আমি তখন জাহাজের দড়ির গুচ্ছ বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে বললুম "লিলিপুটের সর্বশক্তিমান মহারাজের জয় হুক।" তীরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আমাকে যথোচিতভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং তৎক্ষণাৎ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'নারডাক' দ্বারা আমাকে ভূষিত করলেন।

এবার সম্রাট আমাকে বললেন যে সুবিধামতো আর একদিন ঐ দ্বীপে গিয়ে শত্রুদের সমস্ত জাহাজ লিলিপুট বন্দরে নিয়ে আসতে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্যে সম্রাটের আকাংখা এত প্রবল যে তিনি চান ব্লেফুসকু দ্বীপটাকে অধিকার করে তাকে তাঁর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করতে। সে প্রদেশ শাসন করবে

তাঁরই প্রেরিত এক প্রতিনিধি বা ভাইসরয় এবং তিনি চান বিগ এনডিয়ানং নির্বাসিতদের ডিমের সরু দিক ভাঙতে বাধ্য করা ও তাদের ধ্বংস করা। এর ফলে সম্রাট সারা দুনিয়ার সম্রাট হতে পারবেন, কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর এই অভিসন্ধি থেকে নিরত করবার চেষ্টা করলুম। তাঁকে বোঝাতে চাইলুম যে তাহলে ঘোর অবিচার হবে, সুনীতি বলে না এমনভাবে প্রতিহিংসা নিতে। শেষ পর্যন্ত আমি বেঁকে দাঁড়ালুম এবং স্পষ্টই বললুম যে এক স্বাধীন ও সাহসী জাতিকে এইভাবে ক্রীতদাস করতে চাইলে তার মধ্যে আমি নেই। যখন এই বিষয় নিয়ে মন্ত্রণাসভায় ও রাজপরিষদে আলোচনা হল তখন অধিকাংশ জ্ঞানী ও গুণী মন্ত্রী ও পরামর্শদাতারা আমার অনুকূলেই মত দিলেন।

কিন্তু আমার এই স্পষ্ট ঘোষণা মহামান্য সম্রাটের পরিকল্পনার সহায়ক নয়। তিনি আমার যুক্তি মানতে রাজি নন ফলে তিনি আমাকে কখনই ক্ষমা করেন নি। মন্ত্রণা পরিষদে তিনি তাঁর মনোভাব সুকৌশলে ব্যক্ত করেছিলেন। আমি পরে শুনেছিলুম পরিষদে আমার সমর্থকরা সম্রাটের মুখের ওপর প্রতিবাদ করেন নি, তাঁরা নীরব ছিলেন কিন্তু একদল আমার শত্রু হয়েছিল তারা আমার বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। অচিরেই সম্রাট এবং আরও কয়েকজন আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন যা মাস দুয়েকের ভেতরেই সোচ্চার হয়ে উঠল এবং আমি প্রায় ধ্বংস হতে যাচ্ছিলুম। বুঝলুম রাজারাজড়াদের যতই সেবা করা যাক তাঁদের মন যুগিয়ে চলতে না পারলে পতন অনিবার্য। যে সেবা বা স্বার্থত্যাগ করা হয়েছে তা তখন মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

ব্লেফুসকু দ্বীপে হানা দেওয়ার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে শান্তির বিনীত প্রস্তাব নিয়ে ব্লেফুসকু থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দূত এল। বলা বাহুল্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল এবং পুরোপুরি আমাদের সম্রাটের অনুকূলে। চুক্তির সেসব শর্তের উল্লেখ করে আমি পাঠকদের বিরক্ত করতে চাই না। প্রায় পাঁচশজন উপদেষ্টা সমেত ছ'জন রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন। পরাজিত হলেও তারা এসেছিল সাড়ম্বরে যা তাদের সম্রাটের উপযুক্ত বলতে হবে অথচ ব্যাপারটির গুরুত্ব তারা লঘু করে দেখে নি। তারা রাজার কাছে রাজার মতোই এসেছিল। চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আমাকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি ওদের কিছু সাহায্য করেছিলুম এবং তারা আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে একদিন আমার বাড়িতে এল। তারা আমার সাহস ও উদারতার প্রশংসা করল কারণ আমি ত ইচ্ছে করলে ওদের জীবন ও সম্পত্তির প্রচুর ক্ষতি করতে পারতুম কিন্তু তা করিনি। তাদের সম্রাটের তরফ থেকে আমাকে তাদের দ্বীপে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। তারা আমার অসাধারণ শক্তি ও শৌর্যের কথা শুনেছে তার কিছু প্রমাণ দেখাতে বলল। আমি তাদের নিরাশ করলুম না তবে তার বিবরণ জানাবার দরকার মনে করছি না।

তারা অবশ্য আমার শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে অবাকও হল যেমন, সন্তুষ্টও হল তেমনি। আমিও তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের সম্রাটের প্রতি আমার অভিনন্দন

জানালুম। আরও জানালুম যে তাদের সম্রাটের বীরত্ব, অনুকম্পা ও সুশাসক হিসেবে তাঁর খ্যাতির কথা আমি শুনেছি এবং দেশে ফেরার আগে আমি স্বয়ং তাদের দ্বীপে গিয়ে সম্রাটকে আমার অভিনন্দন জানিয়ে আসব। পরবর্তী সময়ে আমাদের সম্রাটের সঙ্গে আমার যখন সাক্ষাৎ করার সুযোগ হল তখন আমি ব্লেফুসকুডিয়ান সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম। সম্রাট অবশ্য দয়া করে আমাকে অনুমতি দিলেন কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে নয়। কারণটা আমাকে তাঁরই একজন সভাসদ জানিয়েছিল। ব্লেফুসকু দ্বীপের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আমার যে সাক্ষাৎ হয়েছিল তারই এক বিকৃত রূপ ফ্লিমন্যাপ এবং বলগোলাম সম্রাটের কাছে পেশ করেছিল। তাতে সে অনেক রং চড়িয়েছিল। তাই সম্রাট আমার প্রতি একটু বিরূপ অথচ আমি বেআইনী কিছু করিনি। এই প্রথম আমি রাজসভার চক্র ও চক্রান্তের কিছু ধারণা করতে শিখলুম।

লক্ষণীয় যে ইউরোপে পাশাপাশি হলেও দুই দেশের মধ্যে যেমন ভাষার তফাত থাকে এবং দুই দেশেই যেমন নিজের ভাষার প্রাচীনত্ব, সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতা নিয়ে গৌরব বোধ করে অনুরূপভাবে ব্লেফুসকু ও লিলিপুট দ্বীপের ভাষাও ভিন্ন। লিলিপুটদের ভাষা শিখলেও আমি ওদের ভাষা জানি না অতএব আমাকে রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলতে হয়েছিল। তবুও আমাদের সম্রাট যুদ্ধে জয়লাভ করার সুবাদে ব্লেফুসকুডিয়ানদের বাধ্য করেছিলেন তাদের পরিচয়পত্র পেশ করতে এবং কথাবার্তা লিলিপুট দ্বীপের ভাষায় চালাতে। ব্যবসা বাণিজ্য নির্বাসিত বা আশ্রয়-প্রার্থী ও ভ্রমণ, শিক্ষা ইত্যাদির জন্যে উভয় দ্বীপের লোকজনই অপর দ্বীপে যাওয়া আসা করত। অবশ্য যুদ্ধের সময় ছাড়া। এই সূত্রে স্থানীয় অধিবাসী, ব্যবসায়ী বা নাবিক, অনেকেই অপর দ্বীপের ভাষা উত্তমরূপেই জানত। সেটা আমি জানতে পারলুম যখন কয়েক সপ্তাহ পরে আমি ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আমার শত্রুদের চক্রান্ত সত্ত্বেও আমার সে ভ্রমণ উপভোগ্য হয়েছিল। আমি যথাস্থানে তার বিবরণ দোব।

পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে বন্দীদশা থেকে আমার মুক্তির জন্যে যে সব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল তার কয়েকটি আমার মনঃপূত হয় নি এবং সেগুলি আমার কাছে অপমানজনক ও বশ্যতা স্বীকারের সামিল মনে হয়েছিল। কিন্তু তখন বাধ্য হয়েই আমাকে শর্তগুলি মেনে নিতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আমি এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'নারডাক' উপাধি দ্বারা ভূষিত। অতএব ঐসব শর্ত নিয়ে বর্তমানে আলোচনা করা আমার পক্ষে মর্যাদাহানিকর এবং সম্রাটও সেইসব শর্ত নিয়ে আর কথা তোলেন নি, তোলা সম্ভবও ছিল না। যাইহক সম্রাটের উপকার করার আমার একটা সুযোগ এল এবং আমার মতে যে কাজ আমি করেছিলুম তার জন্যে আমি প্রচুর কৃতিত্ব দাবি করতে পারি। একদিন মাঝ রাত্রে আমার দরজায় কয়েকশত লিলিপুটের চিৎকারে সহসা আমার ঘুম ভেঙে গেল। আকস্মিক এই গোলমালে আমি ভয় পেয়ে গেলুম। 'বার্গলাম', 'বার্গলাম' শব্দটা বার বার আমার কানে আসতে

লাগল। কয়েকজন মানুষ আমার কানের কাছে এসে বলতে লাগল, শিগগির চল রাজপ্রাসাদে আগুন লেগেছে। একজন দাসী একটা জমাটী উপন্যাস পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারই অমনোযোগীতার ফলে আগুন লেগে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে চিৎকার করে বললুম, সবাই সরে যাও, আমাকে রাস্তা ছেড়ে দাও। তারা সরে গেল, আমি প্রাসাদের দিকে ছুটলুম, আকাশে চাঁদ ছিল তাই কাউকে মাড়িয়ে ফেলিনি। প্রাসাদে পেঁছে দেখলুম ওরা দেওয়ালে মই লাগিয়ে বালতি করে জল তুলে জল ঢালছে। কিন্তু জল আনতে হচ্ছে অনেক দূর থেকে। তাছাড়া বালতি-গুলিও ছোট, দর্জিরা সেলাই করবার সময় আঙুলে যে টুপি পরে তার চেয়ে বেশি বড় নয়। তবুও তারা যথাসাধ্য করছে কিন্তু আগুনের প্রকোপ ভয়াবহ। ওটুকু জলে কিছুই হচ্ছে না। আমার গায়ে কোটটা থাকলে সেটা খুলে চাপা দিলে আগুন নিবে যেত। কিন্তু কোট ত আমি বাসায় রেখে এসেছি, তাড়াতাড়িতে শুধু লেদার জার্কিনটা পরে এসেছি। এদিকে আগুনে আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, সমস্ত প্রাসাদটাই বুঝি ছারখার হয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় আমার মাথায় এক উপস্থিত বুদ্ধি এসে গেল। গত সন্ধ্যায় আমি 'গ্লিমিগ্রিন' নামে এক অতি সুস্বাদু সুরা প্রচুর পরিমাণে পান করেছিলুম। ব্লেফুসকুডিয়ানরা এই সুরাকে 'ফ্লুনেক' বলে। এই সুরার একটি দোষ বা গুণ আছে। সেটি হল এটি মূত্রবর্ধক। সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি দীর্ঘসময় মূত্রত্যাগ করিনি অথচ ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই অমি তার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করছিলুম। আগুন নেবানোর আর কোন উপায় না দেখে আমি সেই আগুনের ওপরে প্রবল বেগে মূত্রত্যাগ করলুম এবং তিন মিনিটের মধ্যেই আগুন নিভে গেল এবং যে প্রাসাদ বহু দিন ধরে ও বহু ব্যয়ে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংস থেকে বেঁচে গেল।

দিনের আলো ফুটে উঠল আমি বাসায় ফিরে এলুম। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে সাহস হল না কারণ প্রাসাদটিকে যেভাবে বাঁচিয়েছিলুম তা শোভন নয়, রাজপ্রাসাদে মূত্রত্যাগ লজ্জাজনক, কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও ত ছিল না। রাজধানীতে রাজার বাসভবনে এ হেন কাজ নিশ্চয়ই আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই মনে কিছু ভয় নিয়েই ফিরে এলুম। যাইহক মহামান্য সম্রাটের দূতের কাছ থেকে একটা বার্তা পেয়ে কিছু আশ্বস্ত হলুম। ' সম্রাট নাকি আমাকে ক্ষমা করার জন্যে তাঁর বিচার বিভাগকে নির্দেশ দেবেন। কিন্তু সরকারীভাবে তা পাওয়া যায় নি।

আমি আরও একটা খবর পেলুম যে সম্রাজ্ঞী আমার দুষ্কর্মের জন্যে ঘৃণাভরে প্রাসাদের এক দূর প্রান্তে সরে গেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন তাঁর প্রাসাদের যে অংশ পুড়ে গেছে সে অংশ যেন মেরামত না করা হয়। মেরামত করলেও তিনি সেখানে ফিরে যাবেন না। ছিঃ ছিঃ কি কাণ্ড। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে তাঁর প্রিয় পাত্রীদের নাকি বলেছিলেন যে তিনি এর প্রতিকার করবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লিলিপুট বাসীদের পরিচয়, তাদের শিক্ষা; তাদের আইনকানুন, তাদের রীতিনীতি, শিশুদের শিক্ষাপদ্ধতি। সেদেশে লেখকের জীবনযাপন। জনৈক অভিজাত মহিলাকে দুর্নাম থেকে রক্ষা।

আমার মতলব ছিল যে সাম্রাজ্যের প্রবন্ধাকার বিশেষ এবং আলাদা একটা রচনা লিখব। কিন্তু পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে অমি দ্বীপের একটা সাধারণ পরিচয় দোব। দ্বীপবাসীদের গড় উচ্চতা মোটামুটি ছ ইঞ্চির নিচে এবং জীবজন্তু, পশু পক্ষী ও গাছপালার আকারও সেই অনুসারে। উদাহরণ স্বরূপ সবচেয়ে বড় ঘোড়া বা বলদ উচ্চতায় চার থেকে পাঁচ ইঞ্চি, ভেড়া দেড় ইঞ্চি, কম বা বেশী। হাঁসগুলো আমাদের দেশের চড়ুই পাখির চেয়ে ছোট। ছোট প্রাণীগুলো এইভাবেই ক্রমশঃ ছোট হয়েছে। পোকামাকড় ত আমার চোখেই পড়ে না, সেগুলো এতই ছোট যে আমার দৃষ্টির বাইরে। কিন্তু প্রকৃতি লিলিপুটিয়ানদের দৃষ্টিও সেই রকম করেছে। তারা ছোট ছোট জিনিসও ভালই দেখতে পায় এবং নিখুঁতভাবে। তবে বেশি দূরে তারা দেখতে পায় না। তাদের দৃষ্টি কেমন প্রখর তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। একদিন এক বাবুর্চিকে দেখলুম কোথা থেকে একটা লার্ক পাখি বার করল যেটা একটা মাছির মতো ছোট, আর একদিন দেখি একটি তরুণী সেলাই করছে কিন্তু তার ছুঁচ ও সুতো, দুইই আমার কাছে অদৃশ্য। তাদের সবচেয়ে উঁচু গাছ সাত ফুট লম্বা। রাজার বাগানে যেসব লম্বা গাছগুলো আছে আমি মুঠো করে হাত তুললেও তাদের স্পর্শ করতে পারি। শাকসবজিও সেই মাপ মতো। পাঠক তাদের আকার কল্পনা করে নেবেন।

আমি তাদের শিক্ষা ও পড়াশোনা সম্বন্ধে এখন বিশেষ কিছু বলব না তবে প্রায় সব বিষয়েই তাদের বিদ্যা কয়েক যুগ ধরে বিকশিত হয়েছে। তাদের হাতের লেখার পদ্ধতি বড়ই অদ্ভুত। তা ইউরোপীয়দের মতো বাঁ দিক থেকে ডান

দিকে নয় বা আরবীয়দের মতো ডান দিক থেকে বাঁ দিকেও নয়। চৈনিকদের মতো ওপর থেকে নিচে নয় বা কাসকাজিয়ানদের মতো তলা থেকে ওপর দিকে নয়। ইংলণ্ডের অনেক মহিলার মতো ওরা কাগজের কোণাকুনি লেখে।

মৃতদেহ কবর দেবার সময় মাথা রাখে নিচের দিকে এবং পা ওপর দিকে। তাদের মতে এগারো হাজার চাঁদ পরে তারা আবার কবর থেকে উঠে আসবে। তারা মনে করে পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং এই এগারো হাজার চাঁদের মধ্যে পৃথিবী উলটে যাবে। তখন মৃতরা পুনর্জীবন লাভ করবে এবং তাদের মাথা ওপর দিকে হয়ে যাবে। তারা তাদের নিজেদের পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারবে। এদের মধ্যে যারা পণ্ডিত তারা এই মতবাদে বিশ্বাস করে না; বলে এ অসম্ভব। তথাপি প্রচলিত প্রথা কেউ অমান্য করে না। এই রাজ্যে এমন কিছু আইন ও প্রথা আছে যা অতি অদ্ভুত। এইসব আইন ও প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আইন ও প্রথা সমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহলেও এদের যুক্তি আছে। তবুও কথা হচ্ছে এগুলি ওরা মেনে চলে কিনা। প্রথম উদাহরণটি আমি দোব গুপ্তচরদের সম্বন্ধে। এদেশে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে কোনো অপরাধের জন্যে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিচারের সময় নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারলে, যে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল তাকে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আর খালাস পাওয়া আসামী যেহেতু তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পেরেছে তখন অর্থ ও সময় অপচয়ের জন্যে; যে বিপদের ঝুঁকি তাকে নিতে হয়েছিল, কারাগারে অযথা তাকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এবং তাকে আত্ম-সমর্থনের সময় যে মনোকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এ সবের জন্যে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় চারগুণ। এই ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ ও সম্পত্তি আসে কোথা থেকে? যে ব্যক্তি অভিযোগ করেছিল এবং যার মৃত্যু দণ্ড হয়েছে তার ধনসম্পত্তি থেকে। কিন্তু সে ব্যক্তির যদি যথেষ্ট পরিমাণে ধনসম্পত্তি না থাকে তাহলে রাজকোষ থেকেই সবকিছু মিটিয়ে দেওয়া হয়। সম্রাটও মুক্তি পাওয়া আসামীকে কিছু আনুকূল্য বা সম্মান অর্পণ করেন এবং তার নির্দোষিতা সারা শহরে প্রচার করা হয়।

চুরি অপেক্ষা জাল জুয়াচুরিকে তারা বড় অপরাধ মনে করে এবং এজন্য মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। তারা বলে সাবধান হলে এবং নিজের জিনিসের ওপর নজর রাখলে চোর চুরি করতে পারে না কিন্তু ঠক ব্যক্তি পরের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে বিপদে ফেলে। ঠক ব্যক্তি সততা ভঙ্গ করে। জিনিষ বেচাকেনার সময় অসাধু ব্যবসায়ী যদি নির্দোষ ব্যক্তিদের ঠকাতে থাকে তাহলে সেই অসাধু ব্যবসায়ীকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং তাকে রোধ করবার জন্যে যদি কোনো আইন না থাকে তাহলে এই অসাধুতা বাড়তেই থাকবে এবং নির্দোষ ব্যক্তি চোরের শিকার হবে। আমার মনে পড়ছে আমি একবার অপরাধীর জন্যে সম্রাটের কাছে মধ্যস্থতা করেছিলুম। লোকটির কাছে তার মনিব বেশ কিছু অর্থ গচ্ছিত রেখেছিল কিন্তু লোকটি সেই অর্থ নিয়ে পালিয়ে যায়। লোকটির পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলেছিলুম

লোকটি শুধু বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। বিশ্বাসভঙ্গ বলে আমি যে লোকটিকে চরম দণ্ডের সামনে ফেলে দিলুম তা আমি বুঝতে পারিনি। তবে বুঝলুম বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রথা·অপরাধের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব ভিন্ন হতে পারে।

প্রত্যেক সরকারের পুরস্কার ও তিরস্কার অথবা ·শাস্তির প্রদানের ব্যবস্থা আছে তবে তা সর্বদা প্রয়োগ করা হয় না। তিরস্কার বা শাস্তিদানে সরকার অনেক ক্ষেত্রে উদার কিন্তু পুরস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুদার। একমাত্র লিলিপুটিয়ানদের দেখলুম তারা আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে। যদি কোনো ব্যক্তি প্রমাণ করতে পারে যে সে তিয়াত্তরটি চাঁদ ধরে দেশের আইন শৃঙ্খলা কঠোরভাবে মেনে চলেছে তাহলে তার প্রচলিত জীবনধারা ও ব্যক্তিগত গুণানুসারে তাকে নির্দিষ্ট একটি তহবিল থেকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয় যা সে ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে। এছাড়া তাদের 'স্নিলপল' বা 'আইনমান্যকারী' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। তবে এই উপাধি ওরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করতে পারে না। আমি যখন ওদের বলতুম যে আমাদের ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে শাস্তির বিধান আছে কিন্তু পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই ওরা অবাক হত। ওরা বলল ওদের বিচারালয়ে তাদের ন্যায়দেবীর ছ'টি চোখ আছে, দু'টি সামনে, দু'টি পিছনে আর দুটি দু'পাশে,। তিনি সব দিক দেখেন, তাঁর ডানহাতে আছে এক থলি সোনার মোহর আর বাঁ হাতে খাপেভরা তলোয়ার, শাস্তি অপেক্ষা পুরস্কারের ব্যবস্থাই অধিক।

চাকরিতে নিয়োগের জন্যে যোগ্যতা অথবা প্রার্থীর নৈতিক চরিত্র ও সততার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তারা বলে জনগণের জন্যেই সরকার, সেখানে জটিলতার কোনো স্থান নেই। জনগণ যেন সরকারী কাজকর্ম সহ্য ও সরলভাবে বুঝতে পারে। অতি বুদ্ধিমান লোক নিযুক্ত করলে এবং তারা কোনো দোষ করলে তারা সেই দোষ ঢাকবার জন্যে চতুরতার আশ্রয় নেয়। কারণ সে বুদ্ধি তার আছে কিন্তু সরল একজন কর্মী দোষ করলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে। এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ও কম যোগ্য কর্মী অপেক্ষা এই সরল মানুষকে বোঝা অনেক সহজ হয় এবং সে কাজে যে ভুল করেছে তা স্বীকার করার ফলে ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়ে না, সমাধান সহজ হয়।

অনুরূপভাবে এরা ঈশ্বরকে বিশ্বাসী মানুষকে চাকরীর জন্যে মনোনীত করে কারণ তাদের সম্রাট ঈশ্বরে বিশ্বাসী। সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বে যে বিশ্বাসী নয় সে সম্রাটেরও বিশ্বাসভাজন হতে পারে না।

এইজন্যে এখানে চাকরিতে নিয়োগের জন্যে ক্রীড়াকৌশলে দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়া হয়, সেখানে কোনো কারচুপি করার সুযোগ নেই। এই পরীক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সম্রাটের ঠাকুর্দা প্রচলন করেছিলেন।

অকৃতজ্ঞতা এদের দৃষ্টিতে মস্ত অপরাধ। তার যে উপকার করে সে উপকার সে যদি স্বীকার না করে তাহলে সে মনুষ্যজাতির শত্রু এবং এমন ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

লিলিপুটের দেশে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য অথবা সন্তানের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরস্পরের সম্পর্ক ওরা অন্য দৃষ্টিতে দেখে। ওরা বলে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে পশুর মতো মানুষেরও সন্তান জন্মায়। সন্তান তার অজানতেই পৃথিবীতে এসেছে অতএব পিতামাতার প্রতি তার কোনো দায়দায়িত্ব নাও থাকতে পারে। সেরকমই সন্তানদের শিক্ষার ভারও পিতামাতার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এই জন্যে প্রতি শহরে সাধারণের জন্যে নার্সারি ইসকুল আছে। বাচ্চার বয়স যেই কুড়ি চাঁদ হবে কারণ সেই বয়সে শিশুদের কিছু জ্ঞানগম্যি হয়, তখন কুটিরবাসী ও শ্রমিক ব্যতীত প্রত্যেক বাপমাকে তাদের ছেলেমেয়েদের নার্সারি ইসকুলে পাঠাতেই হবে। সেখানে তারা প্রতিপালিত হবে ও লেখাপড়া শিখবে। ছেলে ও মেয়েদের গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে এইসব নার্সারি ইসকুল কয়েক রকমের করা হয়েছে। এই সকল ইসকুলে নানা গুণের যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা আছে। তারা বাপ মায়ের বিত্ত ও পদমর্যাদা অনুসারে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলে। অবশ্য শিশুরা কতখানি নিতে পারবে সেদিকে নজর রাখা হয়, জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় না। আমি প্রথমে ছেলেদের নার্সারির কিছু কথা বলব তারপর মেয়েদের নার্সারির বিষয়।

ধনী ও অভিজাত পরিবারের ছেলেদের নার্সারি গুলিতে রাশভারি পণ্ডিত এবং যোগ্য সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত আছে। শিশুদের আহার ও পোশাক সাধারণ। সম্মান ও সততা, ন্যায়বিচার, সাহস, শালীনতা, দয়া, ধর্ম ও দেশের প্রতি প্রেম ও আনুগত্যের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে এবং তাদের সেই ভাবেই গড়ে তোলা হয়। আহার নিদ্রার অল্প সময় ব্যতীত ছাত্রদের কোনো না কোনো কাজে লিপ্ত রাখা হয়। তবে এর মধ্যে দু'ঘণ্টা খেলবার সময়। সেই সময়ে দৈহিক ব্যায়ামও করতে হয়। চার বছর বয়স পর্যন্ত তাদের জামাকাপড় পরিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু তারপর নিজেদের পোশাক নিজেকেই পরতে হয়, তারা যে পরিবারের ছেলে হক না কেন। কিছু বয়স্ক নারী কর্মী আছে। তাদের বয়স আমাদের পঞ্চাশ বছর বয়সের সমান। এই নারী কর্মীদের ঘরদোর সাফ, বাসন মাজা, ঝাড় পোঁছ ইত্যাদি কাজ করতে হয়। ছাত্রদের কখনও ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হয় না। সেজন্য অশিক্ষিত লোক মারফত কুশিক্ষা পাবার সুযোগ পায় না। ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট নার্সারিতে বা খেলাঘরে, মাঠে যাবার সময় সর্বদা সঙ্গে শিক্ষক বা তাঁর সহকারী সঙ্গে থাকেন। বাপমাকে বছরে দু'বার তাদের ছেলেকে দেখতে দেওয়া হয় তাও এক ঘণ্টার বেশি নয়। শিক্ষক সে সময় উপস্থিত থাকেন এবং ফিসফিস করে বা গোপনে কোনো কথা বলা তখন নিষেধ। খেলনা, টফি চকলেট বা কোনো উপহার আনা নিষিদ্ধ। এমন কি আদর করাও নিষেধ তবে প্রথম সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময় বাপমা ছেলেকে চুম্বন করতে পারে।

ছেলেদের শিক্ষার ও তাকে খুশি রাখার যাবতীয় খরচ বাপমাকে দিতে হয় এবং সেই খরচ আদায় করার ভার সরকারের।

সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, বৃত্তিধারী, পেশাজীবি এবং কারিগরদের ছেলেদের নার্সারিগুলিতে তুল্যমূল্যভাবে পরিচালিত হয়। কিন্তু যেসব ছাত্র পিতার বা অন্য কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করবে তাদের সাত বছর বয়স হলে শিক্ষানবিশী করতে দেওয়া হয়। যারা একটু উচ্চশ্রেণীর তাদের ছেলেদের পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ আমাদের একুশ বছর বয়সের সমান পর্যন্ত শিক্ষানবিশ থাকতে হয় তবে সাধারণতঃ শেষ তিন বছর ক্রমশঃ শিথিল করাও হয়।

বড়ঘরের মেয়েদের নার্সারির ব্যবস্থা ছেলেদের নার্সারির মতো। তবে মেয়েদের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষক বা সহকারি শিক্ষকের উপস্থিতিতে দাসী তাদের জামাকাপড় পরিয়ে দেয় কিন্তু পাঁচ বছর পার হলেই মেয়েরা নিজেদের পোশাক নিজেরাই পরে। কিন্তু এইসব দাসী বা নার্স যদি কখনও মেয়েদের কাছে কোনো বাজে গল্প করে বা কুশিক্ষা দেয় তাহলে তাদের শহরে প্রকাশ্যে বেত মারা হয়, এক বছর জেল দেওয়া হয় অথবা দেশের কোনো নির্জন স্থানে চিরজীবনের জন্য নির্বাসন দেওয়া হয়। ছেলেদের মতো মেয়েরাও সাহসী হতে শেখে, নির্বোধ হতে লজ্জা পায়। তারা অহেতুক দামী অলংকার পরে না তবে যেটুকু দরকার সেটুকু পরতে দেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রমে আমি কোনো তফাত দেখি নি তবে মেয়েদের ব্যায়াম ও খেলা তাদের উপযোগী করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের ঘর গেরস্থালীর কাজ ও সহবৎ শিখতে হয়। কারণ একদিন তারা বড় হবে, গৃহিণী হবে, স্বামীর পাশে দাঁড়াবে, অতিথিদের আপ্যায়ন করবে। বারো বছর বয়স হলে মেয়েদের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হয় কারণ তাদের তখন বিয়ের বয়স হয়েছে। যাবার আগে বাপ-মা শিক্ষকদের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যান এবং মেয়েও তার শিক্ষিকা ও বান্ধবীদের কাছ থেকে বিদায় নেবার আগে চোখের জল ফেলে। নিম্নস্তরের মেয়েদের নার্সারিতে মেয়েদের উপযোগী কাজ শেখানো হয়। যাদের শিক্ষানবিশীর জন্যে মনোনীত করা হয় তাদের সাত বছর বয়েসে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর বাকি মেয়েদের এগারো বছর বয়স পর্যন্ত রাখা হয়।

নিম্নস্তরের ব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের জন্যে নার্সারিতে তাদেরও বাপমাকে বছরে একবার টাকা দিতে হয় এবং একটা অংশ নার্সারির স্টুয়ার্ডকে দিতে হয়, তবে পরিমাণ কম। ধনী দরিদ্র সকলকেই তার ছেলেমেয়ের প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্য নিয়মিত অর্থ দেওয়া বাধ্যতামূলক। কারণ লিলিপুটিয়ানদের মতে দেশে যত ইচ্ছা সন্তান হবে আর তাদের প্রতিপালন ও শিক্ষার জন্যে রাজকোষ থেকে অর্থ দেওয়া হবে তা চলতে পারে না। ধনী পিতামাতা তাদের সন্তানদের সকল ব্যয় নির্বাহের জন্যে নার্সারীকে বেশী পরিমাণ অর্থ দেয়। শিক্ষাখাতে যে অর্থ আদায় ও ব্যয় করা হয় তার আয় ব্যয়ের হিসেব কঠোর ভাবে রক্ষিত হয়।

কুটিরবাসী ও শ্রমিকদের সন্তানরা নার্সারিতে যায় না কারণ তাদের জন্যে নার্সারি নেই। তারা বাড়িতেই থাকে এবং বড় হলে বাপ মায়ের পেশা বা বৃত্তি গ্রহণ করে। তারা জমি চাষ করে বা অন্য কাজ করে। পুঁথিগত বিদ্যা তাদের কাজে লাগে না।

এদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ বা রোগাক্রান্ত হয় তাদের হাসপাতালে আশ্রয় দেওয়া হয় কারণ লিলিপুট দ্বীপে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। ভিক্ষা কি, তারা জানে না।

এবার আমার কথা কিছু বলি। ন'মাস তেরো দিন আমি দ্বীপে কি করে অতিবাহিত করলুম, কি করে সময় কাটাতুম, কি কাজ করতুম, এ বিষয়ে পাঠকদের কৌতূহল হতে পারে। মাথায় ত নানারকম বুদ্ধি খেলে এবং প্রয়োজনও আছে তাই একদিন রাজার বাগান থেকে কাঠ নিয়ে এসে নিজের জন্যে কাজ চালানো গোছের একটা টেবিল আর চেয়ার তৈরি করলুম। আমার শার্ট ও বিছানার চাদর তৈরি করবার জন্যে দুশো জন মেয়ে দর্জি নিযুক্ত করা হল। একটা টেবলক্লথও তৈরি করতে হবে। ওরা যদিও বেশ মোটা ও মজবুত কাপড় এনেছিল তবুও তা আমার পক্ষে খুব পাতলা তাই ওরা কাপড়গুলো তিন পুরু করেছিল। শুধু তাই নয়, ওদের কাপড়ের থান তিন ইঞ্চি চওড়া আর তিন ফুট লম্বা অতএব সেইসব থান জুড়ে জুড়েও বড় থান তৈরি করতে হল। এবার আমার জামার মাপ নিতে হবে। আমি মাটিতে শুয়ে পড়লুম। বেশ মোটা দড়ি নিয়ে একজন দাঁড়াল আমার গলায় আর একজন আমার উরুর ওপর। আর একজন একটা মাপবার ফিতে দিয়ে সেই দড়িটা মাপতে লাগল। এইভাবে ওরা শার্টের ঝুলের মাপ নিল। তারপর ওরা আমার বুড়ো আঙুলের ঘেরের মাপ নিল। বুড়ো আঙুলের ডবল মাপ নাকি কব্জির ঘেরের মাপ। তারা আমার গলা ও কোমরের মাপও নিল। জামাটার প্যাটার্ন কেমন হবে তা বোঝাবার জন্যে আমি আমার পুরানো শার্টখানা জমিতে পেতে দিয়েছিলুম। তারা যে জামা তৈরি করল তা আমার গায়ে ঠিকই হয়েছিল। এরপর আমার কোট ও প্যান্ট তৈরি করতে হবে, সেজন্যে তিনশ দর্জি নিযুক্ত করা হল। আমার মাপ নেবার জন্যে তারা আমাকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলল তারপর মই লাগিয়ে আমার ঘাড়ে উঠে ওলন দড়ি ফেলে কোটের ঝুলের মাপ নিল। আমি দেখলুম এইভাবে মাপ নিতে ওদের অযথা পরিশ্রম হচ্ছে এবং অসুবিধেও হচ্ছে। তখন আমি ওদের দড়ি দিয়ে আমার হাত, কোমর ইত্যাদির মাপ নিয়ে ওদের বলতে লাগলুম। তারা আমার বাড়ির ভেতর একটা ঘরে বসে আমার কোট প্যান্ট তৈরি করতে লাগল। আমার বাড়িতে কারণ, ওগুলি যত তৈরি হয়ে আসছিল ততই ত মাঝে মাঝে তুলে ধরবার দরকার হচ্ছিল। দেখা দরকার জিনিসটা কেমন হচ্ছে। এভাবে জামা প্যান্ট ওদের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয় তাই মাঝে মাঝে আমাকেও সাহায্য করতে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত শার্ট, কোট ও প্যান্ট ভালই দাঁড়াল।

আমার খাবার তৈরির জন্যে তিনশ বাবুর্চি ও খানসামা নিযুক্ত হয়েছিল। তারা আমার বাড়ির কাছে কুটির তৈরি করে সপরিবারে বাস করত আর আমার জন্যে দু'টো পদ রান্না করে দিত। আমি কুড়িজন ওয়েটারকে আমার হাতে করে টেবিলে তুলে দিতুম, খিদমত খাটবার জন্যে নিচে থাকত একশ জন। তাদের কাছে থাকত সুরার পিপে। ওপরে যারা থাকত তারা টেবিলের কানায় চাকা লাগিয়ে রেখেছিল। ইউরোপে আমরা কুয়ো থেকে যেমন করে জল তুলি ওরা তেমনি চাকার ভেতর দিয়ে

দাড়ি ঝুলিয়ে দিত। দাড়ির প্রান্তে থাকত বালতি। নিচের খিদমত-গারেরা পিপে থেকে বালতিতে মদ ঢেলে দিত। ওরা সেই মদ উঠিয়ে নিয়ে টুলে চড়ে আমার গেলাসে ঢেলে দিত। ওদের এক ডিশ মাংস আমি এক গালেই শেষ করতুম আর এক পিপে মদ আমার গলা ভেজাতে পারত, তার বেশি নয়। ওদের মাটনও ভাল তবে খুব ছোট কিন্তু বিফ-এর টুকরো বড় এবং অতি সুস্বাদু। একবার কোথা থেকে একটা কোমরের টুকরো এনেছিল যেটা আমি এক গ্রাসে খেতে পারিনি, তিনটে টুকরো করতে হয়েছিল, তবে এত বড় টুকরো বিরল। আমরা স্বদেশে যেমন সহজে মুর্গির ঠ্যাং চিবিয়ে খাই এখানে মাংসর সরু সরু হাড়গোড়গুলো সেভাবে স্বচ্ছন্দে চিবিয়ে খেতে দেখে আমার বাবুর্চি, খানসামা ও ওয়েটাররা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। এছাড়া ওদের বিশ তিরিশটা পাখির মাংস আমি এক গ্রাসেই খেয়ে ফেলতুম। এমন রাক্ষুসে খাওয়া ত ওরা দেখে নি, অবাক হবেই ত!

আমার থাকা ও খাওয়ার খবর সম্রাটের কানে পেঁৗছে গিয়েছিল। তিনি স্বচক্ষে তা দেখবার জন্যে একদিন সম্রাজ্ঞী, রাজকুমার ও রাজকুমারীদের সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে আহার করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরা সকলেই অনুগ্রহ করে এলেন এবং আমি তাঁদের সযত্নে আমার টেবিলের ওপর তুলে নিলুম। রাজবাড়ি থেকে তাঁদের বসবার চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম আনিয়ে আমার টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছিলুম। এই ভোজে সম্রাটের প্রধান কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপও এসেছিল। খাবার সময় আমি লক্ষ্য করতে লাগলুম যে ফ্লিমন্যাপ আমার দিকে বাঁকা চোখে চাইছে যা আমার ভাল লাগে নি। আমি অবশ্য সেদিন বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছিলুম। কিন্তু আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। ফ্লিমন্যাপের কিছু একটা মতলব আছে। সম্রাট এই যে আমার বাড়িতে এলেন এর সুযোগ নিয়ে লোকটা নিশ্চয় সম্রাটের কান ভাঙাবে। আমার বিরুদ্ধে সে কিছু একটা করলে আশ্চর্য হব না। লোকটা স্বভাব-গম্ভীর তবুও আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে যদিও সেটা দেঁতো হাসি তথাপি আমি জানি লোকটা আমার দুষমন। আমার অনুমান মিথ্যা নয়। ফ্লিমন্যাপ সম্রাটের কাছে অভিযোগ করেছে যে রাজকোষের অবস্থা ভাল নয়, তাকে চড়া সুদে টাকা ধার করতে হচ্ছে কারণ হলুম আমি। আমাকে পুষতে সম্রাটের ইতিমধ্যেই সাড়ে লক্ষ স্প্রাগ (ওদের সবচেয়ে বড় আকারের স্বর্ণমুদ্রা, ছোট চুমকির মতো হবে আর কি) খরচ হয়ে গেছে অতএব তার পরামর্শ প্রথম সুযোগেই আমাকে বরখাস্ত করা হক।

আমার জন্য একজন নির্দোষ মহিলার কিছু দুর্নাম রটেছিল তবে আমি তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করে আবার তাঁকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলুম। সে কাহিনী এখানে বলা আমি কর্তব্য মনে করছি। রাজসভায় নানা রকম মানুষ থাকে, কারও বদঅভ্যাস পরনিন্দা করা চুকলি কাটা, অথচ এর দ্বারা তার কোনো স্বার্থ সিদ্ধ হবে না। এইরকম কোনো এক ব্যক্তি মহা-কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপের মাথায় ঢুকিয়ে দেয় যে তার স্ত্রী আমার প্রতি অনুরক্ত যা একেবারেই অসম্ভব। এই মুখরোচক সংবাদটি মাত্র কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি তা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ে। মহিলা অবশ্য

আমাকে পছন্দ করতেন, আমার বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন তবে কখনও একা বা গোপনে আসেন নি। যখনই এসেছেন তখনই সঙ্গে গাড়িতে এনেছেন অন্ততঃ তিনজনকে, তাঁরা তার বোন ও কন্যা বা অপর কোনো আত্মীয়া বা বান্ধবী। ওদেশের অভিজাত পরিবারের মহিলারা এমনও দলবেঁধে অনেকের বাড়ি যান। আমার

আমি তাদের সযত্নে আমার টেবিলের ওপর তুলে নিলুম।

ভৃত্যদের বলা ছিল আমার বাড়ির সামনে কোনো গাড়ি এসে থামলে আমাকে যেন আগে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ নিজে গিয়ে ঘোড়া ও গাড়ি সমেত সকলকে তুলে এনে আমার টেবিলে রাখতুম। টেবিলের এক অংশে আমি গোল বেড়া লাগিয়ে ঘিরে রেখেছিলুম, তার ভেতরে গাড়ি থাকত যাতে পড়ে না যায়। গাড়িতে ছ'টা ঘোড়া থাকলে সহিস দুটো ঘোড়া খুলে দিত, আমি সেদুটোকে পরে তুলে দিতুম। গাড়ি, ঘোড়া, সহিস, কোচোয়ানে আমার টেবিল ভর্তি হয়ে যেত। আমি যখন অতিথিদের সঙ্গে কথা বলতুম তখন কোচোয়ান কাউকে গাড়িতে চাপিয়ে আমার

টেবিলের ওপরেই গাড়ি ছোটাত। অনেক অপরাহ্ন আমি আমার অতিথিদের সঙ্গে গল্প করে মহানন্দে কাটিয়েছি। এই ডাহা মিথ্যা আমার কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হলুম একজন নির্দোষ মহিলার নামে এমন জঘন্য কলংক রটনার জন্যে আমি কোষাধ্যক্ষ ও সেই দু'জন বাজে লোক, কুস্ট্রিল আর ড্রনলো, যারা এই কলংক রটিয়েছিল তাদের ওপর অত্যন্ত চটে গেলুম। আমি চ্যালেঞ্জ জানালুম যে তারা প্রমাণ করুক যে কোনো পুরুষ বা মহিলা কখনও আমার কাছে গোপনে বা ছদ্মবেশে এসেছিল কি না। অবশ্য মুখ্য সচিব রেলড্রেসলি একবার সম্রাট কর্তৃক আমার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। সে ঘটনা আমি আগেই বলেছি। আমি দেশের সর্বোচ্চ 'নারডাক' উপাধিতে ভূষিত অতএব আমিও একজন মানী লোক। সেজন্যও নয়, আমার জন্যে একজন নির্দোষ মহিলার নামে কুৎসা রটবে এমন ঘটনা সহ্য করা যায় না। কোষাধ্যক্ষ মশাইও উচ্চ সম্মানে সম্মানিত, তিনি 'ক্লামগ্লাম' উপাধি পেয়েছেন কিন্তু তা নারডাক অপেক্ষা এক ডিগ্রি কম। যেমন ইংলন্ডে ডিউকের পরে মারকুইসের স্থান। তথাপি ফ্লিমন্যাপ অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং পদের সুযোগ সে পুরোপুরি গ্রহণ করে। বাজে গুজবে বিশ্বাস করে সে শুধু আমাকেই নয়, তার স্ত্রীকেও অবহেলা করেছিল। পরে যদিও সে তার ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছিল কিন্তু আমাকে সে অপদস্থ করতে ছাড়েনি। সম্রাটও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লেখক জানতে পারলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং তাঁকে শীঘ্রই অভিযুক্ত করা হবে। তিনি ব্লেফুসকু দ্বীপে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার বিবরণ।

এই রাজ্য ত্যাগ করার বিবরণ শোনাবার পূর্বে আমার বিরুদ্ধে দু'মাস ধরে যে ষড়যন্ত্র চলছিল সে বিষয় পাঠকদের জানান আমার উচিত।

আমি আমার জীবনে কখনও রাজা বা রাজসভার সংস্পর্শে আসি নি কারণ আমার সে যোগ্যতা ছিল না। আমি একজন বিত্তহীন সাধারণ নাগরিক অতএব রাজসভায় কি করে যেতে পারি? রাজা বা মন্ত্রীদের অনেক কেলেংকারি ও মুখরোচক প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের কাহিনী শুনেছি। তবে এই সব ব্যাপার যে আমাকে সম্পূর্ণ নতুন এক দেশে প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং সেই ভিন্নধর্মী দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হবে তা আমি কোনোদিন ভাবিনি, কল্পনাও করতে পারিনি। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় ক্ষুদে মানুষদের বিচিত্র দেশ লিলিপুট।

ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাটের আমন্ত্রণে আমি যখন সেই দেশে যাবার তোড়জোড় করছি ঠিক সেই সময়ে রাজসভার একজন দামী ব্যক্তি (ইনি একবার সম্রাটের বিষনজরে পড়েছিলেন, ও তখন আমি তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলুম) আমার বাড়িতে গোপনে বন্ধ পালকি চেপে এলেন। বাইরে যে পাহারায় ছিল তাকে বলল আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় কিন্তু নাম বলল না।

খবর পেয়ে আমি তখনি বাইরে এলুম এবং এহেন একজন অভিজাত ব্যক্তিকে এত রাত্রে দেখে অবাক হলুম। যাইহোক পালকিবাহকদের সরিয়ে দিয়ে আমি সেই অভিজাত ব্যক্তিকে পালকি সমেত আমার কোটের পকেটে ভরে নিলুম এবং আমার একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে বলে দিলুম যে আমার শরীর ভাল নেই, আমি ঘুমোতে যাচ্ছি, কেউ যেন বিরক্ত না করে। ঘরে ঢুকে বেশ করে দরজা বন্ধ করে মহামান্য

অতিথিকে পকেট থেকে বার করে তাঁকে টেবিলে যথারীতি বসিয়ে আমি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে, তার পাশে বসলুম। সৌজন্য বিনিময়ের পর লক্ষ্য করলুম যে আমার অতিথি বিশেষ ভাবে চিন্তিত। আমি তাঁকে তাঁর এই উৎকণ্ঠার কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে তিনি যা বলবেন তা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। কারণ ব্যাপারটির সঙ্গে আমার সম্মান এমন কি আমার জীবনের নিরাপত্তাও জড়িত। তিনি যা বললেন তা শুনে আমি বিস্মিত। তিনি চলে যাবার পর আমি তাঁর কথাগুলি লিখে রেখেছিলুম।

তিনি আমাকে বললেন, আপনাকে জানান দরকার যে কয়েকজন অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে রীতিমতো সক্রিয় এবং তাঁরা আপনাকে ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প। সম্রাটের কাছে ওরা গুরুতর অভিযোগ করেছে এবং দু'দিন হল সম্রাট কি করবেন তা স্থির করে ফেলেছেন। তিনি লিখিত নির্দেশ জারি করবেন।

আপনি জানেন যে আপনি এখানে আসার প্রায় গোড়া থেকেই স্কাইরিস
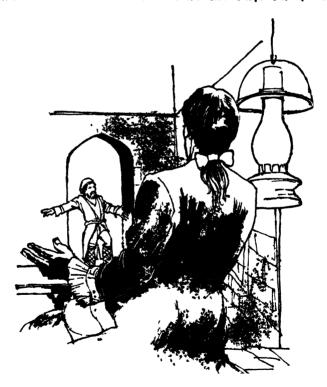
আপনার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতা ও সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে।

বলগোলাম (গালবেত অর্থাৎ নৌবহরের প্রধান অ্যাডমিরাল) আপনার সাংঘাতিক শত্রু। এই শত্রুতার ঠিক কি কারণ তা আমি জানি না তবে শ্রেফ্রসকুতে আপনার

অসামান্য সাফল্যের পর আপনার প্রতি ওর ঘৃণা যেন শতগুণে বেড়ে গেছে। হয়ত সে মনে করে অ্যাডমিরাল রূপে তার কৃতিত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্কাইরিস আপনার আর এক শত্রু কোষাধ্যক্ষ ফ্লিমন্যাপের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কেউ বা কারা আপনার নামের সঙ্গে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে কলংক রটিয়েছিল, সেই থেকে ফ্লিমন্যাপ আপনার ওপর খাপ্পা। প্রধান সেনাপতি লিমটক, চেম্বারলেন লালকন এবং বিচারপতি বালমাফ, তিন জন মিলে রাজদ্রোহীতা এবং আরও কিছু সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র জুড়ে আপনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ-পত্র সম্রাটের কাছে পেশ করেছে।

আমি ত জানি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং এসবের কিছুই আমি জানি না। তবুও তিনি যতটুকু বললেন তা শুনে আমি জ্বলে উঠলুম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শান্ত করলেন। তাঁর তখন ভয় আমি ক্ষেপে গেলে এখনি হয়ত সবকিছু ধ্বংস করে দেব। তিনি বললেন, এক সময়ে আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন সেজন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি। আপনার বিরুদ্ধে ওরা যে অভিযোগপত্র তৈরি করেছে তার একটা নকল আমি আপনার জন্যে সংগ্রহ করে এনেছি। আমি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এটি আপনার জন্যে এনেছি, ধরা পড়লে আমার মৃত্যুদণ্ড হতে পারে।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর আমি সেই অভিযোগ পত্রটি ভাল করে পড়লুম। আদালতে উকিল যেভাবে বিচারকের কাছে মামলার আবেদন পত্র পেশ করে বা বিধান সভায় বিধায়করা যেভাবে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পেশ করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ-পত্রটিও সেইভাবে রচিত হয়েছে।

কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন (পাহাড়-মানুষ)-এর বিরুদ্ধে
অভিযোগের বিভিন্ন ধারা।

১নং ধারা

যেহেতু মহামান্য সম্রাট ক্যালিন ডেফার প্লুন তাঁর রাজ্যে এমন একটি বিধিবদ্ধ আইন প্রচলিত করেছেন যার দ্বারা যে কেউ রাজপ্রাসাদের সীমানার মধ্যে মূত্রত্যাগ করলে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে এবং দণ্ডনীয় হবে এবং তৎসত্ত্বেও উক্ত কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন আইন লঙ্ঘন করে তাঁর প্রিয় মহিষীর কক্ষসমূহে অগ্নিকাণ্ড নির্বাপণের অজুহাতে অত্যন্ত হীন, জঘন্য ও অশোভনীয় ভাবে মূত্রত্যাগ করেছে এবং তদ্বারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে অতএব ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২নং ধারা

উক্ত কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন ব্লেফুসকু দ্বীপ থেকে সমুদয় রণতরী আটক করে লিলিপুটের রাজকীয় বন্দরে নিয়ে এসেছিল। আমাদের সম্রাট তখন তাকে আদেশ দিলেন যে ব্লেফুসকু রাজ্যের বাকি সব জাহাজগুলি তুমি আটক করে নিয়ে এস। উক্ত দ্বীপকে সম্রাট তাঁর সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে শাসন করবার প্রস্তাব করলেন। মহামান্য সম্রাট উক্ত পাহাড়-মানুষকে আদেশ করলেন উক্ত দ্বীপের সমস্ত নির্বাসিত বিগ-এনডিয়ান এবং উক্ত রাজ্যের সমস্ত মানুষকে

হত্যা করতে যারা বিগ-এনডিয়ানদের সংশ্রব ছাড়তে রাজি হবে না। কিন্তু তখন ঐ পাহাড়-মানুষ ফ্লেস্ট্রিন মহামান্য সম্রাটের এই পবিত্র আদেশগুলি বিশ্বাসঘাতকদের মতো প্রত্যাখ্যান করে বলল যে একদল নির্দোষ ও দুর্বল মানুষদের হত্যা করতে তার বিবেকে বাধছে।

৩নং ধারা

যেহেতু আমাদের মহামান্য সম্রাটের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করতে ব্লেফুসকু থেকে একদল রাষ্ট্রদূত এসেছিল তখন উক্ত ফ্লেস্ট্রিন সেই বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের সঙ্গে যারা আমাদের শত্রু বলে পরিগণিত এবং যারা তাদের রাজার ভৃত্য ব্যতীত আর কিছু নয় আমাদের দেশের প্রতি বিশ্বাসহানি করে মেলামেশা করেছিল এবং তাদের সান্ত্বনা দিয়েছিল বলেও প্রকাশ।

৪নং ধারা

উক্ত কুইনবাস ফ্লেস্ট্রিন যার কর্তব্য একজন অনুগত প্রজার মতো এদেশে বাস করা সে তা না করে ব্লেফুসকু রাজ্যের সম্রাটের কাছে যাবার ব্যবস্থা করছে। যদিও আমাদের মহামান্য সম্রাট তাকে মৌখিক সম্মতি জানিয়েছে কিন্তু কোনো লিখিত অনুমতি দেন নি। তথাপি সে আমাদের সম্রাটের মাত্র মৌখিক সম্মতির বলে আমাদের শত্রুর দেশে যেতে চাইছে এবং তদ্দ্বারা সে উক্ত শত্রু-সম্রাটকে পরোক্ষভাবে সান্ত্বনা দেবে এবং তার পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে সহায়ক হবে।

এছাড়া আরও কয়েকটি ধারা কিন্তু সেগুলি এখানে অবান্তর। আমি শুধু গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিই তুলে ধরলুম।

বিদায় নেবার আগে উক্ত ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন যে আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগপত্রটি নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে তার মন্ত্রী বা পরামর্শদাতাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল তাতে সম্রাট আপনার পক্ষ নিয়ে অনেক তর্ক করেছিলেন, আপনি দেশের অনেক উপকার করেছেন, দেশের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বন্ধ করেছেন এবং আপনার জন্যে সামান্যতম ক্ষতি সহ্য না করেও শত্রুকে অনায়াসে পরাজিত করতে পারা গেছে। কিন্তু কোষাধ্যক্ষ ও উক্ত অ্যাডমিরাল এতদূর শয়তান যে ওরা সম্রাটকে বলল যে আপনি যখন রাত্রে নিদ্রা যাবেন তখন আপনার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে আপনাকে পুড়িয়ে মারা হবে এবং সেনাপতি কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত থাকবে তারা আপনার মুখে ও হাতে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করবে। ওরা আরও স্থির করেছে যে আপনার কয়েকজন ভৃত্য মারফত আপনার শার্টে ও বিছানার চাদরে গোপনে একরকম তরল তীব্র বিষ মিশিয়ে রাখবে, আপনি সেই শার্ট পরে বিছানায় শুলে শরীর এমন জ্বালা করবে যেন মনে হবে আপনি আপনার দেহের চামড়া ছিঁড়ে ফেলে দেন। ভীষণ কষ্ট পেয়ে আপনি মারা যাবেন।

মুখ্য সচিব রেলড্রেসাল যে আপনার একজন বন্ধু বলে নিজেকে প্রচার করে তাঁকে সম্রাট আপনার সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে বলেছিলেন। রেলড্রেসাল অবশ্য সম্রাটের ভয়ে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। তিনি বলছিলেন পাহাড়-মানুষের

অপরাধ হয়ত গুরুতর কিন্তু তবুও তার প্রতি দয়া প্রকাশ করার অবকাশ আছে এবং দয়া ও ক্ষমাই ত হল রাজার ধর্ম। আর এই দয়া ও ক্ষমার জন্যই ত আমাদের সম্রাট বিশ্ববন্দিত। পাহাড়-মানুষ যে আপনার বন্ধু এ কথা সারা দেশ জানে, আপনি তাকে উচ্চ উপাধিও দিয়েছেন তাই হয়ত সে প্রশ্রয় পেয়ে এমন কিছু করেছে যা আপনার মনে আঘাত দিয়েছে তবুও আপনি তাকে যদি শাস্তি দেন তাহলে প্রাণে মারবেন কেন? আপনি বরঞ্চ তাকে শাস্তি স্বরূপ অন্ধ করে দিন তাহলে তার প্রতি সুবিচারও করা হবে অথচ আইন ভঙ্গের অপরাধে তাকে শাস্তিও দেওয়া হবে এবং আপনার উদারতার সকলে প্রশংসাই করবে। অন্ধ হয়ে গেলেও তার দৈহিক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সম্রাটের আদেশে কাজও করতে পারবে। মুখ্য সচিব সম্রাটকে আরও বুঝিয়েছে যে শত্রুর জাহাজগুলো টেনে আনবার সময় পাহাড়-মানুষের ভয় ছিল শত্রুর তীর বিঁধে সে বুঝি অন্ধ হয়ে যাবে। এখন অন্ধ হলে সে আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তাকে আমাদের চোখ দিয়েই দেখতে হবে, তাকে আমরা যা দেখাব সে তাই দেখবে।

কিন্তু মন্ত্রণা-সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। অ্যাডমিরাল বলগোলান ত রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, মুখ্য সচিব এ কি বলছেন? একটা বিশ্বাস-ঘাতককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে? উক্ত ভদ্রলোক আমাকে বলতে লাগলেন, আপনি যেসব উপকার করেছেন তা এখন আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। আপনি মূত্রত্যাগ করে রাজপ্রাসাদের আগুন নিবিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু ওদের ভয় আবার মূত্রত্যাগ করে ওদের ডুবিয়ে মারতে পারেন। কিংবা রাজপ্রাসাদটাই নষ্ট করে দিলেন? আপনি শত্রুপক্ষের জাহাজগুলো ধরে এনেছেন কিন্তু সেগুলো ত আবার ফিরিয়েও দিয়ে আসতে পারেন। কে আপনাকে বাধা দেবে? বলগোলানরা বলতে চায় যে মনে মনে আপনি একজন বিগ-এনডিয়ান, শত্রুপক্ষের সমর্থক অতএব আপনি রাজদ্রোহী এবং আপনার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

কোষাধ্যক্ষরও ঐ একই মত। সে বলে, শয়তানটাকে বাঁচিয়ে রেখে কি হবে? ওকে পুষতেই ত আমাদের রাজকোষ শূন্য হয়ে আসছে এবং আর কিছু দিন পরে ওকে খাওয়াবার জন্যে আর এক কপর্দকও সিন্দুকে পড়ে থাকবে না। তাকে অন্ধ করে দিলেও ত খাওয়াতে হবে। অন্ধ লোককে দিয়ে বেশি কাজও করানো যাবে না। বসে বসে খাবে আর ঘুমোবে আর আরও মোটা হবে আরও খেতে চাইবে, খেতে না পেলে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তখন কানা মানুষ ক্ষেপে গিয়ে, কি ক্ষতি করবে কে জানে? অতএব আপনি যে একজন ঘোরতর অপরাধী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে অপরাধ করেছেন তার আর ক্ষমা নেই আর বিষয়টি তলিয়ে দেখবার বা পুনর্বিচার করবার আর অবকাশও নেই অতএব আপনার একমাত্র উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

উক্ত ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, আমাদের মহামান্য সম্রাট কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে। তিনি বললেন, মানুষটাকে যে কোনো সময়ে অন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আর কেউ অন্য কোনো শাস্তির কথা বলতে পারেন কি? তখন আপনার

বন্ধু ঐ মুখ্যসচিব নতুন প্রস্তাব করলেন, কোষাধ্যক্ষ মহাশয় বলছেন যে পাহাড়-মানুষকে খাওয়াতে রাজকোষের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে এবং পাহাড়-মানুষকে খাওয়াতে গিয়ে আমরাই হয়ত অনাহারে মারা যাব। তাহলে আমার একটা অন্য প্রস্তাব আছে, পাহাড়-মানুষের আহারের বরাদ্দ ক্রমশঃ কমিয়ে দেওয়া হক তাহলে সেও ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাবে তাছাড়া কম খেতে খেতে তার খাবার ইচ্ছেও কমে যাবে, সে দুর্বল হতে থাকবে, মাঝে মঝে হয়ত অজ্ঞানও হয়ে যাবে এবং কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে। যখন মারা যাবে তখন সে ত হাড্ডিসার, মৃতদেহ পচে গেলেও তেমন দুর্গন্ধ নির্গত হবে না। আরও একটা কথা। তখন ত সে অনেক রোগা হয়ে গেছে, পাঁচ ছ হাজার লোক লাগিয়ে দিলে তারা ওর লাশটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও মাটিতে টুকরোগুলো পুঁতে দেবে। তাহলে দেহ এক জায়গায় পড়ে থেকে পচে গিয়ে রোগ ছড়াতে পারবে না আর তার কংকালটা তার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা দেখে অবাক হবে।

মুখ্য সচিবের উদ্যোগে শেষ পর্যন্ত একটা ফয়সালা হল। আপনাকে অনাহারে রাখার প্রস্তাবটা গোপন রাখা হয়েছে কিন্তু আপনাকে অন্ধ করার প্রস্তাব খাতায় লেখা হয়ে গেছে। এই প্রস্তাবে একমাত্র অ্যাডমিরাল বলগোলান ছাড়া আর কেউ আপত্তি করে নি। অ্যাডমিরাল হল সম্রাজ্ঞীর লোক, তাঁর আজ্ঞাবাহী। সম্রাজ্ঞী আপনার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। আপনি যে ভাবে প্রাসাদে তাঁর কক্ষগুলির আগুন নিবিয়েছেন শুধু বেআইনী নয় তাঁদের মতে ঘৃণ্য। এই কারণে সম্রাজ্ঞী সেই রাত্রি থেকেই আপনার প্রতি বিরূপ।

আপনার প্রিয় বন্ধু সেক্রেটারি মশাই আর তিন দিনের মধ্যে আপনার কাছে আসবেন এবং আপনার প্রতি অভিযোগের ধারাগুলি পড়ে শোনাবেন। তিনি আরও জানাবেন যে আমাদের মহামান্য সম্রাট আপনার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেন নি শুধু আপনার চক্ষু দু'টি বাজেয়াপ্ত করা হবে। আশা করা হচ্ছে যে আপনার প্রতি সম্রাটের এই অনুগ্রহ আপনি কৃতজ্ঞচিত্তে মেনে নেবেন এবং আপনার চক্ষুদ্বয় বাজেয়াপ্ত করতে সম্রাটের কুড়িজন সার্জন যখন আসবেন তখন আপনি শুয়ে পড়বেন। সার্জনরা তীক্ষ্ণ তীরে দিয়ে আপনার চক্ষুর মণিতে আঘাত করে সম্রাটের আদেশ পালন করবেন।

উক্ত ভদ্রলোক বললেন আপনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন সে আপনিই স্থির করবেন তবে আমি অপরের সন্দেহ এড়িয়ে যেভাবে এসেছি সেইরূপ গোপনে অবিলম্বে ফিরে যেতে চাই।

উনি চলে গেলেন এবং আমি আমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে লাগলুম। মন বিক্ষিপ্ত, নানা সন্দেহ।

আমি লক্ষ্য করেছি যখনই কোনো রাজা স্বয়ং বা তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শে কোনো ব্যক্তিকে দণ্ডবিধান করেন তখনই তাঁরা একটা লম্বা বক্তৃতা দেন যে আসামীর অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় তাকে খুব লঘু দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা সে মৃত্যুদণ্ড, বেতমারা বা

আজীবন নির্বাসন যাই হক না কেন। সম্রাট যে অত্যন্ত দয়াবান, এই কথাটা সাড়ম্বরে প্রচার করা হয় এবং শাস্তি যত বেশি নিষ্ঠুর হয় বক্তৃতাও তত বেশি লম্বা হয়। সব ক্ষেত্রে দোষ যে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হয় তাও নয়। আমি কোনো দিনই কোনো রাজদরবারে প্রবেশ করতে পারি নি, সে যোগ্যতাও আমার ছিল না অতএব রাজাদের কখন কি মর্জি হয় এবং তাঁদের দৃষ্টিতে কোনটা কড়া আর কোনটা কোমল সে বিচার করবার বুদ্ধিও আমার ছিল না তবে আমার ক্ষেত্রে আমার জন্য সম্রাট যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন তার কোথায় সম্রাটের দয়া প্রকাশ করা হয়েছে তা আমি বুঝতে পারলুম না। যাই হক আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের ধারাগুলি পড়ে আমার মনে হয়েছিল যে এদের বিচারে আমি হয়ত অপরাধ করেছি যদিও আমার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এবং সেজন্য আমি প্রশ্ন করতে পারি যে আমার অপরাধ কি ক্ষমার অযোগ্য? যাইহক আমার অবর্তমানে আমার বিচার করে আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, শত্রু পক্ষও প্রবল এবং শাস্তি হয়ত আমার মেনে নেওয়া কর্তব্য। তথাপি আমি মনে মনে জানি যে আমি যতক্ষণ মুক্ত আছি ততক্ষণ এরা আমার কিছুই করতে পারবে না, আমি এখনি প্রতিবাদ করতে পারি, বাধা দিতে পারি, ক্ষতি করতে পারি এবং তা করলে ওদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। আমি গোটাকতক পাথর ছুঁড়ে শহরটাকে ধ্বংস করে দিতে পারি। কিন্তু এই সর্বনাশা কাণ্ড করতে আমার মোটেই ইচ্ছে হল না কারণ আমার মুক্তির জন্যে আমি সম্রাটের কাছে শপথ নিয়েছি এবং তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট আনুকূল্যও পেয়েছি এবং তিনি দেশের সর্বোচ্চ যে 'নারডাক' উপাধি দ্বারা আমাকে সম্মানিত করেছেন তারও ত একটা মর্যাদা আছে। তা সত্ত্বেও আমাকে যে সম্রাট ও তাঁর পরামর্শদাতাগণ আরোপিত শাস্তি আমাকে মেনে নিতে হবে তার কোনো যুক্তি নেই।

অবশেষে আমি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে অতি উৎসাহে এবং আমার অভিজ্ঞতার অভাবে আমি যে সব কাণ্ড করেছি এবং আমাকে সেজন্যে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা আমি মানব না। আমার স্বাধীনতা এবং আমার দুই চোখ আমি হারাতে চাই না। অন্য দেশে দেখেছি যে আসামীর প্রতি দণ্ডবিধানের আগেই তার ওপর নির্যাতন চালানো হয় এবং আমার ক্ষেত্রে তেমন কিছু করাও হয় নি। এখনও আমি মুক্ত ও স্বাধীন। আমি ত একটা কাজ করতে পারি এবং সেজন্যে সম্রাট আমাকে মৌখিক সম্মতিও দিয়েছেন। আমি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ব্লেফুসকু দ্বীপে চলে যেতে পারি। তাই করা উচিত। এবং তা করতে হবে তিন দিনের মধ্যেই কারণ এই তিন দিনের মধ্যে আমাকে শাস্তি দেওয়া হবে। আমার প্রতি যে দণ্ডবিধান করা হযেছে তা ত আমি জানি না এবং সরকারীভাবে আমাকে জানানও হয় নি অতএব আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়ে পালিয়েও যাচ্ছি না। এই মতো স্থির করে আমি আমার সেই বন্ধু মুখ্য সচিবের নামে একখানি চিঠি লিখে রাখলুম যে আমি আজ সকালে ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাটের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে সেই দ্বীপে যাচ্ছি। তাঁর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে আমি দ্বীপের সেই অংশে গেলুম যেখানে নৌবহর রাখা

আছে। আমি সবচেয়ে বড় মানোয়ার যুদ্ধ জাহাজটা বেছে নিলুম, তাতে একটা দড়ি বাঁধলুম এবং যাতে ভিজে না যায় এজন্যে আমি সব পোশাক খুলে জাহাজটার ওপর (শুধু আমার বিছানার চাদরটা বগলদাবা করে রাখলুম) জড়ো করে রেখে নোঙর তুলে জাহাজটাকে টানতে টানতে ব্লেফুসকু দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। গোড়ায় জল কম ছিল, হেঁটে চললুম তারপর জল যখন বেশি তখন সাঁতার কাটি এই ভাবে ব্লেফুসকু দ্বীপের রাজবন্দরে পেঁছিলুম। ঐ দ্বীপের লোকেরা আমার আগমন অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে ওরা ভয় পেল না। রাজবাড়ি যাব শুনে দু'জন পথ প্রদর্শক দিল। রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম। দ্বীপের যা নাম রাজধানীরও তাই নাম। পথ-প্রদর্শক দুজনকে আমার হাতে তুলে নিয়েছিলুম। রাজবাড়ির ফটকের দুশো গজের মধ্যে এসে আমি আমার পথ প্রদর্শক দুজনকে নামিয়ে দিয়ে তাদের বললুম, কোনো একজন সচিবকে খবর দিয়ে বল আমি বাইরে সম্রাটের আদেশের জন্যে অপেক্ষা করছি। এক ঘণ্টা পরে সাড়া পেলুম। রাজপরিবার সহ সম্রাট স্বয়ং এসেছেন আমাকে অভ্যার্থনা জানাতে। সঙ্গে এসেছেন দরবারের সভাসদগণ। আমি

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর হস্ত চুম্বন করবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লুম।

একশ গজ এগিয়ে গেলুম। সম্রাট ও তাঁর সঙ্গীগণ ঘোড়া থেকে নামলেন, সম্রাজ্ঞী ও মহিলারা নামলেন তাঁদের গাড়ি থেকে। আমার বৃহৎ শরীর দেখে তাঁরা যে ভয়

পেয়েছেন আমার মনে হল না। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর হস্ত চুম্বন করবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লুম। সম্রাটকে আমি বললুম যে আমি তাঁর কাছে আসব কথা দিয়েছিলুম। এখন আমি পরাক্রমশালী সম্রাটের দর্শন পেলুম এবং তাঁর কোনোরকম সেবা করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। এদেশে আসবার জন্যে আমার সম্রাট আগেই তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন কিন্তু আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে সেসব কথা আমি উচ্চারণ করলুম না। কারণ আমাকে ত কিছু জানানো হয় নি অতএব ও ব্যাপারে অজ্ঞ থাকাই ভাল। আমি যে সব জেনেশুনেই এই দ্বীপে পালিয়ে এসেছি এমন কোন ধারণা আমার সম্রাট করতে পারবেন না। কিন্তু আমি বোধহয় ভুল বুঝেছিলুম।

ব্লেফুসকু দ্বীপের সম্রাট ও জনগণ আমাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন তার বিস্তারিত বিবরণী জানিয়ে আমি পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না তবে মহান সম্রাট তাঁর উদারতা অনুযায়ীই আমাকে সমাদর করেছিলেন। এখানে আমি বাড়ি পাইনি, অসুবিধা হচ্ছিল। শোবার ব্যবস্থাও নেই, বিছানার চাদর জড়িয়ে মাটিতেই শুতে হল, এসব অসুবিধার কথাও এখন মুলতুবি থাক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সৌভাগ্যক্রমে লেখক অকস্মাৎ এমন একটা কিছু পেয়ে পেলেন যার সাহায্যে তিনি কিছু বিপদ কাটিয়ে ব্লেফুসকু ত্যাগ করে স্বদেশে নিরাপদে ফিরতে পেরেছিলেন।

ব্লেফুসকু দ্বীপে আমি তিন দিন এসেছি। একদিন ঘুরতে ঘুরতে দ্বীপের উত্তর-পূব দিকে গেছি। দূরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দেখছি। আধ লিগ আন্দাজ দূরে কি যেন একটা চোখে পড়ল, একটা নৌকো যেন উলটে গেছে। অমনি তখনি আমার জুতো মোজা খুলে ফেললুম তারপর জল ভেঙে সেই ওলটানো নৌকোর দিকে এগিয়ে চললুম, এখানে সমুদ্র অগভীর। প্রায় দুই তিনশ গজ যাবার পর মনে হল জোয়ারের টানে বস্তুটা বুঝি আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। আরও কাছে আসতে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ওটা সত্যিই একটা নৌকো। ওটা বোধহয় ঝড়ে কোনো জাহাজ থেকে ছিটকে সমুদ্রে পড়ে গেছে তারপর ভাসতে ভাসতে এদিকে চলে এসেছে। আমি তখনি শহরে ফিরে এলুম এবং রাজাবাহাদুরকে বললুম তাঁর নৌবহর বাজেয়াপ্ত হবার পরও যে সব জাহাজ আছে তাদের মধ্যে উচ্চতম কুড়িটি জাহাজ এবং ভাইস-অ্যাডমিরালের অধীন তিন হাজার নাবিক যদি আমাকে দেন ত আমার উপকার হয়। রাজাহাদুরের আদেশ পেয়ে পাল তুলে জাহাজগুলি ছেড়ে দিল। আমি হাঁটাপথে দ্বীপের উত্তর-পূব দিকে সেখানে গেলুম যেখানে নৌকোটি দেখা গিয়েছিল। জোয়ার তখন অনেক এগিয়ে এসেছে। নাবিকদের কাছে আছে দড়ি। আমি আগেই ওদের সুতোর মতো দড়ি পাকিয়ে মোটা করে নিয়েছিলুম। দড়িগুলি বেশ মজবুত হয়েছিল। এদিকে জাহাজগুলি কাছে এসে পড়েছে, আমি জামা-কাপড় খুলে জলে নেমে পড়ে নৌকোটার দিকে এগিয়ে চললুম কিন্তু নৌকো যখন আর একশ গজ দূরে তখন আমাকে সাঁতার কাটতে হল কারণ ইতিমধ্যে জল বেড়েছে। যখন নৌকো আমার হাতের নাগালে তখন নাবিকরা আমার দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিল। নৌকোতে একটা গর্তে আমি

সেই দড়ি বাঁধলুম আর অপর প্রান্ত একটা মানোয়ারি জাহাজের সংগে বাঁধলুম কিন্তু আমার পরিশ্রম কোনো কাজে লাগল না। আমার পা জমিতে থাকলে যে জোর পেতুম এখন ত সে জোর পাচ্ছি না অতএব আমি নাবিকদের পুরো সাহায্য করতে পারছি না। তবুও আমি ঘুরে নৌকোর অপর দিকে চলে গেলুম এবং এক হাত দিয়ে নৌকোটাকে ডাঙার দিকে ঠেলতে লাগলুম। জোয়ারের কিছু সাহায্য পাচ্ছিলুম। খানিকটা এগিয়ে আসা গেল, জল আমার দাড়ি পর্যন্ত কিন্তু পায়ের নিচে মাটি পাওয়া গেল। দু' তিন মিনিট দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিলুম, দম ফুরিয়ে গিয়েছিল তারপর নৌকোটাকে আবার ঠেলা মারতে লাগলুম। ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছি, জল এখন আমার বুক পর্যন্ত। এবার খুব খাটুনির কাজ আরম্ভ হল। জাহাজে যে দড়িগুলো রাখা ছিল সেগুলো বার করে নৌকার সংগে বাঁধলুম আর অপর প্রান্ত বাঁধলুম ন'টা জাহাজের সংগে। বাতাস এখন জাহাজগুলোর পালের অনুকূলে আর আমিও নৌকোটাকে ঠেলা মারছি। এই রকম করে ডাঙার চল্লিশ গজের মধ্যে এসে গেলুম। ভাঁটা আরম্ভ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। আমারও বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। তারপর নৌকোতে আরও দড়ি বেঁধে, দুহাজার নাবিক ও এঞ্জিনের সাহায্যে নৌকোটাকে সোজা করা গেল। পরীক্ষা করে দেখলুম নৌকোটার বিশেষ ক্ষতি হয় নি।

এবার দরকার দাঁড়ের। দাঁড় তৈরি করবার জন্যে দশদিন ধরে আমাকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার বিবরণ জানিয়ে আমি পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। দাঁড় তৈরি করে নৌকোটাকে আমি ব্লেফুসকুর রাজবন্দরে নিয়ে গেলুম। এই অদ্ভুত জলযানটি দেখবার জন্যে সেখানে তখন হাজার হাজার নরনারী জমায়েত হয়েছে। আমি রাজাবাহাদুরকে বললুম যে সৌভাগ্যক্রমে নৌকাটি আমার দৃষ্টিপথে এসে গেছে। আমি এখন এই নৌকো ভাসিয়ে এমন কোনো জায়গায় যেতে পারব যেখান থেকে আমি আমার স্বদেশে ফিরে যেতে সক্ষম হব। আমি রাজাবাহাদুরের কাছে সাহায্য-ভিক্ষা করলুম যাতে আমি নৌকোটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারি। কারণ সমুদ্র যাত্রায় অনেক কিছু প্রয়োজন হবে। এছাড়া দেশ ছাড়বার জন্যে রাজাবাহাদুরের অনুমতিও চাইলুম। তিনি অনেক বাহানা করার পর সম্মতি দিলেন।

কিন্তু আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, এতদিন ত আমি এই দ্বীপে এসেছি কিন্তু লিলিপুট দ্বীপের সম্রাট ব্লেফুসকু দ্বীপের রাজবাহাদুরের কাছে আমার জন্য ত একবারও খোঁজ করলেন না ? আমার ধারণা ঠিক নয়। পরে অন্য সূত্র থেকে আমি জানতে পারলুম যে লিলিপুট দ্বীপের সম্রাটের ধারণা যে আমার প্রতি তাঁরা যে শাস্তি প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন তা আমি না জেনে এবং সম্রাটের মৌখিক সম্মতির বলে শুধু আমন্ত্রণ রক্ষার জন্যে ব্লেফুসকু দ্বীপে গেছি অতএব কয়েকদিন পর সেখানে ফিরে গেলেই আমার প্রতি পূর্বে নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। তখন তাঁর কোষাধ্যক্ষ ও পরামর্শদাতাদের মত নিয়ে, আমাকে অভিযুক্ত করে যে অভিযোগ পত্র রচিত হয়েছিল সেইটি সমেত একজন

দূত ব্লেফুসকু দরবারে প্রেরিত হল। সেই দূতকে ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুরকে বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে আমার কোনো অপরাধের জন্য লিলিপুট সম্রাট আমাকে খুব লঘু শাস্তিই দিয়েছেন, শুধু আমার চোখদুটি উপড়ে ফেলা হবে। আমি বিচার এড়াবার জন্যে পালিয়ে গেছি এবং যদি দু ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না যাই তাহলে আমাকে দেওয়া 'নারডাক' উপাধি কেড়ে নেওয়া হবে এবং আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করা হবে। সেই দূত আরও বলল যে দুই দ্বীপের মধ্যে শান্তি ও প্রীতি রক্ষার জন্যে তাঁর প্রভু মহামান্য সম্রাট আশা করেন যে তাঁর ভ্রাতা ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর আমার হাত পা বেঁধে আমাকে ফেরত পাঠাবেন যাতে বিশ্বাসঘাতককে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়।

লিলিপুটের সম্রাটকে উত্তর দেবার জন্যে ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর তাঁর আমাত্যদের সঙ্গে তিন দিন ধরে পরামর্শ করলেন এবং কিছু অজুহাত দেখিয়ে অনেক বিনয় প্রকাশ করে উত্তর দিলেন। তিনি লিখলেন ভ্রাতা জানেন যে লোকটির হাত পা বাঁধা অসম্ভব এবং পাঠানও এক সমস্যা। যদিও এই লোকটি তাঁর নৌবহর আটক করে নিয়ে গিয়েছিল তথাপি দুই দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে সে বড় একটা অংশ গ্রহণ করেছিল সেজন্য তার কাছে আমি ঋণী। তবে আমরা উভয়েই তার হাত থেকে শীঘ্রই অব্যাহতি পাব কারণ আমার দ্বীপের অনতিদূরে সে এমন একটি জলযান পেয়েছে যার সাহায্যে সে শীঘ্রই এই দ্বীপ ত্যাগ করবে। আমি অবশ্য জলযানটি সাগর পাড়ি দেবার উপযোগী করতে সাহায্য করেছি। এমন একটি মানুষকে ভরণপোষণ করা আমাদের উভয়ের পক্ষে অসম্ভব। যাইহক আমরা অচিরেই তার হাত থেকে মুক্তি পাব।

এই উত্তর নিয়ে রাষ্ট্রদূত লিলিপুটে ফিরে গেল। ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর আমাকে সব জানালেন এবং আমাকে অতি গোপনে বললেন যে যতদিন আমি তাঁর কাছে থাকব ততদিন তিনি আমায় আশ্রয় দেবেন ও রক্ষা করবেন। আমি যদিও তাঁর আন্তরিকতায় বিশ্বাস করেছিলুম, কিন্তু রাজা ও মন্ত্রীদের ওপর আমার আর বিশ্বাস নেই। আমি এখন ওঁদের এড়িয়ে চলতে চাই। অতএব আমি তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললুম, আমাকে ক্ষমা করবেন স্বদেশে ফেরবার জন্যে আমি এখন ব্যাকুল। সৌভাগ্য বশতঃ আমি যখন একটা জলযান পেয়েই গেছি তখন ভালই হক আর মন্দই হক আমি ঐ জলযান আশ্রয় করে সমুদ্রে ভেসে পড়তে চাই। আপনাদের মতো দুটি শক্তিশালী দেশের মধ্যে আমি আর বিবাদের কারণ হয়ে থাকতে চাই না। আমার কথা শুনে রাজাবাহাদুর অসন্তুষ্ট হলেন না বরঞ্চ আমার প্রস্তাব শুনে তিনি ও তাঁর মন্ত্রীরা আনন্দিতই হলেন।

রাজাবাহাদুর ও তাঁর মন্ত্রীদের সমর্থন লাভ করে আমি আমার যাত্রার দিন আরও এগিয়ে আনলুম। আমি লক্ষ্য করলুম যে যাতে আমি তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে পারি সেজন্যে সভাসদরাও উদ্যোগী হয়েছে। নৌকোর একটা পাল তৈরি করবার জন্যে পাঁচশত কর্মী নিযুক্ত হল। তারা আমার নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে লাগল।

দ্বীপে প্রাপ্ত সবচেয়ে মজবুত কাপড় সংগ্রহ করে এবং সেগুলি তেরো বার ভাঁজ করে কাজচলা গোছের দু'টো পাল তৈরি করা গেল। পাল খাটাবার জন্যে মোটা দড়ি দরকার। দশটা, কুড়িটা এমন কি তিরিশটি পর্যন্ত দড়ি পাকিয়ে মোটা ও যতদূরে সম্ভব লম্বা দড়ি তৈরি করলুম। দ্বীপে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বড় একটা পাথর সংগ্রহ করলুম যেটা আমার নোঙরের কাজ করবে। নৌকোতে লাগাবার জন্যে এবং অন্য কাজের জন্যে আমাকে তিনশ'টি গরুর চর্বি যোগাড় করে দেওয়া হল। মাস্তুল ও দাঁড় তৈরি করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল। বড় বড় গাছ কেটে তাও তৈরি করা হল। রাজাবাহাদুরের ছুতোর মিস্ত্রিরা সেগুলি মসৃণ করে দিয়েছিল।

সব আয়োজন সম্পূর্ণ করতে প্রায় এক মাস সময় লাগল এবং বিদায় নেবার জন্যে আমি রাজাবাহাদুরের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলুম। রাজাবাহাদুর এবং রাজপরিবারের সকলে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজাবাহাদুরের হস্ত চুম্বন করবার জন্যে আমি মাটিতে শুয়ে পড়লুম। অনুগ্রহ করে তিনি ও পরে মহারানী ও রাজকুমাররাও তাদের হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাজাবাহাদুর আমাকে পঞ্চাশটি থলি উপহার দিলেন। প্রতি থলিতে ছিল দুইশতটি স্প্রাগ মুদ্রা। তিনি তাঁর একটি পূর্ণাবয়ব ছবিও দিলেন। এগুলি আমি সযত্নে আমার একটি দস্তানার মধ্যে ভরে রাখলুম। বিদায় অনুষ্ঠানের দীর্ঘ বিবরণী পাঠকদের পীড়িত করতে পারে এজন্যে আমি বিরত হলুম।

নৌকোতে আমি একশটি বলদ ও তিনশ ভেড়ার মৃতদেহ বোঝাই করলুম এবং অনুরূপ পরিমাণে রুটি ও সুরা এবং চারশ বাবুর্চি যত মাংস রান্না করে দিতে পারল তত পরিমাণ মাংস। আমি সঙ্গে নিলুম ছ'টি জীবন্ত গরু ও দু'টি ষাঁড় এবং অতগুলি মাদী ও পুরুষ ভেড়া। দেশে যদি ফিরতে পারি ত ওদের বাচ্চা উৎপাদন করাব। ওদের খাওয়াবার জন্যে অনেক বোঝা খড় ও দানা নিলুম। আমাদের ইচ্ছে ছিল বারোজন স্থানীয় নরনারী সঙ্গে নিতে কিন্তু তাঁদের অনিচ্ছা দেখে আমি বিরত হলুম তথাপি রাজাবাহাদুরের লোকেরা আমার পকেটগুলি একবার দেখে নিল, কৌতুক করেও আমি কাউকে তুলে নিয়েছি কিনা দেখবার জন্যে।

এইভাবে প্রস্তুত হয়ে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের চব্বিশ তারিখে সকাল ছ'টায় আমি পাল তুলে দিলুম। উত্তর দিকে চার লিগ যাবার পর উত্তর-পূব দিক থেকে প্রবাহিত বাতাসে আমার নৌকোর পাল ফুলে উঠল এবং সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম দিকে আধ লিগ আন্দাজ দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেলুম। দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলুম এবং বাতাসের বিপরীত দিকে গিয়ে নোঙর ফেললুম। দ্বীপে নেমে বুঝলুম ওখানে মনুষ্যবাস নেই। কিছু আহার করে বিশ্রাম করতে লাগলুম। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। বোধহয় ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলুম কারণ আমি জেগে ওঠার আর দু'ঘণ্টা পরে ভোর হল। রাত্রিটা বেশ পরিষ্কার ছিল। সূর্য ওঠার আগেই আমি ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিলুম। লক্ষ্য করলুম বাতাস অনুকূল অতএব নোঙ্গর তুলে নৌকো ছেড়ে দিলুম। আগের দিন যে দিকে যাচ্ছিলুম সেই দিকেই চললুম। সঙ্গে একটা

পকেট কম্পাস ছিল, সেই ছোট্ট কম্পাস আমায় দিক ঠিক করতে সাহায্য করছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে সম্ভব হলে এমন একটা দ্বীপে পেঁছনো যেটা ভ্যান ডিমেনস দ্বীপের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। আমার ধারণা এমন একটা দ্বীপ ওদিকে আছে। কিন্তু সারা দিনেও কোনো দ্বীপ আবিষ্কার করতে পারলুম না। পরদিন বেলা তিনটে নাগাদ আমি হিসেব করে দেখলুম যে ব্লেফুসকু দ্বীপ থেকে চব্বিশ লিগ পর্যন্ত এসেছি আর ঠিক সেই সময়ে আমি দক্ষিণ-পূব দিকে জাহাজের পাল দেখতে পেলুম। আমি তখন যাচ্ছিলুম পূর্ব দিকে। আমি সেই জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলুম কিন্তু কোনো সাড়া পেলুম না। নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে যেতে লাগলুম। তখন বাতাসের বেগ কমে আসছে। তবুও আমি নানাভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলুম। আধঘণ্টা বাদে আমার চেষ্টা সফল হল। ওরা আমাকে দেখতে পেল এবং তা জানিয়ে দেবার জন্যে একটা পতাকা তুলল আর সেই সঙ্গে করল কামানের আওয়াজ। তখন যে আমার কি আনন্দ হল তা কি বলব! আমি আবার স্বদেশে ফিরে যেতে পারব, আবার আমার চেনামুখগুলি দেখতে পাব। জাহাজ তার গতি কমাল। তারিখটা আমার মনে আছে, ২৬ সেপ্টেম্বর। জাহাজের কাছে যখন পেঁছলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, পাঁচটা বেজে গেছে কিন্তু ছ'টা বাজে নি। পতাকা দেখে যখন চিনতে পারলুম যে জাহাজটা ব্রিটিশ তখন আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠল। গরু ও ভেড়াগুলি আমার পকেটে নিলুম এবং খাদ্যদ্রব্য সমেত সমস্ত মালপত্তর জাহাজে তুললুম। জাহাজখানা ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ, উত্তর এবং দক্ষিণ সমুদ্র দিয়ে জাপান থেকে আসছে। জাহাজের ক্যাপটেন মিঃ জন বিডেল ডেপ্টফোর্ডের মানুষ, অতি সজ্জন ব্যক্তি এবং জাহাজ চালনায় দক্ষ। আমরা এখন দক্ষিণে ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশে রয়েছি। জাহাজে প্রায় পঞ্চাশ জন এবং আমার একজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল, তার নাম পিটার উইলিয়মস। পিটার আমাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় আমার কিছু গুণগান করল। ক্যাপটেন আমার সঙ্গে সদ্ব্যহার করতে লাগলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি কোথা থেকে আসছি এবং কোথায় যেতে চাই। আমি যখন সংক্ষেপে সবকিছু বললুম তখন তাঁরা ভাবলেন আমি বাজে কথা বলছি কিংবা সমুদ্রে বিপদে পড়ার ফলে আমার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি পকেট থেকে যখন জীবন্ত গরু ভেড়াগুলি একে একে বার করে টেবিলের ওপর রাখলুম তখন ত তারা অবাক। তারা বুঝল আমি ওদের ধোঁকা দিই নি। ব্লেফুসকুর রাজাবাহাদুর আমাকে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিয়েছিলেন সেগুলি এবং রাজাবাহাদুরেব পূর্ণাবয়ব ছবিটি এবং ঐ দুই দ্বীপের কিছু অদ্ভুত জিনিস ক্যাপটেনকে দেখালুম। একশত স্প্রাগ ভর্তি দু'টি থলি আমি ক্যাপটেনকে উপহার দিলুম এবং বললুম যে ইংলন্ডে পেঁছলে আমি তাঁকে বাচ্চা সমেত একটি গরু ও একটি ভেড়া উপহার দেব।

আমি এই সমুদ্রযাত্রার বিবরণী দিয়ে পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না তবে বাকি যাত্রাপথ বেশ নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল আমরা

ইংলণ্ডের ডাউনস-এ পৌঁছলুম। একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ইঁদুর আমার একটি ভেড়া ধরে নিয়ে গিয়েছিল, হাড়গুলো একটা গর্তে পেয়েছিলুম, মাংস পরিষ্কার করে খেয়ে নিয়েছিল। বাকি পশুগুলি আমি নিরাপদে নিয়ে যেতে পেরেছিলুম। দেশে পৌঁছে আমি পশুগুলিকে গ্রীনউইচে সবুজ ঘাস ভর্তি একটা মাঠে ছেড়ে দিয়েছিলুম। আমার আশংকা ছিল ওরা হয়ত এদেশে টিকবে না কিন্তু আমার সব আশংকা দূর

আমি পকেট থেকে জীবন্ত গরু ভেড়াগুলি বার করে টেবিলের ওপর রাখলুম।

করে ওরা দিব্যি ঘাস খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। জাহাজেও তাদের হয়ত বাঁচিয়ে আনতে পারতুম না যদি নাকি ক্যাপটেন আমাকে তাঁর ভাঁড়ার থেকে কিছু বিসকুট না দিতেন। এই বিস্কুট গুঁড়ো করে জলে গুলে আমি তাদের খাওয়াতুম। তারপর আমি ইংলণ্ডে যে কটা দিন ছিলুম আমি আমার ক্ষুদ্র পশুগুলি ইংলণ্ডে নামীদামী ব্যক্তিদের দেখিয়ে বেশ দু' পয়সা আয় করেছিলুম। আমি আমার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করবার পূর্বে পশুগুলি ছ'শো পাউণ্ডে বেচে দিয়েছিলুম। পরের সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে এসে খবর নিতে গিয়ে দেখলুম ভেড়াগুলি ছানা পোনা বিইয়ে সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। ওদের কোমল পশমের নিশ্চয় খুব চাহিদা হবে। আমি আমার

স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে দুমাস থাকলুম কিন্তু আরও দূর দেশ দেখবার জন্যে আমার ভ্রমণ-পিয়াসী মন চঞ্চল হয়ে উঠল। নিশ্চিন্ত পারিবারিক জীবন আমাকে আটকে রাখতে পারল না। আমি আমার স্ত্রীর হাতে দেড় হাজার পাউন্ড দিলুম এবং তাকে রেডরিফ-এ একটি বাড়িতে থিতু করেছিলুম। যে টাকা বাকি রইল তা থেকে নগদ কিছু সঙ্গে রাখলুম, কিছু জিনিস কিনলুম। সেগুলি বিদেশে বেচে মোটা লাভ করতে পারব। এপিং-এর কাছে আমার বড় আংকল আমাকে খানিকটা জমি দিয়েছিলেন যা থেকে বার্ষিক প্রায় তিরিশ পাউন্ড পাওয়া যেত। এছাড়া ফেটার লেনে আমি 'ব্ল্যাক-বুল' পানশালা দীর্ঘ মেয়াদী লিজে রেখেছিলুম। তা থেকেও ভাল আয় হ'ত। অতএব আমি আমার পরিবারের ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি। পরে ওদের অপরের দয়ায় নির্ভর করতে হবে না। আমার ছেলের নাম জনি, নামকরণ তার আংকেলের নামানুসারে, এখন গ্রামার ইসকুলে পড়ছে, শান্ত বালক। আমার মেয়ে বেটি (তার বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেপুলেও হয়েছে) সেলাই নিয়ে মেতে আছে। স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কাছে বিদায় নিলুম। সকলের চোখেই জল। তারপর জাহাজে গিয়ে উঠলুম। জাহাজটির নাম 'অ্যাডভেঞ্চার', তিনশ টনের মালবাহী জাহাজ, ভারতবর্ষে সুরাট অভিমুখে যাবে। ক্যাপটেনের নাম জন নিকোলাস, লিভারপুল বাসী। আমার এই সমুদ্রযাত্রার বৃত্তান্ত আমার ভ্রমণকাহিনীর দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত হবে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভাগ

ব্রবডিংনাগদের দেশে

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুমুল ঝড়ের বিবরণ। জাহাজ থেকে লম্বা নৌকো নামিয়ে দ্বীপে পাঠান হল পানীয় জল আনতে। দ্বীপটা দেখবার জন্যে লেখকও সঙ্গী হলেন। তাঁকে ফেলে সঙ্গীরা চলে গেল, স্থানীয় এক অধিবাসী লেখককে পাকড়াও করে এক চাষীর বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে আশ্রয়লাভ এবং কয়েকটি দুর্ঘটনা। সেই দেশ-বাসীদের বর্ণনা।

আমার চঞ্চল প্রকৃতি আর অস্থির জীবন আমাকে শান্তিতে ঘরে চুপ করে বসে থাকতে দেবে না। তা নইলে অত সব কাণ্ড কারখানার পর দু মাসের মধ্যেই আমার পায়ে কে এমন সুড়সুড়ি দিতে লাগল ? অতএব আমি আবার স্বদেশ ত্যাগ করলুম এবং ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন ডাউনস-এ গিয়ে জাহাজে উঠলুম। জাহাজের নাম অ্যাডভেঞ্চার, ক্যাপটেনের নাম জন নিকোলাস, কর্নওয়ালের মানুষ, দক্ষ কমাণ্ডার। জাহাজ যাবে সুরাট। জাহাজ ছাড়ল, জোর বাতাসের সহায়তায় দক্ষিণ আফ্রিকার একেবারে তলায় আমরা 'কেপ অফ গুড হোপ'-এ পৌঁছে গেলুম। বড় বন্দর। এখানে জাহাজে পানীয় জল নিতে হবে। জাহাজ ছাড়বার আগে একটা ছিদ্র আবিষ্কৃত হল। সেটা মেরামত করা দরকার। জাহাজ থেকে মালপত্তর নামাতে হল। মেরামত করতে সময় লাগবে। শীত পড়েছিল, স্থির হল শীতটা এখানেই কাটিয়ে যাব। অন্য একটা কারণও ছিল। ক্যাপটেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সারা দেহে অজানা ব্যথা। 'কেপ অফ গুড হোপ' বন্দর ছাড়তে ছাড়তে মার্চ মাস হয়ে গেল। পাল তোলা হল, পালে বাতাস লাগল, পাল ফুলে উঠল, জাহাজ চলল। ম্যাডাগাসকার প্রণালী একদিনে পার হলুম নির্ঝঞ্ঝাটে। কিন্তু প্রণালী পার হয়ে ম্যাডাগাসকার দ্বীপের উত্তরে পাঁচ ডিগ্রি অক্ষাংশে যখন পৌঁছলুম তখন থেকেই গোলমাল আরম্ভ হল। এই অঞ্চলে ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে প্রবল বেগে বাতাস বইতে থাকে। ১৯ এপ্রিল থেকে বাতাসের বেগ

উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল বিশেষ করে পশ্চিমা বাতাসটা। বাতাস নয় রীতিমতো ঝড়। ঝড়ের দাপাদাপি চলল কুড়ি দিন। ঝড় আমাদের তাড়িয়ে এনেছে মলাক্কা দ্বীপের পূব দিক পর্যন্ত। ঝড় এক সময়ে শান্ত হল, ক্যাপটেন হিসেব করে বললেন আমরা আমাদের পথ থেকে তিন ডিগ্রি সরে এসেছি। সমুদ্র এখন শান্ত কিন্তু আমার মন শান্ত হল না কারণ এদিককার সমুদ্র আমাদের জানা আছে, যে কোনো মুহূর্তে আবার ঝড় উঠতে পারে এবং আমরাও সেজন্য প্রস্তুত হলুম। ভালভাবে প্রস্তুত হতে না হতে পরদিনই ঝড় উঠল। ঝড় আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। এ ঝড়ের নাম দক্ষিণ মৌসুমী, সাদার্ন মনসুন। ঝড়ের বেগ বাড়বে আমরা জানি, জাহাজ সামলানো খুবই দুরূহ ব্যাপার। জাহাজে অনেক আকারের অনেক পাল আছে, সে সবের পৃথক নামও আছে। বাতাস অনুসারে সেসব পাল খাটাতে হয়, ওঠাতে হয়, নামাতে হয়, দারুণ পরিশ্রমের ব্যাপার এবং ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি না করতে পারলে যে কোনো সময়ে বিপদ আঘাত করবে। এর ওপর মাস্তুল, হাল ও জাহাজের অন্যান্য অংশও সামলাতে হয়। সোজা কাজ নয়। তারপর আছে নাবিকদের মেজাজ। কখন কে কি মেজাজে থাকবে তা সেই নাবিক নিজেই জানে না। এসব তো গেল প্রাকৃতিক ব্যাপার তারপর ভয় আছে জলদস্যুদের। তারাও যে কখন কোন দিক থেকে এসে চড়াও হবে কে জানে।

যাই হক দক্ষিণ মৌসুমী ঝড় উঠল, আমাদের প্রচণ্ড বেগ দিতে লাগল। আহার নিদ্রা একরকম ত্যাগ করে জাহাজের পাল, হাল, মাস্তুল এই সব নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত রইলুম। তবুও জাহাজকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারলুম না। আমাদের তখন একমাত্র লক্ষ্য ছিল জাহাজ বাঁচানো, অতএব কোন দিকে যাচ্ছি জানি না।

ঝড় একদিন থামল। জাহাজখানা বেশ মজবুত ছিল তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। ঝড় থামলেও বাতাসের বেগ আছে ফলে আমাদের জাহাজ তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। অনুমান করা হল আমরা বোধ হয় আমাদের পথ থেকে পাঁচশ লিগ সরে গেছি কিন্তু কোন সমুদ্রের কোথায় আছি তা আমাদের প্রবীণতম নাবিকও বলতে পারল না। আমাদের জাহাজে প্রচুর খাদ্য ছিল। অত পরিশ্রম সত্ত্বেও আমাদের সকলের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল কিন্তু একটা সংকট দেখা দিল। পানীয় জল ফুরিয়ে এসেছে। আর একটা সমস্যা আমরা এখন কোন দিকে যাব ? সুরাটের পথে ফিরে যাবার চেষ্টা করাই উচিত কিন্তু কোথায় আছি তাই ত বুঝতে পারছি না, শেষে না বরফ জমা সমুদ্রে চলে যাই !

মাস্তুলের মাথায় একজন ছোকরাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সে মাঝে মাঝে হাঁক পাড়ছে। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুন তারিখে হাঁক দিল, ডাঙা দেখা যাচ্ছে। সতের তারিখে আমরা বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলুম একটা মস্ত বড় দ্বীপের অংশ অথবা মহাদেশও হতে পারে (কারণ আমরা তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলুম না)। ঐ দ্বীপ বা দেশ থেকে লম্বা খানিকটা জমি সমুদ্রের দিকে এগিয়ে এসেছে আর সমুদ্রের একটা খাঁড়ি ডাঙার ভেতর ঢুকে গেছে কিন্তু খাঁড়িটা গভীর নয়, একশ টনের ওপর জাহাজ

ভেতরে ঢুকতে পারবে না। আমরা এই খাঁড়ির এক লিগের মধ্যে নোঙর ফেললুম। ভেতরে যদি পানীয় জল পাওয়া যায় এজন্যে আমাদের ক্যাপটেন পাত্রসহ বারোজন সশস্ত্র নাবিককে লম্বা নৌকোয় চাপিয়ে পাঠালেন। আমিও সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলুম, দেশটা একটু দেখতে চাই এবং যদি কিছু আবিষ্কার করতে পারি সেই আশায়। নৌকো থেকে ডাঙায় নেমে আমরা ভেতরে এগিয়ে চললুম কিন্তু কোনো নদী বা ঝরণা এমন কি মানুষের কোনো বাসভূমিও আমাদের চোখে পড়ল না। অন্যান্য সকলে যখন সমুদ্রের উপকূলের দিকে গেল সেখানে যদি স্বাদু জল পাওয়া যায়, আমি তখন ভেতরের দিকে এগিয়ে চললুম। ভেতরে মাইলখানেক ঢুকে পড়লুম, মনে হল দেশটা অনুর্বর, পাথুরে। ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলুম এবং উল্লেখযোগ্য কিছু দেখা যাবে না অনুমান করে আমি খাঁড়ির দিকে ফিরতে লাগলুম। সমুদ্র বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আমি দেখলুম আমার সঙ্গী নাবিকেরা নৌকোয় উঠে পড়েছে এবং প্রাণপণে নৌকো চালিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে চলেছে। যদিও কোনো কাজ হত না তবুও আমি ওদের চিৎকার করে ডাকতে গেলুম আর তখনি দেখলুম বিশাল একটা প্রাণী দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রাণীটা এক হাঁটু জলে নেমে পড়েছে, লম্বালম্বা পা ফেলছে। আমাদের লোকেরা তখন তার থেকে আধ লিগ দূরে। জলের নিচে ছুঁচলো পাথর থাকে, জলও গভীর হচ্ছে তাই প্রাণীটা আর এগিয়ে গিয়ে নৌকোটা ধরতে পারল না।

আমি প্রাণপণে ছুটে একটা উঁচু পাহাড়ে উঠলুম।

এই ঘটনার বিবরণ আমি পরে শুনেছিলুম কিন্তু এখন যা ঘটছিল বা ঘটতে যাচ্ছে তা

দাঁড়িয়ে দেখবার মতো আমার সাহস তখন ছিল না। যে দিক থেকে এসেছিলুম, আমি সেই দিকে প্রাণপণে ছুটতে লাগলুম তারপর একটা উঁচু পাহাড়ে উঠে দেশটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলুম। দেখলুম সারা অঞ্চলেই জমি চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু আমি অবাক হলুম ঘাসের দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করে। সম্ভবতঃ গবাদি পশুর জন্যে যেগুলি আঁটি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে সেগুলি অন্ততঃ কুড়ি ফুট লম্বা।

পাহাড় থেকে নেমে আমি একটা বার্লি ক্ষেতের মাঝ-পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। পথটা আমার কাছে বেশ চওড়া মনে হল কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের কাছে সেটা নিশ্চয় গলি পথ। এই পথ ধরে আমি হেঁটে চললুম কিন্তু উভয় দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শস্য দেখে মনে হল ফসল কাটার সময় হয়েছে। বার্লির শিষগুলি চল্লিশ ফুট উঁচুতে হাওয়ায় দুলছে। এক ঘণ্টা হাঁটার পর ক্ষেতের শেষ প্রান্তে পৌঁছলুম। বেড়াগাছ দিয়ে ক্ষেতটি ঘেরা আর সেই বেড়া অন্ততঃ একশ কুড়ি ফুট উঁচু হবে। বড় গাছগুলি যে কত উঁচু আমি তা হিসেব করতে পারলুম না। এই ক্ষেত থেকে পাশের ক্ষেতের মাঝে একটা বাঁধ কিন্তু তার ওপারে যাবার জন্যে ধাপ কাটা আছে। চারটে করে মোট ধাপ। একেবারে মাথায় আছে একটি পাথর। এই বাঁধ পার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ প্রতি ধাপ ছ ফুট উঁচু আর মাথার ওপর পাথরটা কুড়ি ফুটের ওপর ত হবেই। বেড়ার মাঝে কোনো ফাঁক আছে কিনা আমি খোঁজ করছি তখন দেখলুম অপর দিকের ক্ষেত থেকে এই দেশের একজন অধিবাসী ধাপকাটা বাঁধের দিকে এগিয়ে আসছে। খানিকটা আগে আমাদের নৌকো তাড়া করতে যে মানুষটাকে দেখেছিলুম এর আকারও তত বড়। লোকটা গির্জার চুড়োর সমান লম্বা হবে আর মনে হল এক একবার পা ফেলছে আর দশ গজ এগিয়ে আসছে। আমি যতটা অবাক হলুম ভয়ও পেলুম ততটা এবং বার্লি ক্ষেতের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করতে লাগলুম। লোকটা তখন ধাপকাটা বাঁধের ওপর উঠে পড়ে তার ডান দিকের ক্ষেতে ঘাড় ফিরিয়ে কাকে যেন ডাকছে। গলার আওয়াজ কি? যেন আকাশ ফাটিয়ে ভেরী বাজছে। তার কান ফাটানো গলার আওয়াজ প্রথমে শুনে আমার মনে হয়েছিল যেন বাজ পড়ল। তার ডাক শুনে তারই মতো সাতটা দৈত্য এল। তাদের প্রত্যেকের হাতে শস্য কাটবার কাস্তে, প্রতিটা কাস্তে আমাদের অন্ততঃ ছ'টা কাস্তের সমান। প্রথম লোকটির মতো এই লোকগুলির পরিচ্ছদে তফাত আছে, এরা বোধহয় ওর ভৃত্য বা জন মজুর। কারণ প্রথম ব্যক্তির কথা শুনে আমি যে ক্ষেতে লুকিয়েছিলুম সেই ক্ষেতে বার্লি কাটতে এল। আমি যতদূর সম্ভব তাদের থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করলুম কিন্তু ক্ষেতে বার্লিগাছ এত ঘন যে আমি তাদের ফাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না। গাছের ফাঁক কোথাও কোথাও এক ফুটেরও কম, সেইটুকু ফাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি পালান সম্ভব নয়। তবুও আমি চেষ্টা করে এগিয়ে চললুম এবং এমন একটা জায়গায় পৌঁছলুম যেখানে বৃষ্টি ও হাওয়ার ফলে গাছগুলো মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ওই জায়গাটা পার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব তাছাড়া বার্লির শিষগুলি ছুঁচলো আর গাছের পাশ ধারালো। নড়তে গেলে হাত পা কাটছে

কিংবা শিবের খোঁচা লেগে জামাকাপড় ছিঁড়ছে। এদিকে আবার কয়েক জন জন-মজুর আমার পিছনে একশ গজের মধ্যে এসে গেছে। কি যে করি! পথশ্রম, দুঃখবোধ ও হতাশায় আমি ভেঙে পড়ছি। দুটো খাঁজের মধ্যে একটা জায়গা বেছে নিয়ে আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে গুটিয়ে-শুটিয়ে শুয়ে পড়লুম। মনে প্রাণে ভাবতে লাগলুম জীবন শেষ হয়ে যাক। আমি আমার হতভাগিনী বিধবা আর পিতৃহীন সন্তানদের কথা চিন্তা করতে লাগলুম। হায়! আমি কি মূর্খ! বন্ধু ও আত্মীয়দের পরামর্শ উপেক্ষা করে কেন আমি দ্বিতীয়বার সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়লুম। মনের এই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় লিলিপুটদের কথা মনে পড়ল। আমাকে দেখে তারা ভেবেছিল এত বড় অতিকায় মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। সেদেশে একটা পুরো নৌবহর আমি আমার হাত দিয়ে টেনে এনেছিলুম এবং আর যেসব কাণ্ড কারখানা করেছি সেসব ত তাদের দেশের ইতিহাসে লেখা থাকবে যা তাদের বংশধররা হয়ত বিশ্বাসই করবে না যদিও সারা লিলিপুট দেশ সেই অসম্ভব ঘটনার সাক্ষী। এই দৈত্যদের মধ্যে এসে আমি ভাবতে লাগলুম যে আমাদের মধ্যে মাত্র একটি লিলিপুট দ্বীপবাসী ক্ষুদ্র প্রাণী যদি এসে পড়ত তাহলে তার যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা হত এখন এই দৈত্যদের মাঝে পড়ে আমার সেই অভিজ্ঞতা হতে চলেছে। লিলিপুটদের দেশে আমি কি বাহাদুরীই না দেখিয়ে এসেছি ভেবে আমার অনুতাপ হতে লাগল। যদি ধরে নেওয়া যায় যে মানুষ তার দেহের অনুপাতে বর্বর ও নিষ্ঠুর হয় তাহলে আমি এই বিরাটকায় দৈত্যদের কাছে কি রকম ব্যবহার আশা করতে পারি? ওরা কেউ যদি আমাকে ধরে ফেলে? আমরা যেমন একটা ছোলার দানা গিলে ফেলতে পারি বা চিবিয়ে খাই ওরা ত আমাকে সেইভাবে খেয়ে ফেলবে। তবে দার্শনিকরা নাকি বলেন এই পৃথিবীতে তুলনা না করলে কিছুই বড় বা ছোট নেই। লিলিপুটরাও হয়ত তাদের চেয়েও ক্ষুদ্র মানবিক প্রাণীর দেখা পেতে পারে, তাদের ওপর কর্তৃত্বও করতে পারে। আজ যে বিরাট আকারের দৈত্যদের আমি দেখছি হয়ত এদের চেয়েও আরও বড় আকারের মানুষ আছে কোনো দেশে যে দেশ আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

আমি ভয় ত পেয়েইছি, হতবুদ্ধিও হয়ে গেছি, কি যে করব কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আমি যখন এই ভাবে নিজেকে নিয়ে বিব্রত সেই সময় সভয়ে দেখলুম, আমি যে খাঁজে আশ্রয় নিয়েছি তার দশ গজের মধ্যে একটা দৈত্য এসে পড়েছে। আমার ভয় হল ও পরের ধাপে বোধহয় আমাকে মাড়িয়ে ফেলবে কিংবা ওর কাস্তে দিয়ে আমাকে দু'টুকরো করে ফেলবে। ও কি করল তা হয়ত আমি জানতেও পারব না। প্রাণভয়ে ভীত হলেও যখন দেখলুম দৈত্যটা পা তোলবার উপক্রম করছে আমি তখন প্রাণপণে জোরে চিৎকার করে উঠলুম। আমার চিৎকার দৈতের কানে পেঁছিল, সে দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর কোমর বাঁকিয়ে নিচু হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। ভাবছি আবার চিৎকার করে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি না, এমন সময়ে দৈত্যটা আমাকে দেখতে পেল। আমাকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল না, কি ভাবল। অনেক সময় ক্ষুদ্র প্রাণী বা কীট পতঙ্গরা দংশন করে বা হুল ফুটিয়ে

যের ত! স্বদেশে আমার নিজেরই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সে তার তর্জনি ও বুড়ো আঙুল দিয়ে আমাকে টপ করে তুলে নিল এবং তিন গজ আন্দাজ দূরে ধরে আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল।. আমার চিৎকারটা তার কাছে বোধহয় ওদের নিজেদের মতোই মনে হয়েছিল যদিও ওদের কণ্ঠস্বরের তুলনায় মৃদু। তাই আমাকে তুলে নিয়ে আমার আকার প্রকার লক্ষ্য করতে লাগল। ওর হাতে আমি তখন মাটি থেকে অন্ততঃ ষাট ফুট উঁচুতে। ওর আঙুলের চাপে আমার দু দিকের পাঁজরে ব্যাথা লাগছিল। পাছে আঙুল ফসকে পড়ে যাই এই জন্যেও বোধহয় আমাকে ঈষৎ জোরে ধরে রেখেছিল, যাই হক আমি ঠিক করলুম এ অবস্থায় হাত পা নাড়া ঠিক হবে না কারণ এখান থেকে পড়লে হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে যাবে। আমি সাহস করে সূর্যের দিকে চাইলুম। তারপর প্রার্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত জড়ো করে করুণ স্বরে আমার বিপজ্জনক অবস্থার কথা নিবেদন করলুম। কারণ আমার ভয় হচ্ছিল দৈত্যটা আমাকে হয়ত আছড়ে মাটিতে ফেলে দেবে ঠিক আমরা যেভাবে বাজে ক্ষুদ্র প্রাণীকে মাটিতে আছড়ে মেরে ফেলি। আমার গ্রহ বোধহয় আমার অনুকূলে। দৈত্যটা আমার কণ্ঠস্বর শুনে ও হাত পা নাড়া দেখে কৌতুহলী হল এবং আমার ভাষা না বুঝলেও তাদের মতো কথা বলছি এটুকু বোধহয় সে বুঝতে পারল। ইতিমধ্যে আমার দুপাশে যন্ত্রণা হচ্ছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ছে। আমি আমার দুই পাশে চেয়ে দৈত্যকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলুম যে আমার ভীষণ লাগছে, অত চেপে ধোরো না। দৈত্যটা বোধহয় আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারল, সে আমাকে তার জামার একটা খাঁজে বসিয়ে দিল এবং আমাকে সেইভাবে নিয়েই তার মনিবের দিকে ছুটল। মনিব একজন সঙ্গতিসম্পন্ন চাষী আর এই দৈত্যটাকেই আমি প্রথমে ক্ষেতে দেখেছিলুম।

চাষী-মনিব তার মজুরের কাছ থেকে আমার বিষয়ে শুনল। (ওদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে আমার তাই মনে হচ্ছিল)। মনিব আমাদের ছড়ির আকারে একটা শুকনো খড় তুলে নিল তারপর সেইটের ডগা দিয়ে আমার জামা তুলল। জামাটা যে পোকার আবরণের মতো নয় ও বোধহয় তাই দেখতে চাইল। ফুঁ দিয়ে আমার মাথার চুল উড়িয়ে দেখল তারপর আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আমার চোখ মুখ ভাল করে দেখতে লাগল। সে তার শ্রমিকদের ডেকে জিজ্ঞাসা করল (পরে আমি জানতে পেরেছিলুম) যে ক্ষেতে আমার মত খুদে প্রাণী তারা আর দেখেছে কি না। তারপর সে আমার পিঠের দিক ধরে আমাকে আস্তে আস্তে আমার দুই পা ও দুই হাতের ওপর নামিয়ে দিল। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে, আস্তে আস্তে কয়েক পা এগিয়ে ও পেছিয়ে হেঁটে তাদের বুঝিয়ে দিলুম আমার পালিয়ে যাবার কোনো মতলব নেই। তারা সকলে আমাকে ঘিরে বসে আমার নড়াচড়া ভাল করে দেখতে লাগল। আমি আমার মাথার টুপি খুলে কোমর বেঁকিয়ে মনিবকে অভিবাদন জানিয়ে হাঁটু ও মুখ তুলে নিবেদনের ভঙ্গিতে যত জোরে সম্ভব কয়েকটা কথা বললুম, তারপর স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলি পকেট থেকে বার করে সবিনয়ে তাকে উপহার দিলুম। থলিটি সে হাতে

তুলে নিয়ে চোখের কাছে তুলে ধরে দেখবার চেষ্টা করতে লাগল, জিনিসটা কি ? জামার হাতা থেকে একটা পিন বার করে থলেটা খুঁচিয়ে দেখল কিন্তু বুঝতে পারল না। তখন আমি তাকে ইসারা করে হাত নামাতে বললুম। হাত নামালে আমি তার হাত থেকে থলেটা নিয়ে সেটা খুলে স্বর্ণমুদ্রাগুলো বার করে তার হাতে দিলুম। স্পেন দেশের চার পিস্টোলের ছ'টি মুদ্রা এবং বিশ তিরিশটা ছোট মুদ্রা ছিল। মনিব মশাই কড়ে আঙুলটা জিভের ডগে ভিজিয়ে সবচেয়ে বড় মুদ্রাটা তুলে নিয়ে দেখতে লাগল কিন্তু এগুলো কি হতে পারে তা সে বুঝতে প্যারল না। সে আমাকে ইসারা করল মুদ্রাগুলো আবার থলের মধ্যে ভরে দিতে এবং থলেটি আমার পকেট রাখতে। তবুও আমি থলেটি তাকে আবার দিতে চাইলুম কিন্তু যখন গ্রহণ করল না তখন সেটি আমার পকেটে রাখাই ভাল মনে করলুম।

চাষী এতক্ষণে ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে আমি বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন একটি জীব। সে আমার সংগে অনেক কথাই বলতে লাগল কিন্তু কি জোর আওয়াজ! আমার কান বুঝি ফেটে যাবে। যদিও তার কথা কিছুই বুঝতে পারছিলুম না তবুও সে যে একটা ভাষা অনুসরণ করছে তা বোঝা গেল। আমি একাধিক ভাষায় তার কথার জবাব দেবার চেষ্টা করছিলুম যত দূরে পারি চিৎকার করে। আর সেও তার কান আমার মুখের দুই তিন গজের মধ্যে নিয়ে আসছিল কিন্তু বৃথা। কারণ আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারছিলুম না। এরপর সে তার মজুরদের কাজে পাঠিয়ে দিয়ে পকেট থেকে একটা রুমাল বার করল। রুমালটা দুভাঁজ করে মাটিতে রেখে নীচু হয়ে আমাকে রুমালের ওপর নামবার জন্যে ইসারা করল। আমাকে যেখানে রেখেছিল সেখান থেকে দু'ফুটখানেক মত লাফিয়ে আমি সহজেই রুমালের ওপর নেমে পড়লুম। আমি চিন্তা করলুম ওর আদেশ পালন করা আমার কর্তব্য। আমি রুমালের ওপর শুয়ে পড়লুম আর চাষী রুমালের চারটে কোন তার আঙুল দিয়ে জড়ো করে আমাকে তুলে নিল আর সেই ভাবে আমাকে ওর বাড়ি নিয়ে চলল। বাড়ি ফিরে সে তার বউকে ডেকে আমাকে দেখাল। কিন্তু ইংলন্ডের মেয়েরা যেমন ব্যাং বা মাকড়সা দেখে চিৎকার করে ভয় পেয়ে পালায় চাষী বউও তেমনি আমাকে দেখেই ছুটে পালাল। যাই হক দূরে থেকে আমার ব্যবহার ও ওর স্বামীর ইসারা অনুসারে আমাকে কাজ করতে দেখে বৌটি আশ্বস্ত হল এবং ক্রমশঃ আমার প্রতি তার মনোভাব কোমল হল। বেলা প্রায় বারোটার সময় একজন ভৃত্য দুপুরের আহার নিয়ে এল। এক ডিশ মাংস (একজন কর্মী চাষীর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ) এনেছে, সেই ডিশটির ব্যাস চব্বিশ ফুট প্রায়। পরিবারের মানুষ হল চাষী ও তার বউ, তিনটে বাচ্চা আর বৃদ্ধ ঠাকুমা। ওরা টেবিল ঘিরে বসল, চাষী আমাকে টেবিলের এক পাশে বসিয়ে দিল, টেবিলটা তিরিশ ফুট উঁচু। এত উঁচু টেবিল, আমি ভয়ে ভয়ে কিনারা থেকে যতটা পারি দূরে সরে বসলুম। পড়ে যাবার ভয় আছে ত! চাষী বৌ এক টুকরো মাংস নিয়ে সেটা কুঁচি কুঁচি করে কেটে আর কিছু রুটি ছোট ছোট টুকরো করে একটা কাঠের প্লেটে দিয়ে আমার সামনে রাখল। আমি মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে

আমার ছুরি কাঁটা বার করে খেতে আরম্ভ করলুম। আমাকে কাঁটা চামচে দিয়ে খেতে দেখে ওরা খুব মজা অনুভব করতে লাগল। চাষী বউ তার দাসীকে বলল ওষুধ খাবার ছোট গেলাস আনতে। ওদের ছোট গেলাস আমার কাছে মস্ত বড়। বউ তাতে সুরা ঢেলে দিল, তা প্রায় দু' গ্যালন হবে। অনেক কষ্টে দু'হাত দিয়ে সেই পাত্র ধরে ও শ্রদ্ধা সহকারে যতদূর সম্ভব উচ্চস্বরে ইংরেজীতে আমি চাষী-বউয়ের

বাড়ি ফিরে সে তার বউকে ডেকে আমাকে দেখাল।

স্বাস্থ্য কামনা করে সুরা পান করতে আরম্ভ করলুম। আমার কথা বলার ও পান করবার ভঙ্গি দেখে ওরা এত জোরে হেসে উঠল যে আমার কানে তালা ধরে গেল। সুরার স্বাদ ভাল, অনেকটা আমাদের সাইডায়ের মতো। পান শেষ হলে চাষী আমাকে ইসারা করে তার ডিশের কাছে যেতে বলল। টেবিলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে আমি হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম তবে আঘাত পাই নি। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লুম। লক্ষ্য করলুম যে আমি পড়ে যাওয়াতে সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি সৌজন্য জানাবার জন্য সংগে সংগে আমার টুপি বার করে মাথার

ওপর নাড়তে নাড়তে তিনবার আনন্দসূচক ধ্বনি করে ওদের জানিয়ে দিলুম যে পড়ে গিয়ে আমার কোনো চোট লাগে নি। তারপর আমি যখন আমার কর্তা মশাইয়ের (এখন থেকে আমি চাষীকে কর্তামশাই বলব) দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম তখন তার সবচেয়ে ছোট ছেলেটি যে কর্তার পাশেই বসে ছিল এবং দেখেই মনে হয় দুষ্টু সে আমার পা ধরে টপ করে এত উঁচুতে তুলে ধরল যে আমি ত ভয়েই সারা। থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কিন্তু তার বাবা চট করে আমাকে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এত জোরে ছেলেটার কান মলে দিল যে সেই জোর প্রয়োগ করলে ইউরোপের এক দল ঘোড়া একেবারে কাৎ হয়ে যেত। কর্তা বলল, ছেলেটাকে টেবিল থেকে তুলে নিতে। সাজা পেয়ে বালকটি আমার প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করল। কিন্তু ছেলেরা অমন একটু দুষ্টু হয়। আমাদের ছেলেরাও চড়ুই, খরগোস, বেড়াল বা কুকুরের বাচ্চা নিয়ে দুষ্টুমি করে। তাই আমি হাঁটু গেড়ে কর্তা মশাইকে ইঙ্গিতে অনুরোধ করলুম এবারের মতো বাচ্চাটাকে ক্ষমা করুন। বাবা আমার অনুরোধে ছেলেটিকে আবার তার চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। আমি খুশি হয়ে এগিয়ে গিয়ে কর্তার হাতে চুম্বন করলুম, কর্তাও আমার হাতে চাপ দিয়ে জানালেন যে তিনিও খুশি হয়েছেন।

ডিনার চলার সময় আমার কর্ত্রীর প্রিয় বেড়ালটি তাঁর কোলে উঠে বসল। আমি আমার পিছন দিকে একটা অচেনা আওয়াজ শুনলুম যেন একডজন কারিগর তাদের মেসিনে মোজা বুনছে কিন্তু তা নয়। আওয়াজের উৎস হল সেই বেড়াল, সে গজরাচ্ছে। বেড়ালের মাথা আর থাবা দেখে অনুমান করলুম যে সেটি আমাদের একটি ষাঁড়ের চেয়ে তিনগুণ বড়। কর্ত্রী বেড়ালটিকে আদর করতে করতে খাচ্ছিলেন। যদিও আমি টেবিলের অপর প্রান্তে, বেড়ালটি থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে ছিলুম তবু পাছে বেড়ালটি সহজে লাফিয়ে উঠে আমাকে আঁচড়ে দেয় এজন্যে কর্ত্রী জীবটিকে শক্ত করে ধরে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তার মুখ দেখে আমার বেশ ভয় করতে লাগল। বেড়ালটিকে আমি ভয় না করলেও পারতুম কারণ যখন কর্তা আমাকে তুলে বেড়ালটার তিন গজের মধ্যে আমাকে বসিয়ে দিল তখন বেড়াল আমার দিকে চেয়েও দেখল না। আমি আমার ভ্রমণের সময় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তাতে দেখেছি যে কোনো হিংস্র জন্তুকে দেখে ভয় পেলে বা পালাতে থাকলে তাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয় এবং তখন সে আক্রমণ করে বা তাড়া করে। অতএব আমি এমন ভাব দেখালুম যে বেড়ালকে আমি মোটেই গ্রাহ্য করি না। তার মাথার কাছে পাঁচ ছ'বার ঘুরেও এলুম। এমন কি তার কাছে আধ গজের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে এমন ভাব দেখালুম যেন ওকে গ্রাহ্য করি না। দেখি কি বেড়াল মশাইই নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছে, ও যেন আমাকেই বেশি ভয় পাচ্ছে। চাষীদের বাড়িতে যেমন হয়ে থাকে, তিন চারটে কুকুর ঘরে ঢুকল। কুকুরকে আমার তেমন ভয় নেই। একটা মাস্টিফ কুকুর ছিল, চারটে হাতির সমান। একটা গ্রে-হাউণ্ডও ছিল। সেটা মাস্টিফের চেয়ে লম্বা হলেও আকারে ছোট।

ডিনার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন বছর খানেক বয়সের একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নার্স ঘরে ঢুকল। আমাকে দেখেই তো বাচ্চা বায়না ধরল—বাচ্চাদের

মা স্বভাব—সে আমাকে চায়, ভেবেছে নতুন কোনো খেলনা বুঝি। শেষে চিৎকার আরম্ভ করল। সেই চিৎকার লণ্ডন ব্রিজ থেকে চেলসি পর্যন্ত শোনা যাবে। মা ত ভালবেসে আমাকে তুলে বাচ্চার কাছে নামিয়ে দিতেই সে আমার কোমর টিপে ধরে তুলে নিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অমার মাথাটা তার হাঁ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ভয় পেয়ে আমি ত প্রাণপণে এত জোরে চিৎকার করে উঠলুম যে বাচ্চাও ভয় পেয়ে আমাকে ফেলে দিল। ভাগ্যিস মা তার এপ্রনটা তুলে ধরেছিল নয়ত নীচে পড়ে গেলে আমার ঘাড়টা নিশ্চয়ই মটকে যেত। ওদিকে বাচ্চার কান্না থামাবার জন্যে তার নার্স বাচ্চার কোমরে আটকানো একটা ডুগডুগি বাজাতে লাগল। কিন্তু বাচ্চা কিছুতেই থামে না তখন নার্স বাধ্য হয়ে ওকে বুকের দুধ খাওয়াতে লাগল। আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে নার্সের ঐ শরীর দেখে আমি যত বিরক্ত হয়েছিলুম এমন বিরক্ত আর কখনও হই নি। নার্সের শরীরের গঠন আকার ও রং আমি কিসের সঙ্গে তুলনা করব তা বলতে পারছি না। মাপলে বিরাট হবে। সারা শরীর দাগ ও ফুসকুড়িতে ভর্তি, বিশ্রী দেখতে। এত বলতে পারছি কারণ আমি ত ওর কাছেই টেবিলে দাঁড়িয়ে ছিলুম, সবই ভাল দেখতে পাচ্ছিলুম। মনে পড়ল আমাদের ইংরেজ মহিলাদের শুভ্র ও সুন্দর শরীরের কথা, অবশ্য তারা আমাদেরই আকারের। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে তাদের ত্বক দেখলে তবে তার ত্রুটি ধরা পড়ে, নইলে নয়।

আমি লিলিপুট দ্বীপে দেখেছি ওদের গায়ের রং ভারি চমৎকার, এমন আমি আর দেখি নি। ঐ দ্বীপে আমার এক পণ্ডিত বন্ধু বলেছিল যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে যখন আমার মুখের দিকে তাকায় তখন আমার মুখ খুব ফর্সা ও ত্বক মসৃণ দেখায়। কিন্তু আমি যখন তাকে হাতে করে তুলে আমার মুখের কাছে নিয়ে এলুম তখন সে স্বীকার করল কাছ থেকে মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না। সে বলল আমার মুখে অনেক গর্ত, দাড়ির গোড়াগুলো শুয়োরের লোমের চেয়ে দশগুণ মোটা আর মুখের রং ও নানা বর্ণের মিশ্রণ যা মোটেই ভাল বলা চলে না। অবশ্য আমার দেশে অন্যান্য পুরুষদের মতোই আমার রং ফর্সা আর ঘুরে বেড়ালেও চামড়া রোদে বেশি পোড়ে নি। অথচ আমার সেই বন্ধু বলেছিল তাদের দেশের মেয়েদের অনেক ত্রুটি আছে। যেমন কারও মুখে বিন্দু বিন্দু বাদামী ছোপ আছে, কারও হাঁ-মুখ বড়, নাক থ্যাবড়া কিন্তু এসব ত্রুটি আমার চোখে পড়ত না কারণ আমিও তাদের দেখছি অনেক দূরে থেকে। সেই হিসেবে বলতে পারি নিকট থেকে দেখে এই দৈত্যদের আমি যে ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার পাঠকদের মনে হতে পারে ওরা বুঝি কুৎসিত কিন্তু তা নয়। ওরা রূপবান না হতে পারে কিন্তু সুদর্শন। আমার কর্তা চাষী হলেও আকার অনুসারে তার দেহের গঠন ও মুখশ্রী উত্তম।

ডিনার শেষ হল। কর্তা আবার কাজে বেরোবেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও হাত পা নাড়া দেখে বুঝলুম তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলছেন আমার দিকে যেন কড়া নজর রাখা হয় এবং যত্ন নেওয়া হয়। আমি ভীষণ ক্লান্ত, ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিল। আমার কর্ত্রী তা বুঝতে পেরে আমাকে তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন ও পরিষ্কার

একটি রুমাল ঢাকা দিলেন। রুমালটি আমাদের মানোয়ারি জাহাজের পালের চেয়ে বড় ও মোটা। আমি প্রায় দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন আমার বাড়িতে আমার স্ত্রী ও বাচ্চাদের সঙ্গে রয়েছি। বেশ ভাল লাগছিল কিন্তু ঘুম ভেঙে যেতেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এখানে আমি একা। দু'শো থেকে তিনশ' ফুট চওড়া একটা মস্ত বড় ঘরে শুয়ে আছি। ঘরটা দু'শো ফুট উঁচু। আর যে খাটে শুয়ে আছি সেটা কুড়ি গজ চওড়া। কর্ত্রী ঠাকরুণ তার সাংসারিক কাজে যাবার আগে আমার ঘরে তালা লাগিয়ে গেছেন। মেঝে থেকে খাটটা আট গজ উঁচু। কিছু প্রাকৃতিক কাজ সারবার জন্যে খাট থেকে নিচে নামা দরকার অথচ দরজা খোলবার জন্যে কাউকে ডাকাও যাচ্ছে না কারণ যদি ডাকাডাকি করি তাহলে আমি যত জোরেই চিৎকার করি না কেন আমার ডাক অতদূরে রান্নাঘরে পেঁছিবে না। আমার যখন এইরকম অবস্থা তখন পর্দা বেয়ে দুটো ইঁদুর উঠে এল তারপর সে দু'টো খাটে নেমে এল। একটা আমার মুখের কাছে এসে গেল। আমি ত ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম, উঠে দাঁড়িয়ে, আমার ছোরাখানা বার করলুম। ওরা আমার মতো একটা ক্ষুদে প্রাণীকে ভয় করবে কেন? ভয়ংকর প্রাণী দুটো আমাকে দু'দিক থেকে তেড়ে এল। একটা ইঁদুর ত তার একটা পা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল কিন্তু সে ব্যাটা আর কিছু করার আগেই আমি আমার ছোরা দিয়ে ওর পেটটা চিরে দিলুম। ইঁদুরটা আমার পায়ের কাছে পড়ে গেল। অপর ইঁদুরটা সঙ্গীর দুরবস্থা দেখে পালাল কিন্তু পালাবার আগে আমি ওর পিঠে ছোরা দিয়ে আঘাত করলুম। সেখান দিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। দম নেবার জন্যে এবং সাহস ফিরিয়ে আনার জন্যে আমি খাটের ওপর পায়চারি করতে লাগলুম। এই ইঁদুরগুলো আমাদের এক একটা মাস্টিফ কুকুরের সমান কিন্তু আরও চঞ্চল ও হিংস্র। আমি ছোরা সমেত আমার বেল্টটি খুলে যদি ঘুমিয়ে পড়তুম তাহলে ত ওরা আমাকে এতক্ষণে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত তারপর বেমালুম খেয়ে ফেলত। মরা ইঁদুরটার ন্যাজ মাপলুম, এক ইঞ্চি কম দু'গজ। সেটাকে খাট থেকে সরাতে গিয়ে দেখি ব্যাটা তখনও বেঁচে আছে। ছোরা দিয়ে গলায় আবার কয়েকটা আঘাত করতেই শেষ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্রী ঠাকরুণ ঘরে ঢুকে আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে নিজের হাতে তুলে নিলেন। আমি মরা ইঁদুরটাকে দেখিয়ে দিলুম এবং নানাভাবে যখন বুঝিয়ে দিলুম যে আমার কোনো আঘাত লাগে নি তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, মুখে হাসি ফুটল। তারপর তিনি পরিচারিকাকে ডাকলেন, সে একটা চিমটে এনে ইঁদুরটাকে তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। কর্ত্রী আমাকে টেবিলে বসিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে আমার রক্তমাখা ছোরাখানা দেখিয়ে আমার জামায় মুছে খাপে ভরে রাখলুম। এরপর আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেই প্রাকৃতিক কাজটা আমার হয়ে কেউ করে দিতে পারবে না তাই আমি তাকে ইসারায় বললুম আমাকে নিচে নামিয়ে দিতে। কিন্তু যা করতে চাই তা মহিলাকে বলতে শালীনতায় বাধল। তাই আর কিছু না বলে বাইরে বেরোবার দরজা দেখালুম আর সেই সঙ্গে

কোমর বেঁকিয়ে কয়েকবার অভিবাদন জানালুম। প্রথমে তার বুঝতে অসুবিধে হয়েছিল তারপর আমাকে হাতে তুলে নিয়ে বাইরে এসে বাগানে নামিয়ে দিলেন।

আমাকে হাতে তুলে নিয়ে বাইরে এসে বাগানে নামিয়ে দিলেন।

দুশো গজ দূরে একটা জায়গা বেছে নিয়ে মহিলাকে কাছে আসতে বা দেখতে নিষেধ করে আমি দুটো সরেল পাতার আড়ালে নিজেকে ভারমুক্ত করলুম।

আমি আশা করি আমার সহৃদয় পাঠকরা এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপারের খুঁটিনাটি লেখার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। এগুলি অবশ্যই তুচ্ছ এবং নিচুমনা ব্যক্তিদের কাছে এগুলি অশ্লীল মনে হবে তথাপি এগুলি দার্শনিকের ভাব ও কল্পনা প্রসারিত করতে হয়ত সাহায্য করবে এবং ব্যক্তি হিসেবে সাধারণ একজন মানুষকে কতরকম সমস্যায় পড়তে হয় তা জেনে তাঁরা হয়ত এইসব অনুল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো কাজে লাগাতে পারেন। এইজন্যেই আমি কোন আড়ম্বর বা অলংকার যোগ না করে সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় আমার ভ্রমণ কাহিনীর সত্য রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এই ভ্রমণ কাহিনী আমার মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে আমি কোনো ঘটনাই বিস্মৃত হই নি তাই লেখবার সময় কিছুই বাদ দিই নি শুধু যেগুলি পাঠকদের একঘেয়ে মনে হতে পারে বা বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে সেইগুলি ছাড়া। যদিও ভ্রমণকারীরা তাদের সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চাষীর কন্যার বিবরণী। লেখককে প্রথমে বাজারে এবং পরে নগরে নিয়ে যাওয়া হল। ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিবরণী।

আমার কর্ত্রী ঠাকরুণের ন' বছরের একটি কন্যা আছে। কন্যাটি বয়সের তুলনায় কিছু পাকা ; চমৎকার সেলাই করতে পারে, খেলার পুতুলটিকে নিপুণ হাতে সাজাতে পারে। সে ও তার মা স্থির করল ইঁদুরের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে শিশুদের দোলনায় আমাকে রাত্রে শোয়ানো হবে। একটা ক্যাবিনেটের ড্রয়ার বার করে নিয়ে দোলনাটি তার মধ্যে রাখা হল এবং দোলনা সমেত ড্রয়ারটি ঝুলিয়ে দেওয়া হল। আমি যতদিন এই পরিবারে ছিলুম ততদিন এইটিই আমার শয্যা ছিল তবে যখন আমি ওদের ভাষা শিখতে লাগলুম তখন আমার অসুবিধা বলতে থাকায় ওরা দোলনাটির অনেক উন্নতি সাধন করে দিয়েছিলেন। এই মেয়েটি ভারি চমৎকার, প্রায়ই আমার কাছে থাকত, আমার অনেক কাজ করে দিত। আমি কয়েকবার ওর সামনে পোশাক পরিবর্তন করেছিলুম। ও তা দেখেছিল তাই আমাকে ও কয়েকবার পোশাক ছাড়িয়ে অন্য পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল। আমি অবশ্য এ কাজটি তাকে করতে দিতুম না তবে সে আমার একটা কাজের কাজ করে দিয়েছিল। সে আমাকে সাতটা শার্ট তৈরি করে দিয়েছিল। যতদূর সম্ভব মোলায়েম কাপড় সে বেছে নিয়েছিল তবুও তা আমাদের থলের কাপড়ের চেয়েও মোটা। শার্টগুলো সে নিজেই কেচে দিত। সে আমার শিক্ষয়িত্রীও কারণ সে আমাকে ওদের ভাষা শেখাত। আমি আঙুল দিয়ে কোনো জিনিস দেখালে সে নিজের ভাষায় তার নামটা বলে দিত অতএব ভবিষ্যতে আমার প্রয়োজন মতো কিছু চেয়ে নিতে পারতুম। মেয়েটির মেজাজ খুব ঠাণ্ডা। তার উচ্চতা এখন চল্লিশ ফুট, বয়স অনুসারে আরও একটু বেশি হওয়া উচিত ছিল। সে আমার নামকরণ করল 'গ্রিলড্রিগ'। তার পরিবারের সকলে আমাকে এই নামে ডাকত, পরে সারা দেশ। শব্দটির বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অর্থ করা যেতে পারে।

ইংরেজি করলে হয়ত অর্থ হবে 'ছোট্ট মানুষ'। ওদেশে আমি ওরই জন্যে বাস করতে পেরেছিলুম এবং যতদিন ওদেশে ছিলুম ততদিন আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় নি। আমি ওকে গ্লামডালক্লিচ নামে ডাকতুম যার অর্থ ক্ষুদে নার্স। সে আমাকে ভালবেসে যেভাবে আমার যত্ন করেছিল তা আমি স্বীকার না করলে আমি অকৃতজ্ঞ। আমিও যথাসাধ্য প্রতিদান দেবার চেষ্টা করতুম।

কথাটা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিবেশীদের কাছে আমি আলোচ্য হয়ে পড়লুম। আমার কর্তা তার ক্ষেতে একটা অদ্ভুত জীব কুড়িয়ে পেয়েছেন, একটা এসপ্ল্যাকনাকের চেয়ে বড় নয়, জীবটা সর্বাংশে আমাদেরই মতো মানুষ, সব বিষয়ে আমাদের অনুকরণ করতে পারে, ওর নিজেরও একটা ভাষা আছে, আমাদের ভাষাও কিছু শিখেছে, দু পায়ে সোজা হাঁটে, ধীর ও স্থীর, ডাকলেই কাছে আসে, অঙ্গপ্রতঙ্গ সুগঠিত, অমনটি দেখা যায় না আর গায়ের রং। অভিজাত পরিবারের তিন বৎসরের মেয়েটির চেয়ে ফর্সা। আমার কর্তার বন্ধু প্রতিবেশী এক চাষী কথাটা শুনে একদিন সত্য মিথ্যা যাচাই করতে এল। আমাকে তখনি তার সামনে হাজির করা হল। আমার কর্তা আমাকে টেবিলের ওপর তুলে দিল। আমাকে আদেশ করতেই আমি টেবিলের ওপর হাঁটতে লাগলুম তারপর খাপ থেকে আমার লম্বা ছোরাখানা বার করে দু'চারবার ঘুরিয়ে আবার খাপে পুরে রাখলুম, তারপর আমার বন্ধু গ্লামডালক্লিচের নির্দেশ অনুসারে কর্তার অতিথিকে তাদেরই ভাষায় অভ্যর্থনা জানালুম। এই আগন্তুকের বয়স হয়েছিল। চোখে কম দেখে তাই সে পকেট থেকে চশমা বার করে পরল। তাই দেখে আমি হো হো করে হেসে উঠলুম কারণ তার চোখ দুটো দেখাচ্ছিল যেন দুটো জানালায় দুটো চাঁদ। আমাকে ভাল করে দেখবার জন্যেই চশমা পরলেন। আমাদের বাড়ির লোকেরা আমার হাসির কারণ বুঝতে পারল কিন্তু আগন্তুক নিরর্থক আমার ওপর চটে গেল। লোকটি কৃপণ স্বভাবের, পয়সা রোজগারের দিকে তার নজর। সে আমার কর্তার কাছে বলল পাশের শহরে ওকে নিয়ে যাও সেখানে ওকে দেখিয়ে দু'পয়সা রোজগার করতে পারবে। শহরটা বেশি দূরে নয়, আমাদের বাড়ি থেকে বাইশ মাইল, ঘোড়ায় চেপে গেলে আধঘণ্টা সময় লাগবে। আমার সন্দেহ হল কিছু একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমি লক্ষ্য করলুম যে আমার কর্তা এবং আগন্তুক দু'জনে মিলে ফিস ফিস করে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। আমি তাদের কোনো কথা শুনতে পাচ্ছি না। একটা কিছু ঘটতে চলেছে। তবে আমি পরদিন সকালে সব জানতে পারলুম। আমার ক্ষুদে নার্স গ্লামডালক্লিচ আমাকে সবকিছু বলল। ব্যাপারটা সে চালাকি করে তার মায়ের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে। বেচারি গ্লাম! সে আমাকে তার বুকের ওপর তুলে নিল আর এমন ভাবে কাঁদতে লাগল যেন সেই দোষী। সে আশংকা করছে যে ঐ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকগুলো আমার ক্ষতি করবে, আমাকে নিয়ে এমনভাবে নাড়াচাড়া করবে যে তাদের টেপনটাপনে হয় আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব নয়ত আমার হাত পা একটা কিছু ভাঙবে। সে বলতে লাগল যে আমি বিনয়ী ও নম্র। নিজের সম্মান রাখতে

জানি আর সেই আমাকে নিয়ে ওরা ছেলেখেলা করবে, আমার চূড়ান্ত অপমান করে ছাড়বে। শুধু কিছু অর্থের লোভে আমাকে কতকগুলো বাজে গ্রাম্য মানুষের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে, কি বিশ্রী। সে বলতে লাগল যে তার বাবা আর মা কথা রাখে না, তারা বলেছিল গ্রিলড্রিগ আমার। কিন্তু এখন ওরা কথা রাখছে না। গত বছরে ওরা এমন ভান করলে যে একটা ভেড়ার বাচ্চা আমাকে দিয়েই দিল কিন্তু সেটা যেই বড় হল আর মোটা হল অমনি সেটা একটা কসাইকে বেচে দিল। আমার নার্স এত দুঃখ প্রকাশ করলেও আমি বুঝলুম আমার কিছু করার নেই, ওরা যা করবে তা আমাকে মেনে নিতেই হবে তবে আমার আশা আমি একদিন মুক্তি পাবই। এদের হাতে যতদিন থাকব ততদিন আমি কিছু করতে পারব না এমন কি ইংলণ্ডের রাজা এদের হাতে পড়লে তাঁকেও এইসব বিড়ম্বনা সহ্য করতে হত।

পাশেই একটা শহরে হাট বসে। আমার কর্তা তাঁর বন্ধুর পরামর্শে আমাকে হাটে নিয়ে যাবেন। তিনি আমাকে একটা বাক্সর মধ্যে ভরলেন, সঙ্গে আমার ক্ষুদে নার্সকেও নিলেন। সে আমার পিছনে বসল। বাক্সটা চারদিকে বন্ধ তবে আমার ভেতর বাইরে করবার জন্যে একটা দরজা আছে আর বায়ু চলাচল করবার জন্যে বাক্সর গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত করা আছে। আমার যাতে না কষ্ট হয় সেজন্যে গ্লাম তার পুতুলের বিছানার একটা তোষক বাক্সর মধ্যে বিছিয়ে দিয়েছিল। ইচ্ছে করলে আমি তার ওপর শুতেও পারি। গ্লাম আমাকে আরাম দেবার চেষ্টা করলে কি হবে। গাড়ির সে কি ঝাঁকানি। ঝড়ের সময় জাহাজেও এরকম বা এমন ঘন ঘন ঝাঁকানি খেতে হয় না। বিরাট ঘোড়া, পা ফেলছে চল্লিশ ফুট পর পর। যদিও আধ-ঘণ্টার যাত্রা তবুও ঐ সময়ের মধ্যে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছিল। পথ বেশি নয়, লণ্ডন থেকে সেণ্ট অ্যালবানস যতটা দূরে অতটা দূরে হবে। কর্তা একটা সরাই-খানার সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন। এখানে উনি মাঝে মাঝে আসেন। কর্তা সরাইওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, আমার জন্য একজন ঘোষক দরকার যে হাটে ও শহরে চিৎকার করে বলবে, একটি অদ্ভুত জীব পাওয়া গেছে, যদি দেখতে চাও ত গ্রীন ঈগল-এ চলে এস। জীবটি আকারে একটি এসপ্লাকনাকের (ও দেশের সুন্দর একটি পশু প্রায় ছ' ফুট লম্বা) চেয়ে বড় নয় কিন্তু দেখতে ঠিক মানুষের মতো, কথা বলতে পারে এবং নানা ক্রীড়াকৌশল দেখাতে পারে। এছাড়া ঐ ঘোষক আমাকে জনসাধারণকে দেখাবার জন্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাও করবে। এরকম একজন লোক পাওয়া গেল।

সরাইখানার সবচেয়ে বড় ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। ঘরখানা লম্বা ও চওড়ায় দু'দিকে তিনশ ফুট। আমার ক্ষুদে নার্স আমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে এবং দর্শকদের সামনে কি দেখাব বা করব তার তালিম দেবার জন্যে টেবিলের পাশে একটা নিচু টুলে উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে অযথা ভিড় না বাড়াবার জন্যে এবং যাতে আমার অসুবিধা না হয় সেজন্যে কর্তা ঠিক করলেন একসঙ্গে তিরিশজনের বেশি লোক ঘরে ঢোকানো হবে না। আমার ক্ষুদে

বান্ধবী আমাকে টেবিলের ওপর বিশেষ কায়দায় হাঁটতে বলল। আমি তাই হাঁটলুম তারপর আমি যাতে বুঝতে পারি ওদের এমন ভাষায় আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। আমিও যত জোরে সম্ভব চীৎকার করে সেগুলির উত্তর দিতে থাকলুম। দর্শকরা ঘরে আসবার পর আমি বেশ কয়েকবার ঘুরেফিরে তাদের অভিবাদন জানালুম,

আমার নার্স টেবিলের পাশে একটা নীচু টুলে উঠে দাঁড়ালো।

বললুম তোমরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর, তোমরা স্বাগতম, ক্ষুদ্র বক্তৃতাও দিলুম। সেলাই করবার সময় গ্রাম আঙুলে যে টুপি পরত, সুরা পান করবার জন্যে সেইরকম একটা টুপি সে আমাকে দিয়েছিল। আমি তাতে সুরা ঢেলে দর্শকের স্বাস্থ্য পান করলুম। তারপর খাপ থেকে আমার লম্বা ছোরা বার করে ইংরেজদের মতো ওদের কিছু খেলা দেখালুম। গ্রাম আমাকে একটা সরু কাঠি দিয়েছিল। আমি সেটা বর্শার মতো ধরে কিছু কসরৎ দেখালুম। সেদিন বারো দল দর্শককে আমার কলা কৌশল দেখাতে হল। কোনোবার কম কোনোবার বেশি এইভাবে খেলা দেখাতে দেখাতে, গোলমাল এবং কেউ কেউ আমাকে বিরক্ত করার ফলে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লুম, প্রায় আধমরা। যারা আমার কসরৎ দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তারা

আমার বিষয়ে এমন বাড়িয়ে বলতে লাগল যে পরবর্তী দল দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চায়। আমাকে যাতে কেউ স্পর্শ করতে না পারে বা কেউ ক্ষতি করতে না পারে এজন্যে কর্তা নিজ স্বার্থে টেবিলের চারদিক বেঞ্চি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন এবং একমাত্র আমার নার্স ছাড়া আমাকে যাতে কেউ স্পর্শ করতে না পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলেন। তবুও ইস্কুলের একটা দুষ্টু ছাত্র আমার মাথা লক্ষ্য করে একটা হেজেলনাট ছুঁড়ে মারল। ভাগ্যিস অল্প একটুর জন্যে সেটা ফসকে গিয়েছিল নইলে আমার মাথা ফেটে ঘিলু বেরিয়ে পড়ত। নাটটা কুমড়োর সমান বড়। যাই হক দুষ্টু ছেলেটাকে ধরে প্রহার দিয়ে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হল।

আমার কর্তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে আমাকে আবার দেখা যাবে পরের হাটবারের দিন। বাড়ি থেকে শহরে যাবার সময় আমার খুব কষ্ট হয়েছিল, গায়ে হাত পায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তারপর আটঘণ্টা খেলা দেখিয়ে আমি এত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলুম যে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছিলুম না। গলা দিয়ে স্বরও বেরোচ্ছিল না। ইতিমধ্যে নিজ স্বার্থের জন্যেই এবং হয়ত আমাকে কিছু আরাম দেবার উদ্দেশ্যে কর্তা একটা গাড়ী তৈরি করালেন। সুস্থ হয়ে উঠতে আমার তিন দিন লাগল, তবুও কি নিস্তার আছে, বিশ্রাম পাবার উপায় নেই। আমার কথা শুনে একশ মাইলের মধ্য থেকে বহু লোক আমাকে দেখবার জন্যে দলে দলে আসতে লাগল। এ অঞ্চলে অনেক লোকের বাস, বৌ বাচ্চা নিয়ে তারা আসতে লাগল। কর্তাও তাদের কাছ থেকে মোটা দর্শনী আদায় করতে লাগলেন। মাত্র একটা পরিবার এলেও তাদের কাছ থেকে তিরিশ জনের দেয় দর্শনী আদায় করছিলেন। বুধবার ওদের স্যাবাথ ডে তাই সেদিন ছাড়া আমাকে রোজই খানিকটা সময় দর্শকদের সামনে হাজির করা হত। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তুম তবে ইতিমধ্যে আমাকে হাটবারে শহরে নিয়ে যাওয়া হয় নি।

আমার কর্তা যখন বুঝতে পারলেন যে আমাকে হাটে বাজারে দেখালে বেশ দু পয়সা উপার্জন হচ্ছে তখন তিনি স্থির করলেন যে রাজ্যের বড় বড় শহরে আমাকে নিয়ে যাবেন। অতএব দীর্ঘ ভ্রমণের জন্যে তিনি প্রস্তুত হলেন, বাড়ি ও চাষবাস দেখাশোনার ব্যবস্থা করলেন এবং স্ত্রীকে সব বুঝিয়ে তাকে সাবধানে থাকতে বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি এই দেশে আসবার দু'মাস পরে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট আমরা যাত্রা করলুম। যে বড় শহরে যাচ্ছি সেটা রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত, বাড়ি থেকে প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে। কর্তা গ্লামডাল ক্লিচকেও সঙ্গে নিলেন, সে থাকবে পিছনে। আমি ত আছি বাক্সর মধ্যে গ্লাম বাক্সটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেশ করে বেঁধে নিল। আমার যাতে কষ্ট না হয় সেজন্যে গ্লাম বাক্সটার ভেতরে সব দিকে নরম কাপড় বসিয়ে দিয়েছিল আর তার পুতুলের বিছানা থেকে অনেকগুলো তোষক এনে মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে চাদর পেতে দিয়েছিল। আমি যাতে আরামে থাকতে পারি সেজন্যে সে চেষ্টার ত্রুটি

করে নি। কর্তা ও গ্লাম ছাড়া আমাদের সংগে ছিল বাড়ির একটি বালক যে মালপত্তর নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চলল।

আমার কর্তার মতলব ছিল পথে যত শহর সেখানে আমাকে দেখানো হবে এবং আমাদের রাস্তা থেকে পঞ্চাশ বা একশ মাইলের যত গ্রাম বা যদি কোনো ধনী ব্যক্তি থাকে তবে সেখানেও আমাকে দেখানো হবে, মূল লক্ষ্য অর্থ উপার্জন। আমরা প্রতিদিন সহজেই একশ দেড়শ মাইল অতিক্রম করতুম, তারও বেশি হয়ত পারা যেত কিন্তু যদি আমার কষ্ট হয় সেজন্য গ্লাম তার বাবাকে বলত ঘোড়ায় চেপে একটানা যেতে তার কষ্ট হয়। মুক্ত বাতাস উপভোগ ও আশপাশ দেখার জন্যে গ্লাম আমাকে মাঝে মাঝে বাক্সর বাইরে এনে ছেড়ে দিত কিন্তু আমার কোমরে একটি দড়ি বাঁধা থাকত, দড়িটি সে ছাড়ত না। ভ্রমণ পথে আমরা পাঁচ ছ'টা নদী পার হলুম, নদীগুলো মিশরের নীলনদ বা ভারতের গঙ্গা নদী অপেক্ষা অনেক বেশি চওড়া ও গভীর। লণ্ডন ব্রিজের নীচে টেমস নদী যেমন ঠিক তেমন বা তত ছোটো কোনো নদী আমার চোখে পড়ে নি। বড় নগরে পেঁছিবার আগে দশ সপ্তাহ কেটে গেল, ইতিমধ্যে আমাকে আঠারোটি বড় শহরে, অনেক বড় গ্রামে এবং কিছু ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতে দেখানো হলো। অক্টোবর মাসের ২৬ তারিখে আমরা সেই বড় নগরে পেঁছিলুম যার নাম লোরব্রুলগ্রুড বা দুনিয়ার গৌরব। নগরের প্রধান রাস্তার ওপরে, প্রাসাদ থেকে অনতি-দূরে আমার কর্তা বাসা নিলেন। আমার চেহারা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিয়ে কর্তা যথারীতি প্রাচীরপত্র টাঙিয়ে দিলেন। তিনশ থেকে চারশ' ফুট চওড়া একটা বড় ঘর কর্তা ভাড়া নিলেন। একটা গোল টেবিলও আনলেন, তার ব্যাস ষাট ফুট। এরই ওপর আমাকে খেলা দেখাতে হবে এবং আমি যাতে টেবিল থেকে পড়ে না যাই সেজন্য টেবিলটি ঘিরে তিন ফুট উঁচু বেড়া দেওয়া হল। আমাকে প্রতিদিন দশবার দেখানো হ'ত, সকলে অবাক হত তবে সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরত। আমি তখন ওদের ভাষায় মোটামুটি কথা বলতে পারি তবে বুঝতে পারি সবই। গ্লাম আমাকে বাড়িতে শেখাত পড়াত। পথে আসতে আসতেও পড়িয়েছে যার ফলে ওদের ভাষার অক্ষর পরিচয় হয়েছে এবং লিখতেও পারি। তরুণীদের ব্যবহার যোগ্য একটা ছোট ধর্মপুস্তক গ্লাম তার পকেটে রাখত, ছোট হলেও বইখানা স্যানমন'স অ্যাটলাসের মতো বড় হবে। গ্লাম আমাকে সেই বইখানাও পড়িয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লেখককে রাজসভায় ডেকে পাঠান হল। চাষী কর্তার কাছ থেকে রাণী তাকে কিনে নিলেন এবং রাজার সামনে তাকে হাজির করলেন। লেখক সম্রাটের পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। প্রাসাদে লেখকের থাকবার ঘর ঠিক করে দেওয়া হল। সে অচিরে রাণীর প্রিয়পাত্রী হ'ল। লেখক নিজদেশের সম্মান রক্ষায় তৎপর। রাণীর বামনের সঙ্গে তার বিবাদ।

কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রচুর পরিশ্রমের ফলে আমার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকল। আমাকে দেখিয়ে কর্তার যত আয় হয় ততই তার লোভ বেড়ে যায়। এদিকে আমার ক্ষিধে কমতে থাকে, রোগা হয়ে যাই, হাড় বেরিয়ে পড়ে। কর্তাও আমার স্বাস্থ্যের অবনতি লক্ষ্য করেছিল এবং ধরে নিয়েছিল আমি শীঘ্র মারা যাব তাই তিনি ভাবলেন ইতিমধ্যে যত পারেন তত টাকা তুলে নেবেন। তিনি যখন এইরকম ভাবছেন তখন স্লারডাল অর্থাৎ ভদ্রদূতের আগমন হল। তিনি কর্তাকে আদেশ করলেন যে রাণী ও তাঁর সখিবৃন্দের চিত্তবিনোদনের জন্যে আমাকে অবিলম্বে রাজসভায় হাজির করতে হবে। যারা আমাকে এর মধ্যে দেখেছিল তাদের মধ্যে কেউ নিশ্চয় রাণীর কাছে আমার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল। আমি কেমন, কি খাই, বা কথা বলি কিনা, ওদের ভাষা জানি কিনা, ইত্যাদির বিবরণ শুনেই হয়ত মহারাণী আমাকে দেখবার জন্য আগ্রহী হয়েছিলেন। আমাকে রাণীর সামনে হাজির করা হল। রাণী ও তাঁর সহচরীরা আমার আচরণে মুগ্ধ। আমি রাণীর সামনে হাঁটুগেড়ে বসে তাঁর পদচুম্বন করতে চাইলুম। কিন্তু আমাকে টেবিলে তুলে দেওয়া হল, রাণী তাঁর কড়ে আঙুল আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি আঙুলটি দু হাতে ধরলুম ও অগ্রভাগে আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করলুম। রাণী আমাকে আমার দেশ ও আমার ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, আমি যথাসম্ভব স্পষ্ট করে ও সংক্ষেপে তার উত্তর দিলুম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি রাজপ্রাসাদে বাস করতে রাজি কি না। আমি কোমর

বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে মহারাণীকে বিনীতভাবে বললুম আমি আমার কর্তার দাস কিন্তু আমার যদি স্বেচ্ছায় কাজ করার অধিকার থাকত তাহলে আমি নিশ্চয় মহারাণীর সেবায় নিজেকে নিবেদন করে গৌরব বোধ করতুম। মহারাণী তখন আমার কর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কর্তা আমাকে ভাল দামে বিক্রি করতে রাজি আছে কি না। কর্তা

আমি কিছু না বলে শুধু মাথা নীচু করে তাকে বিদায় জানালাম।

ত ভেবেছিল আমি বড়জোর আর মাসখানেক বাঁচব অতএব আমাকে বেচে যা পাওয়া যায় তাই লাভ এবং আমার জন্যে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দাবি করল। এই অর্থ কর্তাকে অবিলম্বে দিয়ে দেওয়া হল। এক একটি স্বর্ণমুদ্রার আকার আটশত ময়ডোরের সমান। ইউরোপের তুলনায় এদেশের সব কিছুর আকার বিরাট তাই ইউরোপের চড়া সোনার দামের হিসেব করলে এখানকার এক একটি স্বর্ণমুদ্রার দাম ইংলণ্ডে হাজার গিনিতে

বিক্রয় হবে। এখন আমি মহারাণীর দাস। সাহস করে তাকে বললুম, গ্লামডাল ক্লিচ নামে এই মেয়েটি বরাবর আমাকে অত্যন্ত যত্ন ও করুণার সঙ্গে আমার দেখাশোনা করেছে এবং সে আমার আচার ব্যবহারের সঙ্গে সুপরিচিত। মহারাণী যদি ইচ্ছা করেন তাহলে গ্লামকে আমার নার্স ও শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। মহারাণী আমার আবেদনে সাড়া দিলেন। আমার প্রাক্তন কর্তাও রাজী হল কারণ মেয়ে রাজ-বাড়িতে থাকবে এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে। গ্লামও তার আনন্দ ঢাকতে পারল না, সেও খুব খুশী। আমার প্রাক্তন কর্তা এবার বিদায় নেবেন, আমাকে বললেন, তোমার ভাল ব্যবস্থাই করে গেলুম। আমি কিছু না বলে শুধু মাথা নিচু করে তাকে বিদায় জানালুম।

রাণী আমার দুর্বল শরীর লক্ষ্য করলেন এবং চাষী কর্তা চলে যাবার পর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। চাষী এখন আর আমার কর্তা নয়, আমি তার কাছে কোনো কাজ বা কথার জন্যে দায়ী নই তাই আমি রাণীকে বললুম কি ভাবে সেই চাষী আমাকে তার ক্ষেতে হঠাৎ কুড়িয়ে পায় এবং আমার জন্যে সে যা করেছে তার প্রতিদানে আমাকে রাজ্যের প্রায় অর্ধেক দেশে আমাকে দেখিয়ে ও বিক্রি করে অনেক গুণ বেশী লাভ করেছে। এজন্যে আমাকে এত বেশি পরিশ্রম করতে হয়েছে যে আমার চেয়ে দশগুণ শক্তিশালী একটা প্রাণী মারা যেতে পারত। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কসরৎ দেখাতে দেখাতে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়তুম, আর কিছুদিন পরে হয় আমি অথর্ব হয়ে পড়তুম বা মারা যেতুম তা নইলে আমার চাষী কর্তা আপনার কাছে আরও অনেক বেশি দাম দাবি করত, এত সস্তায় ছাড়ত না। কিন্তু তখন মহারাণীর আশ্রয়ে আমার আর নিষ্ঠুর ব্যবহারের ভয় নেই। মহারাণী সর্বগুণসম্পন্না, দয়াবতী, প্রজাদের হিতকারী, তুলনাহীনা। অতএব আমি মনে করি আমার মৃত্যুভয় আর থাকবে না বলতে কি মহারাণীর কোমল ব্যবহার ও কথাবার্তা আমার মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করেছে।

আমি ছোটখাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললুম, কিছু দ্বিধা কিছু ত্রুটি হয়তো ছিল। তামাকে যখন রাজপ্রাসাদে আনা হচ্ছিল তখন কি করে কথা বলতে হবে কি রকম আচরণ করতে হবে এসব গ্লামডালক্লিচ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। যে দেশের যে রীতি তা ত মানতে হবে।

আমার বচনভঙ্গিতে যে ত্রুটি ছিল মহারাণী সে সব গ্রাহ্য করলেন না, এমন ক্ষুদে মনুষ্যাকৃতি একটা জীব পরদেশের ভাষায় এমন চমৎকার সব কথা বলছে তাই শুনে তিনি চমৎকৃত। তিনি আমাকে তাঁর নিজের হাতে তুলে নিলেন তারপর আমাকে নিয়ে চললেন মহারাজের ঘরে। মহারাজা তখন তাঁর খাস কামরায় বিশ্রাম করছিলেন। মহারাজাকে দেখতে মহারাজার মতোই। বেশ একটা রাজকীয় গাম্ভীর্য আছে এবং সারা মুখটায় বিশেষ একটা সৌন্দর্য আছে। রাণীর হাতে ক্ষুদে কি একটা পড়ে আছে সেজন্য তিনি সেদিকে তেমন মন দেননি। তাছাড়া আমি মহারাণীর হাতে উপুড় হয়ে শুয়েছিলুম তাই তিনি বললেন, তুমি আবার কবে থেকে এসপ্লাকনাক পুষতে

আরম্ভ করলে? মহারাণী মুচকি হাসলেন অর্থাৎ মহারাজাকে বলতে চাইলেন তোমাকে অবাক করে দিচ্ছি। তারপর আমাকে তুলে মহারাজার সামনে ছোট একটা গোলাকার টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে মহারাজকে আমার পরিচয় দিতে বললেন। আমি অল্প কথায় আমার পরিচয় পেশ করলুম। গ্লামডালক্লিচ খাসকামরার দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে আমাকে তার চোখের আড়াল করতে চায় না। তাকে ভেতরে আসতে দেওয়া হল এবং আমি যা বলেছিলুম তার সমর্থনে তার বাবা আমাকে ক্ষেতে কুড়িয়ে পাওয়ার পর থেকে যা কিছু ঘটেছিল সব বলল।

মহারাজা তাঁর রাজ্যের যে কোনো সুশিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা কম শিক্ষিত নন। তিনি দর্শন পড়েছেন এবং গণিতে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু যখন আমি আমার দু'-পায়ে সোজা হয়ে চলতে আরম্ভ করলুম তখন ভেবেছিলেন আমি বুঝি দমদেওয়া একটা ঘড়ি (সে দেশে তখন সবেমাত্র ভাল ঘড়ি তৈরি হচ্ছে), কোনো কুশলী কারিগর তৈরি করেছে। কিন্তু যখন তিনি আমার ভাষণ শুনলেন তখন তিনি রীতিমতো অবাক। তিনি বুঝলেন আমি কোনো একটা ভাষায় কথা বলছি যদিও সে ভাষা তাঁর অজানা। আমি তাঁর দেশে কি ভাবে এলুম তা তাঁকে বললুম কিন্তু তিনি বোধহয় বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি বোধহয় ভাবলেন যে আমাকে চড়া দামে বিক্রি করবার জন্যে গ্লামডালক্লিচ ও তার বাবা একটা কাল্পনিক কাহিনী খাড়া করে এবং সেই কাহিনীটি ওরা ওদের ভাষায় বলতে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। এই ভেবে তিনি আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনি আমার কাছ থেকে যুক্তিপূর্ণ উত্তরই পেতে থাকলেন। অবশ্য এদেশের ভাষা আমি তখনও উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে পারি নি, আমার উচ্চারণে ত্রুটি ছিল এবং আমার চাষী কর্তার বাড়িতে শেখা এমন কিছু ভাষায় কথা বলেছিলুম যা রাজসভায় উচ্চারণ করার অনুপযুক্ত।

আমি জীবটা কি রকম সেটা স্থির করবার জন্যে মহারাজা তাঁর তিনজন মহামান্য পণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এসে আমাকে দূরে থেকে, কাছ থেকে, উলটে-পালটে নানাভাবে পরীক্ষা করে বললেন যে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে আমার জন্ম হয় নি। আমি যে পৃথিবীতে কি করে বেঁচে আছি তাও তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কারণ আমি দ্রুতগামী নই, গাছে উঠতে পারি না, গর্ত খুঁড়তে পারি না। তাঁরা আমার দাঁতগুলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করলেন এবং সাব্যস্ত করলেন যে আমি সর্বভুক। কিন্তু অধিকাংশ চতুষ্পদ প্রাণী বা ছোটখাটো জীব যথা ইঁদুর যেভাবে জীবন ধারণ করে আমার সে ক্ষমতাও নেই এবং আমি যদি শামুক বা কিছু পোকা-মাকড় না খাই তাহলে আমি বেঁচে থাকব কি করে? তাঁরা এজন্যে নানারকম যুক্তি ও তথ্য পেশ করলেন। একজন পণ্ডিত বললেন আমি এখনও ভ্রূণ অবস্থায় আছি, অস্বাভাবিক ভাবে আমার জন্ম হয়ে গেছে, ঠিক সময়ে আমার জন্ম হলে আমি ওঁদের মতোই দীর্ঘাকৃতি হতুম। কিন্তু অপর দুই পণ্ডিত তাঁর এই যুক্তি বাতিল করে দিলেন। তাঁরা বললেন আমার হাত পা, অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বাভাবিক এবং আমার বেশ বয়সও হয়েছে, এই পৃথিবীতে বেশ কিছু দিন বেঁচে আছি। তাঁরা ম্যাগনিফাইং

গ্লাস দিয়ে আমার কাটা দাড়ি পরীক্ষা করে এই রায় দিলেন। তাঁরা বললেন আমি বামন নই কারণ বামনরাও এত ক্ষুদ্র হতে পারে না। রাণীর যে প্রিয় বামনটি আছে, যা নাকি এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট তার উচ্চতা তিরিশ ফুট। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সাব্যস্ত করলেন আমি প্রকৃতির খেয়াল।

তাঁরা এইরূপ সাব্যস্ত করার পর আমি প্রার্থনা করলুম আমাকে কয়েকটা কথা বলতে দেওয়া হক। অনুমতি পেয়ে মহারাজাকে বললুম আমি যে দেশ থেকে আসছি সে দেশে আমার মাপ অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ নরনারী আছে এবং সেদেশের বাড়ি ঘর জীবজন্তু গাছপালা সেই মাপ অনুযায়ী ঠিক। আপনাদের দেশে আপনারা যেমন দীর্ঘকায় তেমনি আপনাদের গাছপালা ও জীবজন্তুও বিরাটকায়। মহারাজ আপনার রাজ্যে যেমন প্রজাদের অনেক অধিকার আছে আমাদের দেশেও অনুরূপ অধিকার আমরাও ভোগ করি। আপনার পণ্ডিতগণ যা সাব্যস্ত করলেন তা ঠিক নয়। পণ্ডিতেরা অবশ্য আমার কথা মানলেন না, বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। তাঁরা মন্তব্য করলেন আমার সেই কর্তা চাষী আমাকে ভালভাবেই শিখিয়ে দিয়েছে! মহারাজার মন কিন্তু তাঁর পণ্ডিতগণ অপেক্ষা যুক্তিবাদী, তাঁর বোধশক্তি প্রখর। তিনি পণ্ডিতদের বিদায় দিয়ে সেই চাষীকে ডেকে পাঠালেন। সৌভাগ্যক্রমে চাষী তখনও নগর ছেড়ে চলে যায় নি। মহারাজা তাকে নিজে পৃথক ভাবে গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, পরে তার কন্যা ও আমাকে ডাকলেন। সকলকে নানা প্রশ্ন করে তাঁর সম্ভবত বিশ্বাস হল আমি সত্য কথাই বলেছি। তিনি মহারাণীকে আদেশ দিলেন যে আমার জন্য যেন বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। আমার দেখাশোনার জন্যে গ্লামডালক্লিচ থাকবে কারণ মহারাজ আমাদের দুজনের মধ্যে স্নেহের সম্পর্ক লক্ষ্য করেছিলেন। গ্লামের জন্যে রাজপ্রাসাদের মধ্যে পৃথক কক্ষ ঠিক করে দেওয়া হল, তার শিক্ষার জন্য একজন গভরনেস নিযুক্ত করা হল, তাকে পোশাক-পরিচ্ছদ পরানো ও তার প্রসাধনের জন্য আরও একজন মহিলাকে নিযুক্ত করা হল। এছাড়া ছোটখাটো কাজের জন্য দু'জন পরিচারিকাও নিযুক্ত করা হল। কিন্তু আমার সব কাজ গ্লাম করবে। রাণী তাঁর আসবাব প্রস্তুতকারককে আদেশ দিলেন আমার বাসযোগ্য একটি বাক্স তৈরি করে দিতে কিন্তু তার মধ্যে শয়ন ব্যবস্থা ও অন্যান্য অংশ কিভাবে নির্মিত হবে তা আমি ও গ্লাম ঠিক করে দোব। আসবাব প্রস্তুতকারক একজন কুশলী কারিগর। সে বারো ফুট উচ্চ ও ষোল ফুট চৌকো চমৎকার একটি কাঠের চেম্বার বানিয়ে দিল। শার্সি সমেত জানালা এবং দরজা ত রইলই এবং ওরই মধ্যে লণ্ডন বেডচেম্বারের মতো দুটো কুটুরিও বানিয়ে দিল। ছাদের সঙ্গে যুক্ত করে কব্জা লাগিয়ে এমন কৌশলে শোবার খাট তৈরি করে দিল যে সেটি ওঠানো নামানো যাবে। রাজবাড়ির বিছানা সরবরাহকারী উত্তম বিছানা তৈরি করে দিল। খাটসমেত বিছানা গ্লাম সহজেই রোদে দিতে পারত আবার দরকারের সময় নামিয়ে দিত। কাঠের মিস্ত্রী আমার জন্যে দুটি সুন্দর চেয়ার তৈরি করে দিল, ঠেস দেবার জায়গায় হাঁতির দাঁতের মতো চমৎকার একটা সাদা পদার্থ সেঁটে দিল। দুটো টেবিল তৈরি করে দিল আর আমার জিনিসপত্র রাখবার জন্যে একটা দরজাওয়ালা

অনুচ্চ আলমারিও বানিয়ে দিল। কাঠের ঘরের দেওয়াল ও মেঝেতে তুলোর তোশক বসিয়ে দেওয়া হল। যারা আমাকে বয়ে নিয়ে যাবে, দুর্ঘটনাক্রমে তাদের হাত থেকে আমি পড়ে গেলেও আমার দেহে যেন আঘাত না লাগে। আমাকে আরাম দেবার সব রকম ব্যবস্থাই করা হল। দরজায় তালার ব্যবস্থা করে দিতে বললুম কারণ এ

সে চমৎকার একটি কাঠের চেম্বার বানিয়ে দিলে।

দেশের ইঁদুরকে আমার বড় ভয়। একজন স্যাকরা অতি ক্ষুদ্র একটি তালা বানিয়ে দিল। ওদের তুলনায় খুবই ছোট। অবশ্য এর চেয়ে বড় তালা আমি ইংলণ্ডে একজন ভদ্রলোকের বাড়ির ফটকে দেখেছিলুম। তালার চাবি রাখবার জন্যে পকেটের মধ্যে ছোট একটা পকেট করলুম। চাবি নিজের কাছেই রাখতুম কারণ ভয় ছিল গ্লাম যদি চাবি হারিয়ে ফেলে এই চাবি ওর কাছে খুবই ছোট। দেশে সবচেয়ে যে পাতলা সিল্ক পাওয়া যায়, রাণী সেই সিল্ক দিয়ে আমার পোশাক বানাবার অর্ডার দিলেন। তবুও সে সিল্ক আমাদের ইংলিশ কম্বলের চেয়ে অল্প পাতলা। এত মোটা কাপড়ের পোশাক পরতে অসুবিধা হচ্ছিল তবে ক্রমশঃ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পোশাক ওদের ফ্যাশান অনুযায়ী তৈরী হয়েছিল যার খানিকটা পারসিক পোশাকের মতো, আর খানিক চৈনিক পোশাকের মতো। তাহলেও এ পোশাকের ইজ্জত আছে।

মহারাণীর কাছে আমি শেষ পর্যন্ত এমন প্রিয় হয়ে উঠলুম যে রাণী আমাকে ছাড়া আহারে বসতে পারতেন না। তাঁর খাবারের টেবিলের ওপরে বাঁ দিকে আমার জন্যে এবং আমার মাপ মতো একটি টেবিলও চেয়ার বসানো হ'ল। গ্লামডালক্লিচ পাশেই একটি টুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত আমাকে সাহায্য করবার জন্যে। রাণী আমার জন্য এক সেট ডিশ প্লেট ছুরি কাঁটা চামচে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। লণ্ডনে একটি খেলনার দোকানে আমি এক সেট খেলাঘরের ডিনারসেট দেখেছিলুম। সেগুলি আমার কাছে যেমন ছোট মনে হয়েছিল আমার ডিনারসেট নিশ্চয় এদের কাছে তেমনি

ছোট মনে হচ্ছে। রূপোর এই বাসনগুলি আমার ছোট্ট নার্স গ্লাম সম্বন্ধে পরিষ্কার করে একটি রূপোর কৌটোয় ভরে তার পকেটে রেখে দিত এবং দরকারের সময় বার করে নিত। রাণীর সঙ্গে দু'জন রাজকুমারী ছাড়া আর কেউ ভোজন করত না। রাণীর বড় কন্যাটির বয়স ষোলো আর ছোটটির তেরো বছর এক মাস। রাণী এক টুকরো মাংস আমার টেবিলে তুলে দিতেন, আমি আমার আবশ্যক মতো টুকরো কেটে নিতুম। আমি আবার সেই টুকরো থেকে ছোটো ছোটো টুকরো আমার কাঁটায় গেঁথে মুখে পুরতুম তাই দেখে রাণী খুব কৌতুক অনুভব করতেন। কারণ রাণী নিজে যে (তাঁর হজমশক্তি দুর্বল ছিল) মাংসের বড় টুকরোটি মুখে পুরতেন সোটি এত বড় ছিল যে 'বারোজন ইংরেজ চাষী' সেই রকম এক টুকরো মাংস পেলে তাদের একবারের খাওয়া হয়ে যেত। একজন মহিলা (অবশ্য আকারে বৃহৎ) অত বড় এক টুকরো মাংস মুখে পুরছেন্ দেখেই আমার গা গুলিয়ে উঠত। একটা সারস পাখির অর্ধেক অংশ তিনি মুখে পুরে দিতেন তারপর হাড়গোড় সব কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেতেন। সেই সারস পাখি আমাদের ন'টা টার্কি'র সমান হবে আর তিনি মাংস খেতে খেতে যে রুটির টুকরো মুখে দিতেন তা আমাদের বারো পেনি দামের দুটো রুটির সমান। পিপে থেকে সোনার কাপে সুরা ঢেলে তিনি ঢক করে খেয়ে ফেলতেন। তার ছুরি ও চামচ ও অন্যান্য সরঞ্জাম তাঁর হাতের মাপ মতোই ছিল। আমাকে গ্লাম একবার আমার কৌতুহল মেটাতে ডাইনিং হলে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে টেবিলের ওপর বিরাট আকারের ছুরি কাঁটা দেখে আমি অবাক। বাবাঃ, এত বিরাট আকারের ছুরিকাঁটা আমি কখনও দেখি নি ভাবতেই পারি না।

প্রতি বুধবার (আগে বলেছি বুধবার ওদের স্যাবাথ ডে—বিশ্রাম দিবস) রাজা, রাণী, রাজকুমার ও রাজকুমারীরা একত্রে মহারাজার কক্ষে একত্রে ডিনার খেতেন। তাঁদের টেবিলের ওপর আমারও টেবিল পড়ত, আমিও তাঁদের সঙ্গে আহার করতুম। কারণ মহারাজাও আমাকে পছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন। ওঁদের টেবিলের বাঁ দিকে আমার টেবিল পড়ত, পাশেই থাকত লবণদানী। রাজকুমার আমার সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসতেন। তিনি ইউরোপের রীতিনীতি, ধর্ম, আইন, শাসনকার্য, শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে চাইতেন। আমি যথাসম্ভব তাঁর কৌতুহল চরিতার্থ করতুম। তাঁর বোধশক্তি ও বিচারবুদ্ধি তীক্ষ্ন ছিল। আমার বক্তব্য শোনার পর তিনি বিষয় বস্তুগুলি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করতেন। তবে আমি এ কথা বলব যে আমার প্রিয় স্বদেশভূমির বিষয় যথা তার ব্যবসাবাণিজ্য, স্থলে জলে যুদ্ধ, ধর্ম নিয়ে বিভেদ, দেশের রাজনীতিক দল, শিক্ষা নিয়ে গোঁড়ামি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে করতে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতুম। রাজকুমার তখন আমাকে তাঁর হাতে তুলে নিয়ে অপর হাত দিয়ে আমার পিঠে মৃদুভাবে হাত বোলাতে বোলাতে খুব হাসতেন। হাসতে হাসতে আমাকে প্রশ্ন করতেন, মশাই তুমি কোন দলের? হুইগ না টোরি? রাজদণ্ডের সমান দীর্ঘ একটি সাদা যষ্টি নিয়ে তাঁর প্রথম মন্ত্রী তাঁর পশ্চাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে উদ্দেশ করে কুমার বললেন মানুষের এই সব জাঁকজমক ও আড়ম্বর তুচ্ছ মনে হয়

যখন ভাবি আমার হাতের ওপরের এই ক্ষুদে মানুষরাও নাগরিকদের উপাধি ও সম্মান প্রদান করে, বাড়ি ঘর শহর তৈরি করে, সাজপোশাক তৈরি করে, ভাবভালবাসা করে আবার যুদ্ধও করে, অপর মানুষকে ঠকায়, বিশ্বাসঘাতকতাও করে। আমাদের মহান দেশ সম্বন্ধে কুমারের ভাল মন্তব্য শোনবার সময় যেমন গৌরব বোধ করছিলুম তেমনি কটু মন্তব্য শোনবার সময় ক্রোধও হচ্ছিল, মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের শিল্প বা সমর-সজ্জা, ফ্রান্সের কিছু কলংক, ইউরোপের স্বাধীন নারী, আমাদের নৈতিক উৎকর্ষ বা ধর্মাচরণ, সম্মান বা সত্যবাদীতা কিংবা অহংকার ও হিংসা সম্বন্ধে তাঁর অনেক মন্তব্য আমার ভাল লাগে নি।

কিন্তু মুখ বুজে সবই সহ্য করতে হয়, আমার এমন ক্ষমতা নেই যে ওদের সঙ্গে পেরে উঠি। মনকে বোঝাই, নিজের দেশেও ত অনেক কিছু দেখে বিদ্রূপ করি বা হাসি বা বাহবা দিই অতএব এ ধরনের দোষ গুণ এদেরও থাকবে। মাঝে মাঝে আমিও মনে মনে হাসি। রাণী যখন আমাকে তাঁর হাতে তুলে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ান তখন আমার নিজেকেই নিজের আসল আকার অপেক্ষা খুব ছোট মনে হয়। তখনই আমার হাসি পায়।

কিন্তু আমার ক্রোধ হয় এবং আমি মর্মাহত হই যখন রাণীর সেই দুর্বিনীত বামন আমাকে বিদ্রূপ করে। ওদের দেশে অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা তার উচ্চতা অনেক কম (ওর উচ্চতা তিরিশ ফুটের বেশি নয়)। তবুও সে আমার চেয়ে অনেক লম্বা, তারই সুযোগ নিয়ে সে মাঝে মাঝে সীমা ছাড়িয়ে আমাকে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করে। অপমানে আমার গা জ্বালা করে। আমি যখন রাণীর খাস কামরায় রাজসভার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলি সেই সময়ে সে ইচ্ছে করে আমার পাশ দিয়ে কয়েকবার যাবে ও সেই সঙ্গে আমার ক্ষুদ্র আকৃতি নিয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করবে। আমি কি আর করব,

ক্রিম ভর্তি বড় একটা রুপোর বাটিতে ফেলে দিয়েই ছুটে পালাল।

তখন তাকে 'এস আমার ভাই' বলে শুধু সম্বোধন করতুম বা ঠাট্টা করে কিছু বলতুম ঃ

আমার কোন মন্তব্য তাকে খোঁচা দিয়ে থাকবে তাই একদিন আমি যখন মহারাণীর ডাইনিং টেবিলে আহার করছিলুম সেই সময়ে বামনটা একটা চেয়ারে উঠে আমাকে আমার কোমর ধরে ক্রীম ভর্তি বড় একটা রুপোর বাটিতে ফেলে দিয়েই ছুটে পালাল। আমি সাঁতার না জানলে ডুবেই যেতুম। গ্লামডালক্লিচ তখন আমার পাশে না থাকলেও ঘরের অপর প্রান্তে ছিল, আর রাণী যদিও সামনেই ছিল কিন্তু এমন ভয় পেয়েছিল যে কি করবেন বুঝতেই পারছিলেন না। কিন্তু আমার ছোট্ট নার্স আমাকে রক্ষা করার জন্যে ছুটে এসে ক্রীমের বাটি থেকে তুলে নিল। ততক্ষণে আমি বেশ খানিকটা ক্রীম গিলে ফেলেছি। তবে আমার কোনো ক্ষতি হয় নি, পোশাকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গ্লাম আমাকে শুইয়ে দিল। বামনটাকে শাস্তি দেওয়া হল, তাকে বেশ করে চাবুকপেটা করা হল এবং সেই বাটি ভর্তি সব ক্রীমটা তাকে খেতে হল। রাণী তাকে আর কাছে আসতে দিলেন না। শুধু তাই নয়, তাকে প্রাসাদ থেকে বিদেয় করে এক অভিজাত মহিলাকে দান করে দিলেন। আমিও বাঁচলুম। হিংসুটে বেঁটে বামনটা রেগে গিয়ে আমার আরো সাংঘাতিক কিছু ক্ষতি করতে পারত।

এর আগেও বেঁটেটা আমার সঙ্গে বিশ্রী রকম রসিকতা করেছে। তা দেখে রাণী হেসেছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে অসোয়াস্তি বোধও করেছেন এবং বেঁটেটাকে হয়ত কঠোর শাস্তি দিতেন যদি না আমি বাধা দিতুম। মহারাণী মজ্জাভর্তি একটা ফাঁপা হাড় তুলে নিলেন তারপর তার ভেতর থেকে মজ্জা ঠুকে ঠুকে বার করে নিয়ে ও পরে হাড়টা চুষে খেয়ে নিয়ে হাড়টা প্লেটের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলেন। বেঁটের মাথায় সর্বদা দুষ্ট বুদ্ধি। গ্লাম যে টুলটায় দাঁড়িয়ে আমার খাওয়ার তদারক করে সে নিজের চেয়ার ছেড়ে চট করে সেই টুলটায় উঠে দাঁড়িয়ে টপ করে আমাকে তুলে নিল তারপর আমার পা দুটো টিপে ধরে সেই ফাঁপা হাড়ের মধ্যে কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল। আমি সেই অবস্থায় অসহায় হয়ে আটকে রইলুম। আমি সেই অবস্থায় প্রায় এক মিনিট আটকে ছিলুম, কেউ লক্ষ্য করে নি এবং আমিও চেঁচাই নি। এরা গরম মাংস খান না তাই আমার পা পোড়ে নি কিন্তু আমার মোজা ও ব্রিচেস নষ্ট হয়ে গেল। বেঁটে কয়েক ঘা বেত খেয়ে ছাড়া পেল, আমি অনুরোধ না করলে রীতিমতো উত্তম-মধ্যম খেতে হত।

আমার সাহসিকতার জন্যে রাণী আমাকে মাঝে মাঝে চুটকি মন্তব্য করতেন এবং হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কি গো তোমাদের দেশের সব লোক তোমার মতো ভীতু নাকি ?' একটা ঘটনা এইরকম ঘটেছিল। এ রাজ্যে গ্রীষ্মকালে মাছির বড় উৎপাত। এক একটা মাছি ডানস্টেবল সারস পাখির সমান বড়, আমি যখন খেতে বসতুম এই বিশ্রী পোকাগুলো আমাকে বিরক্ত করে মারত, কানের কাছে সর্বদা ভোঁ ভোঁ করত। মাঝে মাঝে পোকাগুলো আমার খাবারের ওপর বসে মলত্যাগ করত বা ডিম পাড়ত। এসব অবশ্য এদেশের মানুষের নজরে আসত না, চোখ বড় হলে কি হয় এত ছোট জিনিস ওদের চোখে ধরা পড়ে না। কখনও কখনও মাছিগুলো

আমার নাকে বা কপালে বসে দংশন করত আর আমি বেশ বুঝতে পারতুম কি একটা চটচটে পদার্থ আমার দেহে লাগল। সেটার বিশ্রী গন্ধ। আমাদের দেশের প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা বলেন যে ঐ চটচটে পদার্থের জন্যে ওরা ঘরের ভেতরের ছাদে পা উঁচু করে হাঁটতে পারে। বিশ্রী মাছিগুলোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমাকে রীতিমতো হাত পা ছুঁড়তে হত। খুব খারাপ লাগত যখন মাছিগুলো মুখে বসত। বেঁটে বামনটা ইসকুলের ছেলের মতো প্রায়ই পাঁচ সাতটা মাছি ধরে, রাণীকে মজা দেখাবার জন্যে, আমার নাকের তলায় ছেড়ে দিত। আমি আমার ছোরা বার করে ওগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে দু'টুকরো করে দিতুম। টেবিলে যারা থাকত তারা আমার কৌশলের প্রশংসা করত।

একদিন সকালের কথা মনে পড়ে। আমি যাতে মুক্ত বায়ু সেবন করতে পারি এজন্যে গ্লামডালক্লিচ আমার ঘর-বাক্সটা জানালার ধারে রেখে গেছে। ইংলন্ডে আমরা যেমন জানালার বাইরে পাখির খাঁচা টাঙিয়ে দিই সেরকম আর কি। তবে এভাবে আমার ঘর-বাসা টাঙানো সাহস হয় না। আমি একটা শার্সি তুলে দিয়েছি। পরিষ্কার দিন। টেবিলের ওপর কেক রাখা রয়েছে, চেয়ারে বসে একটু একটু করে কেক খেতে খেতে ব্রেকফাস্ট করছি এমন সময় বোধহয় মিষ্টি কেকের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গোটা কুড়ি বোলতা খোলা জানলা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঘরের ভেতর বোলতাগুলো উড়তে উড়তে বোঁ বোঁ আওয়াজ করছে যেন ব্যাগপাইপ বাজছে। কয়েকটা বোলতা ত কেকের ওপর বসে খানিকটা করে কেক তুলে নিয়ে গেল। কতকগুলো ত আমার মাথার ওপর বা মুখের কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম, হুল ফুটিয়ে দিলেই হয়েছে আর কি! যাইহক আমি সাহস করে আমার ছোরা বার করে ওগুলোকে আক্রমণ করলুম। চারটে বোলতাকে মাটিতে পেড়ে ফেললুম, বাকিগুলো জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ করে দিলুম। এক একটা বোলতা আকারে তিতির পাখির সমান। ওদের হুল দেখলুম, এক একটা দেড় ইঞ্চি লম্বা আর ছুঁচের মতো ধারালো। মরা বোলতাগুলো আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলুম। বোলতাগুলি এবং আরও কিছু জিনিস আমি ইউরোপে অনেককে দেখিয়েছিলুম। ইংলন্ডে ফিরে আমি তিনটে বোলতা গ্রেশাম কলেজে দান করেছিলুম আর একটা নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলুম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেশটির বর্ণনা। আধুনিক মানচিত্র সংস্কারের প্রস্তাব। রাজপ্রাসাদ ও নগরের বর্ণনা। লেখকের ভ্রমণের বিশেষত্ব। প্রধান মন্দিরের বিবরণী।

আমি এবার পাঠকদের এই দেশটির সংক্ষেপে কিছু বিবরণ দেব। তবে পুরো দেশটার নয়। প্রধান নগর লোরব্রুলগ্রুড-এর চারদিকে দু হাজার মাইল পর্যন্ত আমি ঘুরেছি, সেইটুকুর বিষয়ই জানাব। কারণ মহারাণী যাঁর সঙ্গে আমি সর্বদা থাকতুম তিনি আমাকে এর বেশি নিয়ে যান নি। মহারাণী আমাকে নিয়ে মহারাজার সঙ্গেই বেরোতেন। মহারাণীকে এক জায়গায় রেখে মহারাজা দেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতেন। মহারাজার অধিকারে এই দেশটি দৈর্ঘ্যে ছ'হাজার মাইল ও প্রস্থে তিন থেকে পাঁচ হাজার মাইল হবে। কি ভাবে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম বলতে পারব না, আমার বিশ্বাস যে ইউরোপের ভৌগলিকরা একটা মস্ত ভুল করেছেন, তাঁরা বলেন ক্যালিফরনিয়া ও জাপানের মধ্যে সমুদ্র ব্যতীত কোনো দেশ নেই। কিন্তু আমার চিরদিনই বিশ্বাস যে পৃথিবী তার ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্যে টারটারি মহাদেশের বিপরীতে নিশ্চয় আর একটা দেশ রেখেছে। তাই অ্যামেরিকার উত্তর পশ্চিম দিকে যে বিশাল দেশটি রয়েছে সেটি তাদের ম্যাপ ও চার্টে দেখিয়ে ভ্রম সংশোধন করুক এবং এ বিষয়ে আমি তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এই রাজ্যটি একটি উপদ্বীপ যার উত্তর-পূর্ব দিকে আছে তিরিশ মাইল উচ্চ এক পর্বতশ্রেণী যা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, কারণ পর্বত চূড়ায় বিশাল আগ্নেয়গিরি আছে। সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিতরাও জানেন না পর্বতের ওধারে মানুষ বা কি ধরনের জীব বাস করে অথবা কোনো জীব হয়ত ওধারে বাস করেই না। এই রাজ্যের তিন দিকে সমুদ্র। সারা সমুদ্র উপকূলে কোথাও একটাও বন্দর নেই। তাছাড়া নদীগুলি যেখানে সমুদ্রে পড়েছে সেখানে বিরাট সব ছুঁচলো পাথর আছে আর সেই পাথরের ওপর ক্ষিপ্ত সমুদ্র আছড়ে পড়ছে। এজন্যে ওখানে ছোটো নৌকো ভাসাতেও কেউ সাহস করে না।

এই কারণে এই দেশের মানুষ দেশ থেকে বেরোতে পারে নি এবং অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারে নি। এরা একাই বসবাস করছে। দেশের বড় বড় নদীগুলিতে বড় বড় জলযান আছে আর আছে বড় বড় সুস্বাদু মাছ। ওরা এই মাছ খায়। সমুদ্রেও মাছ আছে, সে মাছের আকার ইউরোপের সমুদ্রের মাছের মতো। একে ত এরা সমুদ্রে যেতে পারে না এবং যেহেতু সমুদ্রের মাছের আকার এদের তুলনায় ক্ষুদ্র অতএব ওরা সমুদ্রে মাছ ধরার ঝুঁকি নেয় না। এদেশে গাছপালা ও পশুপক্ষী প্রচুর এবং তাদের আকারও বিরাট। কেন এমন হয়েছে তা দার্শনিকরা স্থির করবেন। মাঝে মধ্যে তিমি মাছ সমুদ্র উপকূলের ছুঁচলো পাথরে আছাড় খেয়ে পডলে এরা তিমিটাকে তুলে আনে, রান্না করে, তৃপ্তি করে খায়। এই তিমি এত বড় যে একজন মানুষ তার কাঁধে ফেলে বয়ে আনতে পারে না তবে টুকরি করে লোরব্রুলগ্রুডে বয়ে আনে। একটা মাছ আমি রাজার ডাইনিং টেবিলে একটা ডিসে দেখেছিলুম। এ মাছ দুর্লভ তবে রাজা এ মাছ পছন্দ করলেন না হয়ত এর বিরাট আকারের জন্যে। আমি অবশ্য গ্রীনল্যাণ্ডে এর চেয়েও বড় তিমি দেখেছি।

এদেশের জনসংখ্যা মন্দ নয়। একান্নটি নগর আছে, দেওয়াল ঘেরা শহর আছে প্রায় একশ, গ্রাম আছে প্রচুর।

পাঠকদের কৌতুহল মেটাতে লোরব্রুলগ্রুড নগরটির বর্ণনা দেওয়া উচিত। একটি নদীর দুই তীরে নগরটি প্রায় সমান দুই অংশে বিভক্ত। নগরে বাড়ি আছে আশি হাজারের ওপর। দৈর্ঘে নগরটি তিন গ্লংলু (অর্থাৎ ইংরেজি হিসেবে চৌয়ান্ন মাইল) আর প্রস্থে আড়াই গ্লংলু। রাজার আদেশে নগরের রাজকীয় মানচিত্রটি মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং স্কেল অনুসারে আমি নিজে খালি পায়ে সেই একশ ফুট ম্যাপের ওপর খালি পায়ে হেঁটে মাপ যাচিয়ে দেখেছি।

রাজপ্রাসাদটি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাড়ি নয়, সাত মাইল ব্যাপী অনেকগুলি বাড়ীর সমষ্টি। প্রধান ঘরগুলি সাধারণতঃ দুশো চল্লিশ ফুট উঁচু এবং ঘরের মেঝের মাপও সেই অনুপাতে লম্বা ও চওড়া। গ্লামডালক্লিচ ও আমাকে একটি ঘোড়ার গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। গ্লামের গভরনেস সেই গাড়িতে করে গ্লাম ও আমাকে প্রায়ই শহর দেখাতে বেরোত, গ্লাম কিছু কেনবার জন্যে কোনো দোকানেও ঢুকত। আমি আমার ঘর-বাক্স সমেত ওদের সঙ্গী হতুম। আমার অনুরোধে গ্লাম আমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসত যাতে আমি শহরের বাড়ি ঘর, লোকজন ভাল করে দেখতে পাই। আমাদের গাড়িটি ওয়েস্ট মিনিস্টার হলের মাপ মতো হবে তবে চৌকো। অতটা উঁচু হবে না হয়ত, ঠিক বলতে পারছি না। একদিন কয়েকটা দোকানের সামনে গভরনেস গাড়ি থামাতে বলল। সেখানে বসে ছিল এক পাল ভিখারি। গাড়ি থামাতে দেখেই তারা গাড়ি ঘিরে ফেলল। ইস্ কি বীভৎস দৃশ্য। এমন গা গুলিয়ে ওঠা দৃশ্য কোনো ইউরোপীয় দেখে নি। একটা বুড়ীর বুকে ক্যানসার, একেই ত বিরাট ওদের শরীর তায় ফুলে আরও বড় হয়েছে, দগদগে ঘা আর গর্তয় ভর্তি। কয়েকটা গর্তয় আমি হয়ত ঢুকে যাব। একটা লোকের ঘাড়ে বিরাট এক টিউমার, পাঁচ গাঁট উলের

সমান হবে। খট্‌খট্‌ করতে করতে একটা ভিখারি এল, তার কাঠের পা, এক একটা পা কুড়ি ফুট। ভিখারিদের ছেঁড়া, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত জামা কাপড়ের ওপর দিয়ে উকুন চরে বেড়াচ্ছে দেখে গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। আমি আমার খোলা চোখে উকুনের পা ও অন্য অঙ্গ দেখতে পাচ্ছিলুম। আমাদের দেশে মাইক্রোস্কোপে দেখা উকুনের চেয়ে আরও স্পষ্ট দেখছি। স্পষ্টভাবে এত বড় উকুন আমি এই প্রথম দেখলুম। সঙ্গে যন্ত্রপাতি বা ছুরি থাকলে (দুর্ভাগ্যক্রমে এসবই আমি জাহাজে ফেলে এসেছি) একটা উকুন ধরে চিরে দেখতুম কিন্তু সব মিলিয়ে চারদিকের দৃশ্য এতই জঘন্য যে পেট থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে।

আমি প্রাসাদে যে বাক্স-ঘরে থাকি সেটা গাড়িতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার পক্ষে অসুবিধেজনক। তাছাড়া ওটা গ্লামডালক্লিচের কোলে রাখার পক্ষে উপযুক্ত নয়। সেজন্যে মহারাণী সেই ছুতোর মিস্ত্রিকে দিয়েই ছোট একটা ঘর বাক্স তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। এটা লম্বা ও চওড়া উভয় দিকে বারো ফুট আর দশ ফুট উঁচু। বাক্স তৈরি করবার সময় আমিও মিস্ত্রিকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলুম। এ বাক্সটাও ঠিক অন্য বাক্সের মতো তবে ছোট। তিন দেওয়ালে তিনটে জানালা ছিল তবে দূরে পাল্লার ভ্রমণে কোনো দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে জানালায় জাল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেদিকে জানালা ছিল না সেদিকে দুটো মজবুত আলত্রাপ ছিল। আমার যদি ঘোড়ার পিটে চড়বার ইচ্ছে হত তাহলে আরোহীর কোমর বন্ধনীর সঙ্গে ঐ আলত্রাপ জুড়ে দেওয়া হত। আমি যখন রাজা বা মহারাজার সঙ্গে কোথাও যেতুম বা উদ্যানে বেড়াতে চাইতুম কিংবা কোনো মন্ত্রী বা মহিলার বাড়ি যেতুম এবং সেই সময় গ্লামডালক্লিচকে যদি তখন পাওয়া না যেত তাহলে কোনো বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে আমাকে এইভাবে পাঠান হত। ইতিমধ্যে অনেক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এবং তাঁরা আমাকে তুচ্ছ মনে না করে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন, সে অবশ্য আমার গুণ অপেক্ষা তাঁদের সহৃদয়তার জন্যই, তাঁদের বাড়ি আমি মাঝে-মাঝে ঐ বাক্সয় উঠে ঘোড়ায় করে যেতুম অবশ্য ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে।

যখন ঘোড়ার গাড়ি চেপে দূরে কোথাও ভ্রমণে যেতুম তখন গাড়ির ভেতরে ক্লান্তি লাগলে বা আমি বাইরে যেতে চাইলে কোচোয়ানের পাশে একটি কোমল বালিশের ওপর আমার বাক্সটি বসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু কোচোয়ানের বেল্টের সঙ্গে বাক্সটি সবসময় আটকে থাকত যাতে পড়ে না যায়। বাক্সর ভেতরে শোবার জন্যে বিছানা সমেত একটি খাট ছিল, সিলিং থেকে একটি হ্যামকও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, মেঝের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে আঁটা দু'টি চেয়ার ছিল যাতে চেয়ার উলটে আমি পড়ে না যাই। কিন্তু আমি সমুদ্র যাত্রায় অভ্যস্ত তাই গাড়ির ঝাঁকুনি মাঝে মাঝে বেশি হলেও আমাকে কাবু করতে পারত না।

যখন আমার শহর দেখবার ইচ্ছে হ'ত তখন একটা বিশেষ ব্যবস্থা করা হত। আমার জন্যে তখন একটা তাঞ্জাম আনা হত। তাঞ্জামটা বইত চারজন মানুষ, মহারাণীর

ভৃত্যদের উর্দি পরে। সঙ্গে আরও দুজন লোক যেত। সেই তাঞ্জামে গ্লামডালক্লিচ আমার বাক্স-ঘর তার কোলে নিয়ে বসত। শহরের লোকেরা আমার কথা শুনেছিল,

আমার নার্স আমার বাক্স-ঘর তার কোলে নিয়ে বসতো।

তারা আমাকে দেখবার জন্যে তাঞ্জামের চারিদিকে ভিড় করত। গ্লামডালক্লিচ আমাকে বাক্স-ঘর থেকে বার করে তার হাতের ওপর রাখত যাতে লোকজন আমাকে ভাল ভাবে দেখতে পায়।

শহরের বড় মন্দিরটা আমার দেখার খুব ইচ্ছা। বিশেষ করে মন্দিরের চুড়োয় উঠতে। কারণ ঐ চুড়ো হল শহরের সর্বোচ্চ, সব বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করতে আমার নার্স আমাকে নিয়ে মন্দিরের চুড়োয় উঠল। চুড়োয় উঠে আমি নিরাশ হলুম কারণ জমি থেকে এটি মাত্র তিন হাজার ফুট উঁচু যা এদেশের মানুষের তুলনায় খুবএকটা উঁচু নয়। এমন কি ইউরোপে এর তুলনায় অনেক উঁচু অট্টালিকা দেখা যায়, উদাহরণ স্বরূপ সলসবেরি স্টিপলের কথা বলা যায়। তবে আমি এদেশের কাছে নানাভাবে কৃতজ্ঞ, এদের ছোট করতে চাই না। মন্দির চুড়োটা আমার আশানুরূপ উঁচু না হতে পারে কিন্তু এর কারুকার্য ও শিল্পশোভা অতি চমৎকার। মন্দিরটি অত্যন্ত মজবুত। বড় বড় পাথর কেটে এর দেওয়াল গাঁথা হয়েছে। দেওয়ালগুলি একশ ফুট চওড়া। প্রত্যেকটা পাথর চল্লিশ ফুট চৌকো। মন্দিরের গায়ে খাঁজে খাঁজে দেব দেবী অথবা সম্রাটদের মারবেল মূর্তি। বিরাট বিরাট সব মূর্তি, আসল মানুষের চেয়েও বড়। একটা মূর্তি থেকে একটা কড়ে আঙুল ভেঙে মাটিতে পড়ে ছিল, আমি সেটা তুলে মেপে দেখলুম চার ফুট এক ইঞ্চি। গ্লাম সেটা তুলে নিয়ে রুমালে বেঁধে বাড়ি নিয়ে চলল। তার বয়সী মেয়েরা এইসব টুকিটাকি সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখে।

মহারাজার রন্ধনশালাটি দেখবার মতো। বাড়িটার মাথায় একটা গম্বুজ আছে,

ছ'শ' ফুট উঁচু। বাড়ির তুলনায় উনুন তত বড় নয়, আমাদের সেণ্ট পলস গির্জার গম্বুজের মতো হবে। উনুনটা আমি এদিক থেকে ওদিক মেপে দেখলুম, দশ কদম। রন্ধনশালার হাতা, খুন্তি ও অন্যান্য সরঞ্জামের বিবরণ দিলে ত পাঠকেরা বিশ্বাস করবে না, ভাববে সব ভ্রমণকারীর মতো আমি বুঝি বাড়িয়ে বলছি। আমি এইসব বর্ণনা দিতে বিরত থাকলুম কারণ এই বই যদি এই ব্রবডিংনাগ দেশের ভাষায় অনুদিত হয় তাহলে এদেশের রাজা ও প্রজারা ভাববে আমি বুঝি ওদের ছোট করে দেখেছি।

মহারাজা তাঁর আস্তাবলে কখনও দু'শ-এর বেশি ঘোড়া রাখতেন না। এক একটা ঘোড়া চৌয়ান্ন থেকে ষাট ফুট উঁচু। যখন তিনি কোনো শুভদিনে বা কোনো উপলক্ষ্যে অন্যত্র যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে পাঁচশ ঘোড়ার এক রক্ষীবাহিনী যেত, সে এক দারুণ দৃশ্য। ব্যাটালিয়াতে তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই চমৎকার দৃশ্যের আমি অন্যত্র বর্ণনা দোব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লেখক কয়েকটি দুঃসাহসিক ঘটনার সম্মুখীন। এক অপরাধীর প্রাণদণ্ড। নৌচালনা বিদ্যায় লেখক তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দেন।

আমি যদি আমার ক্ষুদ্র দেহের জন্যে কয়েকটি হাস্যস্পদ দুর্ঘটনায় না পড়তুম তাহলে আমি এদেশে আনন্দেই থাকতে পারতুম। কয়েকটি দুর্ঘটনার উল্লেখ করছি। গ্লামডালক্লিচ আমাকে মাঝে মাঝে আমার বাক্স-ঘর সমেত প্রাসাদের বাগানে নিয়ে যেত। কখনও সে আমাকে ঘর থেকে বার করে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াত আবার কখনও আমাকে নিচে নামিয়ে দিত! সেই বেঁটে বামনকে তখনও মহারাণী বিদেয় করে দেন নি। সেই সময় আমি একদিন বাগানে বেড়াচ্ছি, বেঁটেও বেড়াচ্ছে। বাগানে একটা বেঁটে আপেল গাছ ছিল। আমরা বেড়াতে বেড়াতে যখন সেই আপেল গাছের তলায় গেছি তখন আমার কি দুর্বুদ্ধি হল আমি সেই বেঁটে আপেল গাছের সঙ্গে তুলনা করে বেঁটে বামনের প্রতি একটা মন্তব্য করলুম। আর যায় কোথায়! আমি তখন ঠিক আপেল গাছের তলায়। বেঁটে ছুটে গিয়ে গাছটায় এমন নাড়া দিল যে দশ বারোটা আপেল ঝুপঝাপ করে পড়ল। এক একটা আপেল আমাদের ব্রিস্টল ব্যারেলের সমান, সেই একটা আপেল দমাস্ করে আমার পিঠে পড়ল আর আমিও পড়লুম মুখ থুবড়ে। তবে সৌভাগ্যক্রমে আর কোথাও আঘাত লাগে নি। এজন্যে বেঁটেকে শাস্তি দেবার কথা উঠতে আমি তাকে ক্ষমা করতে বললুম কারণ আমিই ওকে ক্ষেপিয়েছিলুম।

আর একদিন। আকাশে মেঘ করেছে, বৃষ্টি আসতে পারে। গ্লামডালক্লিচ আমাকে বাগানের ছোট একটি সবুজ মাঠে ছেড়ে দিয়ে তার গভরনেসের সঙ্গে এদিকে ওদিকে বেড়াচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হল। ওরে বাবা! সে কি শিলা! মস্ত বড়। এক একটা শিলা টেনিস বলের মতো আঘাত করে আমার গায়ে সজোরে পড়তে লাগল। আমি কোনো রকমে একটা ঝাঁকড়া লেবু গাছের তলায়

আশ্রয় নিলুম কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে আঘাত লেগেছিল তাতে আমি এমনই কাহিল হয়ে পড়েছিলুম যে বাড়ি থেকে দশ দিন বেরোতে পারি নি। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সে দেশের প্রাকৃতিক সব কিছু বিরাট। এমন কি আকাশ থেকে ভূপাতিত শিলাগুলিও। ইউরোপে যে শিলা পড়ে তার চেয়ে এখানকার এক একটা শিলা আঠারশ গুণ বড়। কৌতূহলী হয়ে আমি ওখানকার শিলা মেপে দেখেছিলুম।

ঐ বাগানেই আমার আরও একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন আমার ছোট্ট নার্স আমাকে বাগানে এনে নিরাপদ মনে করে একটা নিভৃত জায়গায় ছেড়ে দিল। এইভাবে আমাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ আমি মাঝে মাঝে করতুম যাতে আমি নিভৃতে আমার সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারি। গ্লাম সেদিন আর বাক্সটা আনে নি, মিছেমিছি বয়ে এনে কি হবে, বাগানে আমাকে বাক্স থেকে বার করে দিত হয় ত, তার চেয়ে হাতে করে নিয়ে যাওয়াই ভাল। আমাকে বাগানের সেই নিরাপদ জায়গায় ছেড়ে দিয়ে গ্লাম তার গভরনেস ও আরও কয়েকটি মহিলার সঙ্গে বাগানের অন্য এক অংশে চলে গেল। গ্লাম বেশ একটু তফাতেই তখন চলে গেছে। আমি চিৎকার করে ডাকলেও সে শুনতে পাবে না। এমন সময় একজন বড় মালির একটা স্প্যানিয়েল কুকুর কোথা থেকে এসে হঠাৎ বাগানে ঢুকে পড়েছে এবং আমার গন্ধ পেয়ে আমার কাছে সোজা চলে এসেছে। সে আমাকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে দৌড়ে তার মনিবের কাছে গিয়ে আমাকে আস্তে নামিয়ে দিয়ে লেজ নাড়তে লাগল।
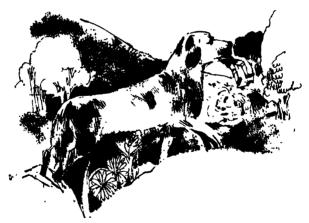
আমাকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে দৌড়।

সৌভাগ্যক্রমে কুকুরটি শিক্ষিত, সে যদিও তার দাঁত দিয়েই আমাকে তুলে নিয়েছিল তবুও আমার একটুও আঘাত লাগে নি কিংবা আমার পোশাক কোথাও ছেঁড়ে নি যদিও আমি ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিলুম। বেচারা মালি আমাকে চিনত এবং আমার প্রতি সে বন্ধু-ভাবাপন্ন ছিল। কুকুরের কাণ্ড দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল।

মহারাণীর কানে উঠলে চাকরি ত যাবেই, সাজাও পেতে হবে। সে আমাকে আস্তে আস্তে হাতে তুলে নিয়ে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করল কিন্তু আমি তখন এতই ভয় পেয়েছি যে মুখ দিয়ে কথা সরছে না। স্বাভাবিক হতে কয়েক মিনিট সময় লাগল. তখন সে আমাকে আমার নার্সের কাছে নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমার নার্সও যেখানে আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে ফিরে এসেছে এবং আমাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে ও ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে ভয় পেয়ে গেছে। মালিও সেই সময়ে সেখানে পেঁছল। আমাকে নিয়ে তখন সব শুনে মালিকে খুব বকাবকি করল সে। তবে গ্লাম সমস্ত ব্যাপারটা চেপে গেল কারণ মহারাণীর কানে উঠলে সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। আমিও চাই নি যে ব্যাপারটা আর কেউ জানুক কারণ এদের তুলনায় ছোট হলেও আমার মতো একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষকে কুকুর মুখে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেটা আমার পক্ষে লজ্জার কথা।

এই দুর্ঘটনার ফলে গ্লামডালক্লিচ আমাকে একা ত দূরের কথা বাইরে নিয়ে গেলেও আমাকে আমার ঘরের বাইরে বার করতে চাইত না বা চোখের আড়াল করত না। আমার এরকমই ভয় ছিল তাই কয়েকটা দুর্ঘটনা তাকে বলি নি। ঘটনাগুলো ঘটেছিল যখন গ্লাম আমাকে ছেড়ে দিত। একদিন আমি একা বাগানে বেড়াচ্ছি এমন সময় আকাশে উড়ন্ত একটা চিল আমাকে ঠিক নজর করেছে আর নজর করা মাত্রই আমার দিকে ছোঁ মেরেছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার ছোরা বার করেছি কিন্তু তা দিয়ে কি বিশাল চিল আটকানো যায়। ও ঠিক ওর নখ দিয়ে আমাকে তুলে নিত কিন্তু কাছেই ছিল একটা লতা গাছের মাচা। আমি তার নিচে আশ্রয় নিয়ে কোনরকমে নিজের প্রাণ রক্ষা করলুম। আর একবার। ছুঁচো মাটি খুঁড়ে গর্ত করবার সময় মাটি বার করে একটা ঢিবি তৈরি করেছে। ঢিবিটা নতুন, আমি বুঝতে পারি নি। কৌতূহল বশে তার মাথায় উঠতে গেছি কিন্তু নরম মাটির ভেতর ঢুকে গেছি। জামাকাপড় ময়লা হয়ে গেল। কারণ স্বরূপ গ্লামের কাছে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছিল। আর একবার একটা শামুকের খোলার সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে পা ভেঙেছিলুম। আমারই দোষ, দেশের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে বাগানে পায়চারি করছিলুম সেই সময়েই দুর্ঘটনা ঘটেছিল।

আমি যখন বাগানে একা একা বেড়াতুম তখন অনেক ছোট ছোট পাখি আমাকে গ্রাহ্য না করে আমার খুব কাছেই নেচে নেচে পোকামাকড় বা অন্য কোনো খাদ্য খুঁজে বেড়াত, আমার অস্তিত্বই তারা স্বীকার করত না। তা এজন্য আমি আনন্দিত হতুম না অনুতপ্ত হতুম তা বলতে পারি না। গ্লাম ব্রেকফাস্ট করতে আমাকে কেক দিয়েছিল, তারই একটা টুকরো আমার হাতে ছিল। একটা থ্রাশ পাখি সেই টুকরোটা ঠোঁটে করে তুলে নিল, আমাকে একটুও ভয় করল না। পাখিগুলো ধরবার চেষ্টা করলে তারাই আমাকে তেড়ে আসত, হাতে বা আঙুলে ঠুকরে দিত। তাই আমি আর তাদের কাছে যেতুম না, তারাও আমাকে অগ্রাহ্য করে পোকা বা শামুক খুঁজে বেড়াত। কিন্তু একদিন আমি একটা মোটা কাঠ হাতের কাছে পেয়ে সেটা একটা লিনেট পাখিকে লক্ষ্য

করে ছুঁড়ে মারলুম। ভাগ্যক্রমে কাঠটা পাখিটাকে আঘাত করল, পাখিটা পড়ে গেল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দু'হাত দিয়ে পাখিটার গলা ধরে যেন যুদ্ধে জিতেছি এইভাবে আমার নার্সের কাছে ছুটে গেলুম। আঘাত পেয়ে পাখিটা হতচেতন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে আমার গায়ে মুখে ডানার ঝাপটা দিতে লাগল। নখ দিয়ে আঁচড়াবারও চেষ্টা করতে লাগল তখন আমি ওটাকে দূরে ধরে রইলুম। কাছেই একজন ভৃত্য ছিল, সে পাখিটাকে আমার হাত থেকে নিয়ে ঘাড় মটকে মেরে ফেলল। মহারাণী আদেশ দিলেন পাখিটা রান্না করে পরদিন আমার ডিনারের সঙ্গে দিতে। আমার যতদূর মনে পড়ছে লিনেট পাখিটা আকারে ইংলন্ডের একটা রাজহাঁসের সমান হবে।

রাণীর সহচরীরা প্রায়ই গ্লামডালক্লিচকে তাদের কক্ষে যেতে বলত এবং আমাকে সঙ্গে নিয়েই যেতে বলত। আমি যেন খেলনার সামগ্রী। আমাকে হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবে। তারা প্রায়ই আমাকে কোলে করে ঘুরে বেড়াত। আমার খুব খারাপ লাগত, বিরক্তি বোধ করতুম। সত্যি কথা বলতে কি তাদের গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোত। এই সকল অভিজাত মহিলাদের এমন অপবাদ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় এবং তাদের আমি শ্রদ্ধাও করি কিন্তু আমি ওদের তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও ওরা আমার তুলনায় বিরাট। অতএব ওদের দেহের সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ আমার নাকে তীব্রভাবে আঘাত দেবেই। অথচ এই সকল মহিলাদের দেহের গন্ধ তাদের প্রিয়জনকে পীড়িত করে না, ঠিক যেমন আমাদের দেশে আমরা আমাদের তুল্য ব্যক্তিদের দেহের গন্ধ টের পাই না। তবে এই মহিলারা দেহে যখন সুগন্ধ লাগাতেন তখন বদ গন্ধ দূর হত বটে কিন্তু সেই সুগন্ধও আমার নাকে তীব্র আঘাত করত এবং আমি অজ্ঞান হয়ে যেতুম। আমার মনে পড়ছে লিলিপুটদের দেশে এক গ্রীষ্মের দিনে সবে ব্যায়াম শেষ করেছি সেই সময় আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসেছিল। সে অভিযোগ করল আমার গা থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আমার গায়ের গন্ধর জন্যে আমি দায়ী নই কিন্তু এখানে যেমন এই দৈত্যদের গন্ধ আমার নাকে লাগছে ঠিক তেমনি লিলিপুটদের নাকেও আমার গায়ের গন্ধ আঘাত করেছিল। তবে মহারাণীর বা আমার নার্স গ্লামডালক্লিচের দেহের গন্ধ আমাকে পীড়িত করে নি বরঞ্চ ইংরেজ মহিলাদের মতোই তাদের দেহ থেকে সুবাসই নির্গত হত।

আমার নার্স যখন আমাকে মহারাণীর এই সকল সহচরীর কাছে নিয়ে যেত তখন আমার খুব আসোয়াস্তি হত। বাগানের ঐ পাখিদের মতো এরা আমাকে ছোট হলেও মানুষ বলে গ্রাহ্যই করত না। ভাবত আমি বোধহয় দেওয়ালের একটা টিকটিকি বা ওদের পোষা বেড়াল। খেলনা মনে করে ওরা আমাকে তাদের সামনে সব সময় বসিয়ে রাখত। এ আমি সহ্য করতে পারতুম না, তাদের অত্যন্ত কুশ্রী মনে হত। দেহের অসমান জমি, এখানে ওখানে খানা খন্দ, এখানে একটা তিল ওখানে একটা আঁচিলের ঢিবি। কারও হাত পা ভরতি লোমের জঙ্গল। তাছাড়া তাদের পুরো দেহটাও আমি অত কাছ থেকে দেখতে পেতুম না, নাকে শুধু গন্ধটাই আঘাত

করত। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল একটি ষোড়শী তবে শান্ত নয়, হরিণের মতো চঞ্চলা। আমাকে দু আঙুলে টপ করে তুলে নিয়ে তার বুকের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মতো করে বসিয়ে দিত। এ ছাড়া আমাকে নিয়ে কত রকম খেলা করত, আমি তার বিবরণ দিলে পাতা ভরে যাবে, পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এতদূরে বিরক্ত হয়েছিলুম যে গ্লামডালক্লিচকে বললুম আমাকে যেন ঐ চঞ্চলা ষোড়শীর কাছে নিয়ে না যায়, কোনো একটা ছুতো করে যেন এড়িয়ে যায়।

আমার নার্সের গভরনেসের ভাইপো একদিন এসে একজন আসামীর প্রাণদণ্ড দেখবার জন্য ওদের দুজনকে অনুরোধ করল। সেই আসামী ঐ ভাইপোর এক ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তিকে খুন করেছে। গ্লামডালক্লিচ কোমল হৃদয়া, এসব দৃশ্য তার ভাল লাগে না, সহ্য করতে পারে না, তবুও সেই যুবক চাপাচাপি করল। আমি নিজে যদিও এসব দৃশ্য দেখতে অনিচ্ছুক তথাপি আমার কৌতুহল হল, অসাধারণ কিছু দেখার আশায়। নির্ধারিত স্থানে গিয়ে দেখলুম একটা মাচা বাঁধা হয়েছে, তার ওপরে একটা চেয়ারে আসামীকে বসানো হয়েছে। ঘাতক এসে চল্লিশ ফুট লম্বা একটা তরোয়াল দিয়ে এক কোপে তার মাথাটা কেটে ফেলল আর সংগে সংগে কাটা গলা দিয়ে ফোয়ারার মতো রক্ত বেরোতে লাগল, ভার্সাইয়ের ফোয়ারা তার কাছে হার মেনে যায়। মঞ্চ থেকে আমি এক মাইল দূরে ছিলুম কিন্তু বিরাট মাথাটা যখন মঞ্চের নিচে আওয়াজ করে পড়ল, আমি চমকে উঠেছিলুম।

মহারাণী আমার সমুদ্রযাত্রার গল্প শুনতে ভালবাসতেন কিন্তু আমি যখন একা বসে নিজের কথা ভাবতুম রাণী তখন আমার বিষন্নতা দূর করবার জন্যে আমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি নৌকা চালাতে, পাল তুলতে, বা দাঁড় টানতে পারি কিনা। তাহলে একটু দাঁড় টানতে পারলে ব্যায়াম করাও হবে, মনটাও ভাল থাকবে। আমি বললুম এসব বিদ্যা আমার জানা আছে। যদিও আমার চাকরি ছিল জাহাজের সার্জন বা ডাক্তাররূপে তবুও আমাকে অনেক সময় জাহাজে নাবিকের কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম না এখানে আমার মাপমতো নৌকা কোথায় পাওয়া যাবে? যেখানে এদের ক্ষুদ্রতম নৌকাটি আমাদের একটা বড় যুদ্ধ জাহাজের সমান আর যদিও আমার জন্যে একটা নৌকো জোগাড় হয় তাহলে সে নৌকো আমি চালাব কোথায়? এ দেশের বিশাল নদীতে সে নৌকো টিকবে না। কিন্তু রাণী দমে যাবার পাত্রী নন। তিনি বললেন আমি নৌকার নকসা করে দিলে তাঁর ছুতোর মিস্ত্রি নৌকো বানিয়ে দেবে এবং আমার নৌকো চালাবারও তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। ওঁরা আমাকে খেলনার পুতুল মনে করেছেন। খেলনার পুতুল কথা বলে না কিন্তু আমি কথা বলি তাই মেয়েদের আমাকে নিয়ে এত মাতামাতি। মিস্ত্রি এল। লোকটি বেশ কুশলী। আমার নির্দেশ অনুসারে সে দশ দিনের মধ্যে সব সাজসরঞ্জামসহ সুন্দর একটা নৌকো বানিয়ে দিল যাতে আটজন ইউরোপীয়ান বসতে পারে। নৌকো শেষ হতে রাণী এতদূরে খুশি হলেন যে তিনি নৌকোটা কোলে নিয়ে রাজাকে দেখাতে ছুটলেন। রাজাও খুশি

হয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললেন পরীক্ষা করবার জন্যে ওকে নৌকায় বসিয়ে ঐ ছোট চৌবাচ্চাটায় ভাসিয়ে দাও। কিন্তু সেই চৌবাচ্চাটা এত ছোট যে আমি দু'হাতে দু'টো দাঁড় টানবার মতো জায়গা পাচ্ছিলুম না। কিন্তু মহারাণী অন্য একটা পরিকল্পনা আগেই স্থির করে রেখেছিলেন। তিনি মিস্ত্রিকে আদেশ করলেন আমার জন্যে তিনশ ফুট লম্বা আর পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা চৌবাচ্চা বানিয়ে দিতে, দেখো কোথাও যেন ফুটো থাকে না। নৌকো শেষ হতে প্রাসাদের বাইরের দিকে একটা বড় ঘরে রাখা হল এবং জল ভর্তি করা হল। ছিদ্র ছিল শুধু একটা, জল ময়লা হয়ে গেলে সেই ছিদ্র দিয়ে জল বার করে ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেওয়া হত। দু'জন পরিচারক সহজে আধ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাঠের চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করে দিত। মহারাণী ও তাঁর সহচরী-দের এবং আমার নিজেরও মনোরঞ্জনের জন্যে আমি সেই চৌবাচ্চায় নৌকো চালাতুম। এত ক্ষুদে মানুষ এমন সুন্দরভাবে নৌকো চালাচ্ছে দেখে রাণী ও মহিলারা দারুণ কৌতুক বোধ করতেন। সময় সময় আমি পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে থাকতুম আর মহিলারা তাঁদের পাখা দিয়ে বাতাস দিতেন। মহিলারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তাদের হাত ব্যথা করতে থাকলে বালক ভৃত্যরা ফুঁ দিত। পাল ফুলে উঠে নৌকা তরতর করে চলত আমি ইচ্ছামতো নৌকো এদিক ওদিক চালাতুম। আমার নৌবিহার শেষ হয়ে গেলে গ্লামডালক্লিচ নৌকোটিকে তুলে জল ঝেড়ে সেটিকে তার ঘরে একটা পেরেক টাঙিয়ে শুকোতে দিত। এই নৌকো চালানোর ব্যাপারে একদিন এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটল যে আর একটু হলেই আমি মরে যেতুম। চৌবাচ্চায় নৌকা ভাসানো হয়েছে। গ্লামের গভরনেস আমাকে নৌকোয় বসিয়ে দেবার জন্যে যত্নসহকারে দু'আঙুলে আমাকে উঠিয়ে নিলেন আর ঠিক সেই সময়ে আমি তার আঙুল ফসকে পড়ে গেলুম। তার মানে তার আঙুল থেকে চল্লিশ ফুট নিচে। অত নিচে পড়ে গেলে আমার গতর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত কিন্তু আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে গভরনেসের কোমরের বেল্টে কয়েকটা মাথার কাঁটা গোঁজা ছিল, সেই একটা পিনে আমার শার্ট আটকে গেল, আমি শূন্যে ঝুলতে থাকলুম ও প্রাণে বেঁচে গেলুম। গ্লামডালক্লিচ কাছেই ছিল সে ছুটে এসে আমাকে উদ্ধার করল।

আর একদিন আর একটা ঘটনা ঘটল। একজন ভৃত্যের কাজ ছিল প্রতি তৃতীয় দিনে চৌবাচ্চাটি টাটকা জল দিয়ে ভর্তি করা। সেদিন সে বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল তাই তার বালতিতে যে একটা জ্যান্ত ব্যাং ছিল তা সে দেখতে পায় নি। অতএব জলের সঙ্গে ভেক মহারাজ আমার চৌবাচ্চায় আশ্রয় নিল। ব্যাংটা জলের নিচে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল কিন্তু যেই আমাকে সমেত নৌকো জলে ভাসিয়ে দিল ব্যাংও অমনি বসবার একটা জায়গা দেখতে পেয়ে নৌকোর ওপর উঠে পড়ল। ফলে নৌকো একদিকে ঝুঁকে পড়ল। নৌকো বুঝি উলটে যায়, ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে আমি নৌকোর অপর দিকে ঝুঁকে পড়লুম। যাতে না নৌকো উলটে যায়। ব্যাং তখন নৌকোর মধ্যে লাফালাফি আরম্ভ করল আর সেই সঙ্গে তার গায়ের ময়লা আমার মুখে ও জামা প্যান্টে লাগিয়ে দিতে লাগল। ব্যাং বড় বিশ্রি প্রাণী, দেখলে

ঘৃণা করে। গ্লামকে বললুম আমি একাই ওর মোকাবিলা করব। আমি একটা দাঁড় নিয়ে ওটাকে পেটাতে আরম্ভ করলুম এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাটাকে তাড়াতে পারলুম। সে নৌকো থেকে লাফ মেরে নিচে নামল।

সে রাজ্যে আমি সবচেয়ে যে বিপদে পড়েছিলুম তা হল রন্ধনশালার এক কর্মীর একটি পোষা বাঁদরের জন্যে। গ্লামডালক্লিচ আমাকে তার ঘরে বন্ধ করে রেখে কোনো কাজে গেছে বা কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে। সেদিন বেশ গরম ছিল, ঘরের জানালা খোলা ছিল। আমি ছিলুম আমার বড় বাক্সঘরে, বেশির ভাগ সময়ে সেই ঘরে থাকতুম। আমার ঘরের দরজা জানালাও খোলা ছিল। বড় বাক্স-ঘরের ছোট ঘরটা বেশি আরামদায়ক, হাত পা বেশ স্বচ্ছন্দে খেলানো যায়। টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে নানা চিন্তা করছি এমন সময় মনে হল গ্লামের ঘরের জানালায় কিছু একটা লাফিয়ে পড়ল আর সেটা জানালার এদিকে ওদিকে লাফালাফি করছে। আমি ভয় পেলেও চেয়ার থেকে না উঠে সাহস করে জানালার দিকে চেয়ে দেখলুম জানোয়ারটা এদিক ওদিক ওপর নিচে লাফালাফি করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার বাক্স-ঘরের সামনে এসে পড়ল। আমার ঘরটা তার পছন্দ হল, বুদ্ধিমান মানুষের ভঙ্গিতে সে আমার ঘরের দরজা ও জানালার ভেতর দিয়ে দেখতে লাগল। আমি আমার বাক্স-ঘরের যতদূর পারলুম ভেতর দিকে ঢুকে গেলুম কিন্তু বাঁদরটা তখন সব কটা জানালার ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরটা নজর করতে লাগল আর আমার ভয়ও তত বাড়তে লাগল। আমার উপস্থিত বুদ্ধি বলল খাটের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে এবং আমি তাও হয়ত পারতুম। কিন্তু বাঁদরটা উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে কিচিমিচি করতে করতে আমাকে ভাল করেই দেখে ফেলল। বেড়াল যেভাবে ইঁদুর ধরে বাঁদরটাও সেইরকম কায়দা করতে করতে একটা হাত আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিল। আমি যদিও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বাঁদরটাকে এড়াবার চেষ্টা করছি এবং আমার স্থান পরিবর্তন করছি কিন্তু বাঁদরও তেমনি আমার নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারই জয় হল। সে আমার কোটের একটা প্রান্ত ধরে ফেলল আর কোট তো ওদেশের সিলকের তৈরি অতএব বেশ মজবুত ও মোটা, ছিঁড়ল না। বাঁদর আমার সেই কোট ধরে আমাকে ঘর থেকে টেনে বার করল। ধাই মা যেমন ভাবে বাচ্চাকে দুধ খাওয়াবার জন্য কোলে নেয় বাঁদরটা আমাকে সেই ভাবে তার ডান দিকের উরুতে তুলে নিল। আমি ইউরোপেও দেখেছি বাঁদর তার বাচ্চাকে এইভাবে কোলে তুলে নেয়। আমি হাত পা নেড়ে নিজেকে মুক্ত করবার যত চেষ্টা করি বাঁদরটা আমাকে ততই চেপে ধরে। আমি বুঝলুম চুপচাপ থাকাই ভাল নইলে আমার হাড়গোড় ভাঙবে। সে তার অপর হাত দিয়ে আমার গায়ে মৃদুভাবে হাত বোলাচ্ছিল, সে আমাকে অপর কোনো বাঁদরের বাচ্চা ভেবে নিয়েছিল। বাঁদরটাকে কেউ গ্লামের ঘরে ঢুকতে দেখেছিল কিন্তু দরজা বন্ধ ছিল তাই তারা ঘরের দরজার সামনে এসে চেঁচামেচি করছিল বা দরজা খোলবার চেষ্টা করছিল। গোলমাল শুনে বাঁদরটা যে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল, আমাকে নিয়ে হুপ্‌ শব্দ করে লাফিয়ে সেই জানালায় উঠল তারপর জানালা থেকে

ছাদে, ছাদ থেকে লাফ মেরে পাশের বাড়ির ছাদে, আমাকে কিন্তু উত্তমরূপেই ধরে আছে। আমি শুনতে পেলুম এই দৃশ্য দেখে অর্থাৎ আমাকে বাঁদর নিয়ে যাচ্ছে দেখে সবাই চিৎকার করে উঠল। বেচারী গ্লাম ত মূর্ছা যাবার উপক্রম। প্রাসাদের এই দিক-টায় মহা সোরগোল পড়ে গেল, ভৃত্যেরা মই আনতে ছুটল, নিচে প্রাঙ্গণে কয়েক শত মানুষ জমায়েত হয়েছে। বাঁদরটা আমাকে নিয়ে একটা বাড়ির ছাদের কিনারায় বসে আছে, আমাকে এক হাতে ধরে আছে আর অপর হাত দিয়ে আমাকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করছে। আমি খাব না কিন্তু সে একটা থলি থেকে কি সব খাদ্যবস্তু বার করে আমার মুখে গুঁজে দিচ্ছে। নিচে যারা জমায়েত হয়েছে তারা বাঁদরের রকম-সকম দেখে কৌতুক অনুভব করছে, হাসছে। তাদের দোষ দিতে পারি না, দৃশ্যটা উপভোগ করবার মতো যদিও ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেছে, বুক ঢিব ঢিব করছে। নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে হচ্ছে। বাঁদরটাকে তাড়াবার জন্যে কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিষেধ করা হল কারণ সেই ঢিলের আঘাত আমাকে জখম করতে পারে।

এদিকে ছাদের চারদিকে মই লাগিয়ে মানুষ উঠে পড়েছে। বাঁদর দেখল তাকে এখনি ঘেরাও হতে হবে তখন সে আমাকে ছাদের একটা টালির ওপর আস্তে আস্তে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। মাটি থেকে পাঁচশত গজ ওপরে বসে আমি তখন ভয়ে

বাঁদরটা আমাকে একটা টালির ওপর নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল।

কাঁপছি। এখন অন্য ভয়, হাওয়ায় না আমাকে উড়িয়ে নিচে ফেলে দেয়। হাওয়া না ফেললেও আমি যেভাবে কাঁপছি বা নিচের দিকে চেয়ে আমার মাথা ঘুরছে তার ফলে নিচে পড়ে না যাই। মনের এই সংকটজনক অবস্থায় সব শক্তিও নিঃশেষ, নড়বার ক্ষমতাটুকুও নেই। শেষ পর্যন্ত আমার নার্সের একটি ছোকরা পরিচারক আমার কাছে এসে আমাকে তার প্যান্টের পকেটে তুলে নিল এবং নিরাপদে নামিয়ে আনল।

এদিকে আর এক নিপদ। বাঁদর আমার মুখে যেসব খাদ্যবস্তু গুঁজে দিয়েছিল আমি গিলতে পারি নি, গলায় আটকে আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম। গ্লাম আমার অবস্থা বুঝতে পেরে একটা ছুঁচের মাথা দিয়ে কতকগুলো খাদ্যবস্তু বার করতে আমি বমি করে ফেললুম। এবার আমি স্বস্তি বোধ করলুম। কিন্তু সেই জঘন্য জীবের আদরের ঠেলায় আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিলুম, পাঁজর ও শরীরের অন্য স্থানে বেদনা বোধ করছিলুম। আমি শুয়ে পড়লুম, পনেরো দিন লাগল বিছানা ছাড়তে সুস্থ হতে। মহারাজা, মহারাণী ও রাজদরবারে সভাসদরা আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রায়ই খোঁজখবর নিতেন। এই সময়ে মহারাণী নিজেও কয়েকবার আমার শয্যাপার্শ্বে এসেছিলেন। বাঁদরটাকে মেরে ফেলা হল এবং এই রকম কোনো জানোয়ার রাজপ্রাসাদে আনা বা রাখা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সুস্থ হয়ে উঠে আমি মহারাজাকে তাঁর দয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে গেলুম। তিনি আমাকে সুস্থ দেখে আনন্দিত হলেন এবং ভাগ্যক্রমে আমি যে বিপদ থেকে মুক্ত হতে পেরেছি সেজন্যে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাঁদরটা যখন আমাকে ধরে নিয়ে গেল তখন আমার মনোভাব কি রকম হয়েছিল, বাঁদরটা আমাকে যা খেতে দিয়েছিল সেটা কি রকম, ছাদের ওপর তাজা হাওয়া কি আমার ক্ষিধে বাড়িয়েছিল? এমন সব মজার মজার প্রশ্ন করতে লাগলেন। আরপর জিজ্ঞাসা করলেন আমার নিজের দেশে বাঁদর আমাকে আক্রমণ অরলে আমি কি করতুম? আমি বললুম ইউরোপে বাঁদর নেই, কেউ হয়ত কৌতূহল বশে এনে পোষে, খাঁচায় বন্ধ করে রাখে আর যদিও বা আমাকে আক্রমণ করত, তারা এত ছোট যে দশ বারোটা বাঁদরের সঙ্গে আমি একাই মোকাবিলা করতে পারতুম। আর এখানকার বিশাল বাঁদরটা যেটা একটা হাতির সমান, যখন আমাকে ধরবার জন্যে আমার ঘরের ভেতর তার হাতটা ঢুকিয়েছিল তখন আমি ভয়ে আমার ছোরার কথা ভুলে গিয়েছিলুম। নইলে ছোরা দিয়ে তার হাতে বার বার খোঁচা দিলে সে হয়ত যত তাড়াতাড়ি হাত ঢুকিয়েছিল তত তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিত। এই কথাগুলো আমি বেশ জোর দিয়েই বলেছিলুম ভাবটা এমন যেন আমি কারও পরোয়া করি না। কিন্তু আমার সাহসিকতাপূর্ণ এই বক্তৃতা মহারাজা বা তাঁর আমাত্যদের ওপরে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল না উপরন্তু সকলেই বেশ জোরে হেসে উঠল। আমাত্যগণও এভাবে হেসে ওঠায় আমি ব্যথিত হলুম। মহারাজার সামনে এভাবে হাসা অন্যায়, তাঁকে অসম্মান করা হয়। ইংলন্ডে এমন ঘটনা হয় না এমন কি আমার চেয়ে নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা আমার সামনে এভাবে হাসতে সাহস করবে না। ওরা নিশ্চয় ভেবেছিল ক্ষুদে মানুষটা বাঁদরের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে খুব বড় বড় কথা বলছে ত! আমিও বোধহয় তাই মনে মনে জ্বালা বোধ করছিলুম।

আমি মহারাজা ও মহারাণীকে প্রতিদিন কিছু অসম্ভব গল্প শোনাতুম, গ্লাম বোধহয় আমার দুষ্টুমি বুঝতে পারত কিন্তু সে ত আমাকে খুব ভালবাসত তাই রাণী যদি আমার সেই সব অসম্ভব গল্প শুনে কিছু মনে করেন তাই সে রাণীকে বলে রেখেছিল যে তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যে ও কিছু মজা করবার জন্যেই আমি এই

সব গল্প বলি। বেচারী গ্লামের শরীর কিছু খারাপ হয়ে পড়েছিল তাই হাওয়া বদলাবার জন্যে তাকে তার গভরনেসের সঙ্গে শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে যা অতিক্রম করতে এক ঘণ্টা সময় লাগে, তেমন একটা জায়গায় পাঠানো হল। একটা মাঠে চলনপথে গাড়ি থামিয়ে ওরা নামল। গ্লামডালক্লিচ আমার বাক্স-ঘর নীচে নামিয়ে দিল। আমি বাক্স থেকে বেরিয়ে এলুম, একটু চলে ফিরে হাত পা ছাড়িয়ে নিতে চাই আর কি! পথে এক জায়গায় গোবর ছিল। ভাবলুম এটা লাফ মেরে ডিঙিয়ে যাওয়া যাক। লাফ মারবার জন্যে আমি দৌড় লাগালুম এবং জায়গা বুঝে লাফ দিলুম কিন্তু হায়! বিচারে ভুল করেছিলুম, লাফ ছোট হয়ে গিয়েছিল ফলে পড়লুম গোবরের মাঝখানে, আমার হাঁটু ডুবে গেল। কোনরকমে গোবর থেকে বেরিয়ে এলুম, দুপায়ে গোবর লেগে গিয়েছিল, একজন সহিস তার রুমাল দিয়ে আমার দুই পা মুছিয়ে দিল। যতটা পারল সে পরিষ্কার করে দিল কিন্তু গ্লাম আমাকে আমার বাক্স ঘরের মধ্যে বন্ধ করে দিল এবং প্রাসাদে না ফেরা পর্যন্ত আর বার করল না। প্রাসাদে ফিরে গ্লাম আমার দুর্দশার কাহিনী রাণীকে বলতে ভুলল না এবং সেই সহিসও রং চড়িয়ে আমার লাফ মারার গল্পটি বলল। অতএব আমাকে নিয়ে সর্বত্র কয়েক দিন ধরে বেশ হাসাহাসি চলল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহারাজা ও মহারাণীকে খুশি করবার জন্যে লেখকের কয়েকটি কৌশল। তিনি সঙ্গীতে তাঁর পটুতা দেখালেন। মহারাজা ইউরোপের বিষয় জানতে চাইলেন এবং লেখকও তাঁর বিবরণ পেশ করলেন। মহারাজার মন্তব্য।

আমি মহারাজার কাছে সপ্তাহে একবার বা দু'বার যেতুম এবং সেই সময়ে প্রায়ই দেখতুম তিনি দাড়ি কামাচ্ছেন। প্রথম প্রথম দেখেই আমার ভয় করত কারণ ক্ষুরটা ছিল বিরাট, আমাদের সবচেয়ে বড় তলোয়ার অপেক্ষা অনেক চওড়া ও লম্বা। দেশের রীতি অনুসারে মহারাজা সপ্তাহে দু'দিন কামাতেন। একদিন পরামাণিককে বললুম কামার পর ক্ষুরের গায়ে লেগে থাকা খানিকটা সাবান আমাকে দিতে। আমি সেই সাবান থেকে চল্লিশ পঞ্চাশটা মোটা ও শক্ত দাড়ি বেছে নিলুম। তারপর এক টুকরো কাঠ নিয়ে সেটা চেঁছে ছুলে চিরুনির মাথার মতো করে গ্লামের কাছ থেকে একটা ছুঁচ চেয়ে নিয়ে সেই কাঠে কয়েকটা ছিদ্র করলুম। দাড়িগুলো এবার ছুরির সাহায্যে কেটে তার ভেতর ঢুকিয়ে কাজচলা গোছের একটা চিরুনি বানালুম। আমার নিজের চিরুনিটা অনেক পুরনো ও ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর চুলে ধরছিল না। এদেশে এমন কারিগর থাকা সম্ভব নয় যে আমার জন্যে ছোট্ট একটা চিরুনি বানিয়ে দিতে পারবে।

এই চিরুনি তৈরি করা থেকে আমার মাথায় একটা মতলব এল যার দ্বারা আমি আমার অলস সময়গুলো কাজে লাগাতে পেরেছিলুম। যে রমণী মহারাণীর চুল আঁচড়ে দিত তাকে আমি বললুম চুল আঁচড়াবার সময় যেসব চুল মহারাণীর মাথা থেকে উঠে আসে সেগুলি আমাকে দিতে। এইভাবে আমি বেশ কিছু চুল জমালুম ও সেগুলি পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখলুম। এরপর আমি সেই ছুতোর মিস্ত্রীকে বললুম আমার মাপমতো চেয়ার বানিয়ে দিতে কিন্তু তার বসবার ও পিঠ

ঠেস দেবার জায়গা খালি রাখতে। দরকার মতো আমার জন্যে কিছু বানিয়ে দেবার আদেশ সেই ছুতোরকে দেওয়া ছিল। চেয়ারের ফ্রেম বানাবার পর আমি তাকে চেয়ারে জায়গামতো ছিদ্র করে দিতে বললুম। আমি তখন সেই ছিদ্রে মহারাণীর মাথার চুল ঢুকিয়ে বসবার আসন ও পিঠ ঠেস দেবার জায়গা ভরাট করে ফেললুম। ঠিক যেভাবে ইংলণ্ডে বেতের চেয়ার তৈরি করা হয় আর কি। এইভাবে কয়েকটা চেয়ার তৈরি হতে আমি সেগুলো মহারাণীকে উপহার দিলুম। তিনি খুশি হয়ে চেয়ারগুলো তাঁর আলমারিতে রেখে দিলেন। কেউ এলে রাণী চেয়ারগুলি তাদের দেখাতেন, বলতেন দেখ ত কেমন ক্ষুদে অথচ চমৎকার জিনিস। সকলে তারিফ করত। একদিন মহারাণী আমাকে বললেন ঐ চেয়ারে বসতে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হলুম না, বললুম ঐ চেয়ারে বসা অপেক্ষা আমার হাজার বার মৃত্যু ভাল, যে চুল মহারাণীর মাথার শোভা বৃদ্ধি করত সেই চুলে আমি আমার দেহের পশ্চাদ্দেশ রাখতে পারব না। কারিকুরি কাজে আমার দক্ষতা আছে। আমি মহারাণীর মাথার চুল দিয়ে পাঁচ ফুট লম্বা সুন্দর একটা পার্স বুনে তার ওপর সোনালী সুতো দিয়ে মহারাণীর নাম লিখে তাঁকে উপহার দিলুম। তিনি খুব তারিফ করলেন কিন্তু সেটি গ্লামডালক্লিচকে দিতে বললেন। আমি তাই সেটি গ্লামকেই দিলুম। সত্যি কথা বলতে কি পার্সটি ব্যবহার করা যায় না, বরঞ্চ একটি কৌতুহলের বস্তু, ওদেশের ভারি ও বড় মুদ্রা ওতে রাখা চলে না। গ্লাম ওর মধ্যে মেয়েদের প্রিয় দু'চারটে ছোট খেলনা রেখেছিল।

মহারাজা সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন এবং তিনি প্রায়ই ঐকতানের ব্যবস্থা করতেন। সেই সময়ে আমাকেও আমার বাক্স সমেত নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর বসিয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রগুলির এত প্রচণ্ড জোরে আওয়াজ হত যে বাজনা ও সুরের পার্থক্য আমি ধরতেই পারতুম না, কানে তালা ধরে যেত। ইংলণ্ডে পুরো একটি রাজকীয় বাহিনীর সমস্ত ড্রাম ট্রামপেট একসঙ্গে উচ্চগ্রামে বাজালেও এই প্রচণ্ড আওয়াজের কাছে পৌঁছতে পারবে না। অতএব প্রাসাদে যখন ঐক্যতান বাজান হ'ত আমি সেখানে উপস্থিত থাকতুম না। যতটা সম্ভব দূরে আমার বাক্স রাখতে বলতুম। তারপর আমি আমার ঘরের সব দরজা জানালা বন্ধ করে পর্দা নামিয়ে দিতুম তবেই আমি সেই সমবেত সঙ্গীত উপভোগ করতে পারতুম, তখন মন্দ লাগত না।

আমি যখন যুবক ছিলুম তখন স্পিনেট নামে তারের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শিখেছিলুম। এরা এই যন্ত্রকে কি বলে জানি না, আমি ওটাকে স্পিনেটই বলতুম কারণ বাজাবার পদ্ধতিটা একই রকম ছিল। আমি দেখতুম একজন শিক্ষক সপ্তাহে দু'দিন এসে গ্লামকে ঐ বাজনাটি বাজাতে শেখাত। আমার ইচ্ছে হল আমি ঐ যন্ত্রে কিছু ইংরেজি সুর মহারাজাকে শোনাই। কিন্তু গ্লামের যন্ত্রটা বাজানো আমার পক্ষে অসম্ভব। গ্লামের স্পিনেট ষাট ফুট লম্বা, চাবিগুলো এক ফুট তফাতে, আমি দুদিকে দু'হাত প্রসারিত করলে পাঁচটার বেশি চাবি আয়ত্তে আনতে পারব না, তাছাড়া চাবিগুলো টিপতে হলে আমাকে ঘুসি মারতে হবে। তার মানে প্রচণ্ড পরিশ্রম অথচ অভীষ্ট ফল

পাওয়া যাবে না। তখন আমি এক কাজ করলুম। দুটো বেটন মানে ছোট লাঠি নিলুম, লাঠির মাথায় বেশ মজবুত করে দুটো কাঠের বল ঢুকিয়ে দিলুম। বল দুটো ইঁদুরের চামড়া দিয়ে বেশ করে মুড়ে দিলুম অর্থাৎ এমন দুটো হাতুড়ি তৈরি করলুম যা দিয়ে স্পিনেটের চাবিতে আঘাত করা যায় অথচ চাবিগুলোর কোনো ক্ষতি হবে না। তারপর চারফুট লম্বা একটা বেঞ্চি তৈরি করিয়ে সেটা স্পিনেটের চাবিগুলোর নিচে রাখা হল। আমি সেই বেঞ্চিতে উঠে এদিক থেকে ওদিকে ছোটাছুটি করে চাবির ওপর হাতুড়ির আঘাত করে যন্ত্রটিতে নাচের সুর তুলে মহারাজার মুখে হাসি
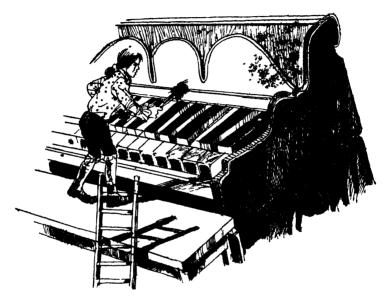
চামড়া দিযে বেশ করে মুড়ে দুটো হাতুড়ি তৈরী কবলুম।

ফোটালুম। মহারাজা ও মহারাণী উভয়েই আমার সংগীত উপভোগ করলেন কিন্তু আমার প্রচণ্ড পরিশ্রম হল এবং ষোলোটার বেশি চাবিতে আঘাত করতে পারলুম না এবং অন্য শিল্পীদের মতো সব চাবি টিপে ব্যাস বা ট্রেবল সুর ঠিক মতো বার করতে পারি নি। তবুও একটা ক্ষুদে মানুষ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চমৎকার বাজনা বাজাতে পেরেছিল এতে মহারাজা মহারাণী ও সমবেত নরনারী আনন্দিত।

মহারাজা কিন্তু রাজার মতো রাজা ছিলেন, সহানুভূতিশীল ও সমঝদার। তিনি গুণের আদর করতেন। তিনি প্রায়ই আমাকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে পাঠাতেন এবং বাক্স সমেত আমাকে তাঁর একটি টেবিলের ওপর রাখা হত। তারপর তিনি আমাকে একটা চেয়ার নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলতেন। আমি তাঁর টেবিলের ওপর তিন গজ দূরে বসতুম যাতে তাঁর ঠিক মুখোমুখি বসতে পারি। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর বসে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি অনেক বিষয়ে আলোচনা হ'ত। একদিন

আমি সাহস করে মহারাজাকে বললুম, আপনি ইউরোপ ও বাকি জগৎটার ওপর বৃথা ঘৃণা পোষণ করেন, আপনি একজন মহানুভব ব্যক্তি, অতএব অন্য দেশের প্রতি বিরূপ ভাব কেন পোষণ করেন এটা ঠিক বোঝা যায় না। মানুষের আকার অনুসারে তার যুক্তিও যে গ্রাহ্য হবে এমন কথা ঠিক নয়। বরঞ্চ আমাদের দেশে আমরা মনে করি মানুষ যত লম্বা হয় তার বিচারশক্তিও সেই অনুপাতে কমতে থাকে। ক্ষুদ্র প্রাণীদের মধ্যে দেখুন মৌমাছি ও পিপীলিকা কি পরিমাণে পরিশ্রমী। মৌচাক তার বাসা তৈরি করতে যে কুশলতার পরিচয় দেয় তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। মহারাজা আপনি হয়ত আমাকে অবুঝ বা দুর্বল ভাবছেন তবুও আমি হয়ত আপনার কোনো উপকারে আসতে পারি। মহারাজা আমার কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন এবং আমার প্রতি তার ধারণার উন্নতি হতে লাগল। ইংরেজরা কি করে তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে সে বিষয়ে তিনি জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যদিও সব রাজা নিজের শাসনব্যবস্থা উত্তম মনে করে থাকে তথাপি ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় কিছু অনুকরণযোগ্য থাকলে তা তিনি গ্রহণ করবেন।

সুজন পাঠক একবার কল্পনা করুন আমি তখন আকাংখা করছিলুম আমার যদি ডিমস্থেনিস বা সিসেরো-এর মতো বাকশক্তি থাকত তাহলে মহারাজার প্রশংসা শুনে আমি যে গৌরব বোধ করেছিলুম তা আমার স্বদেশের গুণ প্রকাশ করতে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারতুম।

আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আমার দেশ সম্বন্ধে মহারাজাকে বলতে আরম্ভ করলুম। আমি বললুম আমাদের সাম্রাজ্য দু'টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। কিন্তু একই রাজার অধীন তিনটি দেশে সাম্রাজ্য বিস্তৃত। এ ছাড়া অ্যামেরিকায় আমাদের উপনিবেশ আছে। জমির উর্বরতা ও দেশের আবহাওয়া সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বললুম। তারপর বললুম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংগঠন যার একটি বিশিষ্ট অংশ হল হাউস অফ পিয়ারস, ইংলন্ডের প্রাচীন ও অভিজাত পরিবারের সন্তানদের জন্যে এই হাউস সংরক্ষিত। এই হাউসে যারা প্রবেশের অধিকার লাভ করেন তাঁদের সর্বতোভাবে শিক্ষিত করার জন্যে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তাদের চারুকলা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে হয়, রণকৌশল ও রাজনীতিতে পারঙ্গম হতে হয় যাতে তারা দেশ শাসনের উপযুক্ত হয়ে রাজাকে সুপরামর্শ দিতে পারে। শুধু তাই নয় আমাদের বিচার ব্যবস্থাও অতি উচ্চস্তরের, বিচারকদের সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ হতে হয়, তাদের পাণ্ডিত্য ও বিধানাবলীতে এমন জ্ঞান থাকা চাই যা হবে তর্কাতীত। পার্লামেন্টের সভ্য ও অমাত্যগণ এমন হবেন যাঁরা সর্বদা দেশের স্বার্থের প্রতি তীক্ষ্ন নজর রাখবেন ও তাঁরা নিজেরা সাহস শৌর্যে কারও অপেক্ষা হীন হবেন না। এইসব গুণাবলী বংশ পরম্পরায় চলে আসছে তাই আমাদের দেশ ন্যায় এ সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে ফলে এই সকল সদ্-গুণের জন্যে তাঁরা উপযুক্ত পুরস্কারও পেয়ে থাকেন। ধর্মকেও আমরা উপেক্ষা করি না। জনসাধারণ যাতে ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত না হয় সেজন্যে বিশেষ এক সম্প্রদায় আছে যাদের আমরা বিশপ বলি। এই কাজের জন্যে বিশিষ্ট

ব্যক্তিরা উপযুক্ত লোককেই বেছে নেন, এমন লোক যারা পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন কারণ তারা হবেন আদর্শ মানুষ, জনসাধারণ যাঁদের ধর্মপিতা বলে মেনে নেবেন।

পার্লামেন্টের আর একটি অংশ বা বিধানসভা আছে যাকে আমরা বলি হাউস অফ কমনস। দেশপ্রেম, সততা, যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য ও সদগুণ বিচার করে হাউস অফ কমনসের সভ্যদের নির্বাচন করেন। আর এই হাউস মিলিত হওয়ার ফলে এবং প্রধান হিসেবে মাথায় সম্রাটকে রেখে যে শাসন ব্যবস্থা ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে তা হল ইউরোপের সেরা।

এরপর আমি আমার দেশের বিচার ব্যবস্থার কথা তুললুম। আমি বললুম আমাদের বিচারপতিরা প্রবীণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, আইনের ব্যাখ্যা করতে সিদ্ধহস্ত, সম্পত্তি বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বিরোধের তারা সুচারুরূপে নিষ্পত্তি বা মীমাংসা করে দেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করতে তাঁরা সদা সচেতন। তারপর আমি বললুম সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর আমাদের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে অর্থ বন্টন করা হয়। শুধু বিচার ব্যবস্থা বা অর্থনীতি নয় আমাদের স্থল ও নৌসেনা তাদের সাহস ও শৌর্যের জন্য সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। আমাদের জনসংখ্যা প্রচুর, বিভিন্ন রাজনীতিক মতাবলম্বী বা কয়েক প্রকার ধর্মমতালম্বী সম্প্রদায় থাকলেও তাদের স্বার্থ রক্ষা করে উদ্ভূত সমস্যারও সমাধান করা হয়। তারপর খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের নানা ব্যবস্থা আছে, অন্য দেশের তুলনায় আমরা সেখানেও পিছিয়ে নেই। আমরা সকলেই স্বদেশপ্রেমী, আমাদের কাছে দেশের সম্মান সর্বাগ্রে। মহারাজাকে এসব ব্যাখ্যা করে ইংলণ্ডের গত একশত বৎসরের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করলুম।

এইসব আলোচনা চলেছিল অন্ততঃ পাঁচদিন একটানা এবং আলোচনা চলত কয়েক ঘণ্টা ধরে। রাজা মনোযোগ দিয়ে ও ধৈর্যসহকারে শুনতেন। তিনি মাঝে মাঝে কিছু নোট করতেন এবং পরে আমাকে কি প্রশ্ন করবেন তাও লিখে রাখতেন।

এইসব দীর্ঘ আলোচনার বুঝি শেষ নেই। মহারাজা আরও একদিন আমাকে নিয়ে বসলেন। তিনি নানা বিষয়ে যেসব নোট রেখেছিলেন তার মধ্যে কিছু অস্পষ্ট বিষয় ছিল, কিছু ব্যাখ্যা করার অবকাশ ছিল, কিছু তথ্য জানার ছিল, আপত্তিও কিছু ছিল। এইগুলি তিনি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে পরিষ্কার করে নিতে চাইলেন। যেমন একটা প্রশ্ন করলেন যে অভিজাত পরিবারের যুবকদের দেহমনের বিকাশের জন্যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাদের শিক্ষা দেবার প্রাথমিক পর্যায়ে কি ও কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। যদি কোনো অভিজাত পরিবার নির্বংশ হয়ে যায় তাহলে বিধান পরিষদে তাদের স্থান কিভাবে পূরণ করা হয়। যাদের লর্ড উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাদের কি বিশেষ কোনো গুণাবলী থাকা প্রয়োজন? কখনও কোনো রাজা বা রাজবংশের কোনো ব্যক্তির মন জয় করবার জন্যে কিংবা বিশেষ কোনো

উদ্দেশ্যে কোনো মহিলাকে বা কোনো প্রধান মন্ত্রীকে বা বিরুদ্ধ দলের নেতাকে কিংবা নিজের দলের সংগঠন মজবুত করতে অর্থ বব্যহার করা হয়েছে কি না অর্থাৎ মহারাজা জানতে চাইলেন আমাদের দেশে ঘুষ প্রথা চালু আছে কি না। তারপর তিনি জানতে চাইলেন এই সকল লর্ড বংশের সন্তান বা স্বয়ং লর্ডগণ দেশের আইন সম্বন্ধে বা সম্পত্তি ও সম্পদের বিলি ব্যবস্থায় কতটা অভিজ্ঞ বা সচেতন। তারা নীচ প্রবৃত্তি, হিংসা, অভয়ে ঘুষ ইত্যাদি দ্বারা কতটা প্রভাবিত। লর্ড বংশের ব্যক্তি ও সন্তানদের সম্বন্ধে তিনি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। এত বিষয়ে প্রশ্ন করলেন এবং এমন খুঁটিয়ে আলোচনা করলেন যে শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করার আর কিছু বাকি থাকল না। আমিও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করলুম।

এরপর তিনি সাধারণ বিধায়কদের বিষয়ে প্রশ্ন শুরু করলেন। অর্থাৎ হাউস অফ কমনস-এ যারা নির্বাচিত হয় তাদের বিষয়ে। তাদের নির্বাচিত হওয়ার জন্যে কি যোগ্যতা থাকা দরকার বা কোনো বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয় কি না। কোনো নীতিবিহীন অথচ অর্থশালী প্রার্থী প্রচুর অর্থ ছড়িয়ে ভোটদাতাদের প্রভাবিত করতে পারে কি না এবং এর দ্বারা ভোটদাতাদের জমিদার বা যোগ্য ব্যক্তি প্রার্থী হলেও তাকে পরাজিত করতে পারে কি না। মহারাজা আরও জানতে চাইলেন সংগতিপন্ন না হয়েও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে (যেজন্যে একটা পরিবার হয়ত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে) অথবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে মানুষ বিধান পরিষদে নির্বাচিত হতে এত ব্যগ্র কেন? কি উদ্দেশ্য? অথচ নির্বাচিত হলে তাদের কোনো বেতন বা পেনসন দেওয়া হয় না। মহারাজা মন্তব্য করলেন এই সকল ব্যক্তি নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রতি সুবিচার করতে পারে না বলে তাঁর বিশ্বাস। আমি অবশ্য বলেছিলুম সম্মান, মর্যাদা এবং দেশসবায় অনুপ্রাণিত হয়ে তারা হাউস অফ কমনস-এ নির্বাচিত হয়। তথাপি মহারাজা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তিনি বললেন এসব ব্যক্তি সাধারণতঃ নীতিহীন হয়, তারা কোনো নীতিহীন মন্ত্রীর সহযোগিতায় কুকার্য করতে পারে। এছাড়া তিনি আমাকে আমার দেশ ও রীতিনীতি ও প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, তার মধ্যে কিছু আপত্তিজনক প্রশ্নও ছিল। যাই হক সে সকল প্রশ্ন অবান্তর বলে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলুম না।

এবার মহারাজা আমাদের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে পড়লেন। কতকগুলি বিষয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে চাইলেন। আদালতের বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কারণ আমি একটি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলুম অতএব আমি মহারাজার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পেরেছিলুম। একটা মামলা চলতে কতদিন লাগে, কি রকম ব্যয় হয়। সুবিচার সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায় কিনা ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমি তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলুম। কিন্তু তাঁর প্রশ্নের বুঝি শেষ নেই। কোনো মামলা যদি মিথ্যা অর্থাৎ সাজানো হয় সে ক্ষেত্রে আইনজীবিদের ভূমিকা কি? রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি কি ভাবে হয়? এই ধরনের মামলায় যেসব আইনজীবি পক্ষ সমর্থন করেন তাঁদের

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কি না? বিচারকদের এক্ষেত্রে ভূমিকা কি? যদিও ধরে নেওয়া যায় তারা যথেষ্ট জ্ঞানী তথাপি তাঁরা কি প্রভাবিত হন? একই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে তাঁরা কি কখনও স্বতন্ত্র রায় দিয়েছেন? বিচারকরা কি স্বচ্ছল ব্যক্তি? নাকি অভাবী। তাঁরা তাঁদের সুচিন্তিত রায়দানের জন্যে অথবা অন্য কোনো কারণে পুরস্কৃত হন? কর্মত্যাগ করে অথবা অবসর গ্রহণ করে তাঁরা কি কখনও হাউস অফ কমনস-এর সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন?

ইংলন্ডের অর্থভান্ডার সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করলেন এবং এক সময়ে মন্তব্য করলেন আমার স্মরণশক্তি বেশ দুর্বল কারণ পূর্বে আমি বলেছিলুম যে রাজস্ব বাবদ আমাদের আদায় হয় বছরে পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ আর এখন আমি যে সংখ্যা বলছি তা নাকি আগে যা বলেছি তার দ্বিগুণ কারণ তিনি নোট রেখেছেন। তিনি বলতে চান আমি তাকে যেসব তথ্য সরবরাহ করেছি তা সঠিক হওয়া দরকার কারণ এই সকল তথ্য তাঁর কাজে লাগতে পারে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে আমি তাঁকে যে হিসেব দিয়েছি তাতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি দেখা গেছে। এটা কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ে চলতে পারে কিন্তু একটা রাষ্ট্রের পক্ষে হলে রাষ্ট্র কার কাছে ঋণ নিচ্ছে? এবং ঋণ পরিশোধের অর্থ কোথা থেকে আসছে? আমরা এত যুদ্ধ করি কেন? তাহলে আমরা ভীষণ ঝগড়াটে? নাকি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি মোটে ভাল মানুষ নয়? এবং সেনাপতিরা রাজা অপেক্ষা ধনী হয় কি করে? আমরা প্রধানতঃ কি ব্যবসা করি? ব্যবসা থেকে আয় কেমন হয়? দেশের সঙ্গে ব্যবসাগত ও রাজনীতিগত কি বা কি ধরণের চুক্তি বিদ্যমান। দেশ ঘিরে একটা নৌবহর কি কাজ করে? শান্তির সময় বিপুল ব্যয়ে আমরা একটা বিরাট সেনাবাহিনী রাখি শুনে মহারাজা বিস্মিত। স্বাধীন দেশের পক্ষে এমন একটা সেনাবাহিনী রাখবার দরকারটা কি? মহারাজা বললেন আমরা যদি আমাদের প্রতিনিধি মারফত নিজেরাই দেশ শাসন করি তাহলে তিনি ভাবতেই পারছেন না তাহলে আমরা কাদের ভয় করি এবং আমরা কার বিরুদ্ধেই বা যুদ্ধ করবো? একজন সাধারণ ব্যক্তি কি নিজে তার সন্তানদের সাহায্যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে পারে না? তাহলে যৎসামান্য বেতন দিয়ে কতকগুলো পাজি লোককে সৈন্য করবার দরকার কি? ওরা ত যে কোনো পরিবারে ঢুকে সকলের গলা কেটে শতগুণ বেশি রোজগার করতে পারে।

আমাদের দেশে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় বা রাজনীতিক দলে কতজন মানুষ আছে তার ওপর ভিত্তি করে দেশের জনসংখ্যা নির্ধারণ করাটা তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমাকে বললেন তুমি অংকে কাঁচা, ওভাবে মানুষ গণনা করা যায় না। তিনি বললেন তোমাদের দেশে কোনো কোনো দল জনসাধারণকে সমর্থন করে না এমন মতবাদে বিশ্বাসী। সে ক্ষেত্রে আমি বলি কি এরকম ঠিক নয়, তাদের উচিত তাদের মতবাদ জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া অথবা জানাতে বাধ্য করা। এ চলতে দেওয়া উচিত নয়, একজন লোক নিজের ঘরে বিষ লুকিয়ে রাখবে তা ঠিক নয়।

মহারাজা বললেন তোমাদের দেশে অভিজাত পরিবারের লোকেরা জুয়ো খেলে চিত্ত বিনোদনের জন্যে। তারা কত বছর বয়স থেকে এই খেলা আরম্ভ করে, আর ছেড়ে দেয় কত বয়সে? এই খেলাটা কি মাত্রা ছাড়িয়ে পারিবারিক অর্থভাণ্ডারে তারতম্য ঘটায় না? চতুর ব্যক্তিরা কি ধনীদের ঠকিয়ে প্রচুর সম্পদ লাভ করে ধনীদের তাদের কাছে ঋণগ্রস্ত করে তোলে না?

আমি আমাদের দেশের ইতিহাসের যে সব তথ্য তাঁর কাছে পেশ করেছিলুম তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমাকে যা বলেছ তা ত শুধু ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, বিদ্রোহ, খুন, পাইকারি হারে হত্যা, বিপ্লব, নির্বাসন বা লোভ, দলাদলি, ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, বাতুলতা, ঘৃণা, হিংসা, কাম, অপকার করবার প্রবৃত্তি এবং উচ্চাশার নামান্তর।

আর একদিন মহারাজ আমি যা বলেছি এবং তিনি যে সমস্ত প্রশ্ন করেছেন তার আমি যেভাবে উত্তর দিয়েছি তিনি সেসব পর্যালোচনা করে আমাকে হাতে তুলে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে যা বললেন তা আমি কোনোদিন ভুলব না। তিনি আমাকে বললেন আমার ছোট্ট বন্ধু গ্রিলড্রিগ তুমি

আমার ছোট্ট বন্ধু গ্রিলড্রিগ

তোমার স্বদেশের প্রশংসনীয়ভাবে গুণকীর্তন করেছ কিন্তু তোমার বিবৃতি শুনে মনে হয়েছে যে অজ্ঞতা, আলস্য, চরিত্রহীনতা ও আনুষঙ্গিক নির্গুণ না থাকলে তোমাদের দেশে বিধায়ক হওয়া যায় না। চতুর ব্যক্তিরা আইনের অপব্যাখ্যা করে সৎ ব্যক্তিকে ঠকায়। তুমি তোমাদের দেশের প্রচলিত আইন ও বিধান সম্বন্ধে কিছু ভাল কথা বলেছ কিন্তু সেগুলি এমন ভাষায় লেখা যে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় যার ফলে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটবার যথেষ্ট

অবকাশ রয়েছে। তোমাদের দেশে ধার্মিক ব্যক্তিরা সৎপথে থেকে আদর্শ জীবন যাপন করার জন্যে, পণ্ডিতেরা তাঁদের জ্ঞান ও বিদ্যার জন্যে, সৈনিকেরা সাহস ও শৌর্যের জন্যে, বিচারকরা তাঁদের নিষ্ঠার জন্যে, বিধায়করা দেশপ্রেম ও তাঁদের সৎকাজের জন্যে সরকারের কাছ থেকে কতখানি কি উৎসাহ পায় বা তাদের নিজ নিজ বৃত্তিতে উন্নতির জন্যে তারা কি করেন তা তোমার বিবৃতি থেকে আমি জানতে পারি নি। আমাকে সম্বোধন করে মহারাজা বললেন, তুমি তোমার দেশের অনেক বদঅভ্যাস থেকে বেঁচে গেছ। কারণ তুমি তোমার জীবনের অধিকাংশ সময় ভ্রমণ করে কাটিয়েছ। কিন্তু তুমি তোমার দেশ ও জনসাধারণ সম্বন্ধে যা বলেছ তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে তোমার দেশের অধিকাংশ মানুষ অসৎ এবং তারা পাপে ডুবে আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লেখকের দেশপ্রেম। লেখক মহারাজার কাছে সুবিধাজনক একটা প্রস্তাব পেশ করল কিন্তু মহারাজা তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজনীতি সম্বন্ধে মহারাজার অজ্ঞতা। সে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের আইন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং রাজনীতিক পার্টি।

সত্যবাদীতার প্রতি আমার তীব্র আসক্তি না থাকলে আমি আমার কাহিনীর এই অংশ লিখতুম না। আমার দেশের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য শুনে আমি অন্তরে ক্রোধান্বিত হলেও আমাকে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এই সব মন্তব্য শুনে আমি নিজেও যেমন দুঃখবোধ করেছিলুম আমার পাঠকগণও নিশ্চয় সেইরকম দুঃখবোধ করবেন কিন্তু মহারাজা প্রতিটি বিষয়ে এত কৌতূহলী ও অনুসন্ধিৎসু, সহৃদয় ও কৃতজ্ঞ যে তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি এড়িয়ে গেছি তবে যেগুলির উত্তর দিয়েছি তাতে আমার দেশকে সর্বদা বড় করেই দেখিয়েছি, কোথাও ছোট করবার চেষ্টা করিনি। অবশ্যই দেশ বা দেশবাসীর কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, সেগুলি আমি কখনই বড় করে দেখাই নি এবং আমার দেশের যা কিছু ভাল তা আমি সব সময়েই সামনে ধরেছি। যদিও সেই মহান সম্রাট আমার সবকিছু শুনে প্রভাবিত হন নি, তাঁর দৃষ্টিতে আমাদের ভাল তাঁর কাছে মন্দ মনে হয়েছে।

কিন্তু এই রাজাকে ক্ষমা করা যেতে পারে কারণ তিনি পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিহীন হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করছেন। নিজের দেশ ছাড়া অন্য যে কোনো দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং অন্য দেশের কোনো পরিচয়ই তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। ফলে তাঁর মনের প্রসারতা না থাকতেই পারে, যে কোনো দেশের সবই দোষ নয়, গুণও অনেক আছে। যাঁরা উদার হৃদয় হয় তাঁরা দোষ বর্জন করে গুণ বড় করে দেখেন কিন্তু যেহেতু রাজার অন্য দেশ ও অন্য মানুষ

সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তাই তাঁর মন একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে, অতএব তাঁর এই মনোভাব মেনে না নেওয়াই ভাল।

আমি যা বলেছি তার সমর্থনে কিছু বলব এবং সীমাবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা কি ক্ষতি করতে পারে তাও আমি দেখাব তবে তা হয়ত অনেকে বিশ্বাস করবে না। মহারাজার অনুগ্রহ লাভ করবার আশায় আমি তাঁকে একটি আবিষ্কারের কথা বললুম। যে আবিষ্কার অন্ততঃ 'তিন চারশ' বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাঁকে বললুম একরকম চূর্ণ আছে যাতে একটা আগুনের ফুলকি পড়লেই সেটি দপ করে জ্বলে উঠবে এবং সে বিস্ফোরণও ঘটাতে পারে। ঐ চূর্ণ একটা পাহাড়কেও উড়িয়ে দিতে পারে এবং তখন বাজ পড়ার চেয়েও জোর শব্দ হতে পারে। ঐ চূর্ণ একটি পেতল বা লোহার ফাঁপা নলের ভেতর খানিকটা রেখে এবং তার সামনে লোহার বা পেতলের বল রেখে যদি তাতে অগ্নি সংযোগ করা হয় তাহলে বলটি সশব্দে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হবে। তবে সবই নির্ভর করবে ফাঁপা নল বা বলের আকারের ওপর। খুব বড় একটা বল এইভাবে নিক্ষেপ করলে একটা পুরো সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পারে, খুব মজবুত দেওয়ালকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারে, হাজার লোক সমেত জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে। আর বলের সঙ্গে একটা শেকল লাগিয়ে দিলে জাহাজের পাল ও মাস্তুল কেটে দ্বিখণ্ডিত করে মানুষজনকে নিঃশেষ করে দিতে পারে। আমরা যখন কোনো শহর অবরোধ করি তখন একটা বড় লৌহবলের ভেতর ঐ চূর্ণ ভর্তি করি এবং নলের ভেতর সেই বল রেখে ঐ চূর্ণে আগুন লাগিয়ে সেই বল অবরুদ্ধ শহরের ওপর ফেলি। শহরে সেই বল পড়ে ফেটে যায়, বাড়ি ঘরদোর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, বল ফেটে লোহার যেসব টুকরো তীব্র গতিতে ছিটকে পড়ে তার আঘাতে মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, শরীর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। আমি মহারাজকে বললুম কি উপাদান এবং কত ভাগ মিশিয়ে সেই চূর্ণ তৈরি করতে হয় তা আমি জানি। উপাদানগুলিও সহজে পাওয়া যায় এবং ঐ ফাঁপা নল ও বল, আমি মহারাজার মিস্ত্রিদের নির্দেশ দিয়ে তৈরি করিয়ে দিতে পারি। নল ও বল মহারাজার দেশের প্রচলিত মাপ মতোই হবে। এই ধরুন দুশো ফুট লম্বা আর বিশ বা তিরিশ ফুট ব্যাসের। আর বড় করবার দরকার হবে না। বলও সেই অনুপাতে তৈরি হবে। ঐ ফাঁপা নলের ভেতর উপযুক্ত পরিমাণ চূর্ণ ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালে যে কোনো শহরের সবচেয়ে মজবুত দেওয়াল ও বাড়িঘর উড়ে যাবে। কোনো শহর যদি মহারাজার অবাধ্য হয় তাহলে পুরো শহরটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায়। মহারাজা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এবং আমাকে আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করেছেন তারই প্রতিদানে আমি বিনীতভাবে ও কৃতজ্ঞচিত্তে আমার প্রস্তাব পেশ করলুম।

আমার প্রস্তাব ও ধ্বংসের বিবরণ শুনে ও যন্ত্রের কার্যকারিতা উপলব্ধি করে মহারাজা রীতিমতো অবাক ও ভীত হলেন। আমাদের মতো ক্ষুদ্র একটা পোকা কি করে এমন ভীষণ ও ভয়ংকর একটা ধারণা কল্পনা করতে পারে ভেবে তিনি বিস্মিত!

কি সাংঘাতিক। যে মানুষ প্রথম এই রকম মারাত্মক, অস্ত্র আবিষ্কার করেছে সে নিশ্চয় একটা শয়তান। তিনি বললেন চারুকলা, কোনো শিল্প বা কলাকৌশলের আবিষ্কারের প্রতি তিনি আগ্রহী। কিন্তু এমন একটা অস্ত্র প্রয়োগ করা অপেক্ষা তিনি তাঁর অর্ধেক রাজত্ব ত্যাগ করতে রাজি আছেন এবং আমার যদি প্রাণের ভয় থাকে তাহলে আমি যেন এ বিষয়ে দ্বিতীয় বার আর উল্লেখ না করি।

মহারাজার অনেক গুণ, তিনি জ্ঞানী, বিদ্বান, বহুবিষয়ে চর্চা করেন, সুশাসক, অমায়িক, প্রজানুরঞ্জনকারী কিন্তু যেহেতু তিনি একটা সীমাবদ্ধ স্থানে বাস করেন, অন্য জগতের অস্তিত্বই জানেন না, অন্য জগতের সহিত যোগাযোগ নেই, নেই কোনো ভাবের আদান প্রদান, সেইজন্য তিনি সংকীর্ণমনা। নিজের দেশ ছাড়া আর কিছু তিনি জানেন না। ইনি যদি ইউরোপের রাজা হতেন তবে তিনি অন্য মানুষ হয়ে যেতেন, জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়ত, রাজার যে সকল গুণাবলী থাকা দরকার, যার দ্বারা তিনি সুশাসক হতে পারেন, সংকটের মোকাবিলা করতে পারেন, এইসব ক্ষমতা ও গুণ তিনি অর্জন করতে পারতেন। আমি মহারাজাকে ছোট করতে চাইনা। কিন্তু পাঠকদের কাছে তিনি মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। তবুও রাজার একদিকে জ্ঞান যেমন প্রচুর অজ্ঞানও তেমনি সীমাহীন। রাজা হিসেবে তিনি রাজনীতিক জ্ঞান অর্জন করেন নি, কারণ এ দেশে সে সুযোগ নেই। ইউরোপ হলে ভিন্ন হত। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে মহারাজকে আমি বলেছিলুম রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে ইউরোপে প্রচুর বই আছে। এ কথা শুনে তিনি উৎসাহিত হলেন না উপরন্তু আমাদের বিষয়ে তাঁর নীচু ধারণা জন্মাল। রাজার উত্তম কূটনীতিক হওয়া উচিত। এ কথা তিনি মানতে রাজি নন। রাষ্ট্রকে অনেক বিষয়ে গোপনতা রক্ষা করতে হয়, এ কথা মানতেও মহারাজা প্রস্তুত নন। রাষ্ট্রের কোন গোপনতা রক্ষার দরকার নেই, সবকিছুর তাৎক্ষণিক সমাধান করে ফেলাই ভাল। তার জন্যে কিছু সাধারণ জ্ঞান, কিছু বুদ্ধি, কিছু উদারতা থাকলেই যথেষ্ট। তবে বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনা অবশ্যই থাকা দরকার। আর দরকার সাহস। এই সব গুণ থাকলেই উত্তম শাসক হওয়া যায়, এই হল মহারাজার ধারণা। তিনি বলেন যে ব্যক্তি একই জমিতে একবার শস্য ফলাতে পেরেছে সেই ব্যক্তি সেই জমিতে আবার শস্য ফলাতে পারবে। তারাই মানব চরিত্র যথাযথ বুঝতে পারে এজন্যে কোনো রাজনীতিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

মুশকিল হল এই যে এই সব দৈত্য সদৃশ্য মানুষদের শিক্ষানীতি ত্রুটিযুক্ত, ওদের শুধু শেখানো হয় নীতিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য ও গণিত। এই সব বিষয়ে ওদের নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। দৈনন্দিন জীবন যাপন করার পক্ষে বিষয়গুলি উপযোগী। ওরা কৃষি ও ফসলের কিছু উন্নতি করেছে, কারিগরী বিদ্যাও কিছু আয়ত্ত করেছে, কিন্তু আর অগ্রসর হতে পারছে না। শুধু মাত্র এই কয়েকটি বিদ্যা আয়ত্ত করে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। উচ্চ স্তরের কোনো ধ্যানধারণা বা অতিপ্রাকৃত বিষয়েও আমি তাদের আকৃষ্ট করতে পারি নি, বোঝাতে পারি নি যে এসবেরও প্রয়োজন আছে।

ওদের বর্ণমালার সংখ্যা বাইশটি। মজার বিষয় যে ওদের যে কোনো প্রচলিত আইন বাইশটি শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কয়েকটি মাত্র ঐ সংখ্যা অতিক্রম করেছে। আইন অবশ্য সহজ ভাষাতেই লেখা। শব্দ বিন্যাসে কোনো জটিলতা নেই, কিন্তু সেই আইনের অন্যরকম ব্যাখ্যাও যে হতে পারে এ জন্যে ওরা মাথা ঘামায় না। কারণ ওরা বেশি মাথা ঘামাতে প্রস্তুত নয়। যদিও বা কেউ সাহস করে কোনো আইনের প্রতিবাদ করতে চায় তা সেটি সর্বোচ্চ অপরাধরূপে বিবেচিত হবে। কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী মামলায় যে রায় দেওয়া হয়, পরবর্তী কোনো মামলায় তার নজির কেউ উল্লেখ করে না। বিচারক মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দেন।

এরা মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার জানে, ছাপাখানা আছে, বই আছে কিন্তু ওদের পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো নয়। মহারাজার পাঠাগার সবচেয়ে বড় কিন্তু বইয়ের সংখ্যা হাজার অতিক্রম করবে না। বারোশত ফুট লম্বা একটি গ্যালারিতে বইগুলি সাজানো আছে। আমি ইচ্ছামতো বই নিয়ে পড়তে পারতুম, সে স্বাধীনতা আমার ছিল। মহারাণীর কাঠের মিস্ত্রী একটা যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছিল। সেটা রাখা হল গ্লামডালক্লিচের একটা ঘরে। যন্ত্রটা অনেকটা মইয়ের মতো, পঁচিশ ফুট উঁচু, পঞ্চাশ ফুট লম্বা, অনেকগুলো ধাপ আছে। যন্ত্রটা একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরানো যেত। যে বই আমি পড়তে চাইতুম সেই বই দেওয়ালে একটা তাকে আটকে রাখা হত আর সেই মই যন্ত্রে উঠে প্রথমে সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছে পড়তে

সর্বোচ্চ ধাপে পৌঁছে পড়তে আরম্ভ করতুম

আরম্ভ করতুম। মই-এর ওপরের ধাপে একধার থেকে বইয়ের লাইনগুলো পড়তে পড়তে লাইনের শেষে পৌঁছতুম। এইভাবে কয়েকটা লাইন পড়া হলে পরের ধাপে নেমে আসতুম। এরপর বইয়ের এক পাতার সব কটা লাইন পড়তে পড়তে নিচে

নেমে আসতুম। তারপর আবার ওপরে উঠে পাতা উলটে আবার পড়তে আরম্ভ করতুম। বইয়ের পাতাগুলো ছিল পিচবোর্ডের মতো মোটা আর এক একটা পাতা আঠারো থেকে কুড়ি ফুট লম্বা। পাতা ওলটাতে আমাকে দুটো হাতই লাগাতে হত।

আমি এদের অনেক বই পড়ে ফেললুম। বিশেষ করে ইতিহাস ও নীতিজ্ঞানের বই। এদের লেখার ধরন স্পষ্ট, যা লেখবার তা সোজাসুজি লিখেছে, অবান্তর একটা শব্দ বা কোনো অলংকার ব্যবহার করে নি। বক্তব্যের মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই ফলে ভাষার কোনো স্বাদ নেই। নীতিজ্ঞানের যেসব বই তার মধ্যে আমি একখানা বই দেখেছিলুম গ্লামের ঘরে। বইখানা গ্লামের গভরনেসের। মহিলার বয়স হয়েছে, রীতিমতো গম্ভীর, নিজেও নীতিজ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লেখেন। বইখানা মানুষের নানা দুর্বলতা নিয়ে লেখা তবে যেভাবে লেখা তা পুরুষদের আকৃষ্ট করে না। পাঠকদের মধ্যে মহিলার সংখ্যা বেশি। এদেশের লেখক নীতিজ্ঞান সম্বন্ধে কি লেখে আমার তা জানার আগ্রহ হল। পড়ে দেখলাম লেখক ইউরোপীয় নীতি-বাগীশ লেখকদের মতোই উপদেশ বিতরণ করেছেন, ব্যাখ্যাগুলিও প্রায় সেই রকম। লেখক বলছেন মানুষ এক অসহায় জীব, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে না, ঝড় ঝঞ্ঝা, হিংস্র বন্য পশু ইত্যাদি থেকে মানুষ নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। মানুষ পশুর কাছে পরাভূত, কত পশু আছে তারা মানুষের চেয়েও শক্তিশালী। কত পশুর গতি মানুষের চেয়েও বেশি। কারও অধিকতর দূরদৃষ্টিও আছে তারা আবার মানুষ অপেক্ষা পরিশ্রমী। তিনি লিখছেন যে প্রকৃতি ক্রমশঃ দুর্বল হচ্ছে, তার প্রাচুর্য ক্রমশঃ কমে আসছে, পূর্বে প্রকৃতি অধিকতর প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী মানুষ বা জীব-জন্তুর জন্ম দিতে পারত কিন্তু এখন তা পারে না। এটা ভাবা অন্যায় হবে না যে পূর্বে মানুষের আকার আরও বড় ছিল, দৈহিক গঠন আরও মজবুত ছিল। সেকালে প্রকৃতি দৈত্য ও অতিকায় জীবজন্তুর জন্ম দিতে পারত। এই রাজ্যেই মাটির নিচে অনেক বিশাল আকারের খুলি বা কংকাল, হাড় ইত্যাদি পাওয়া গেছে। বর্তমানে মানুষের আকার ক্রমশং ছোট হয়ে আসছে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে এবং তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আমাদের আকৃতি আরও বড় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও কঠিন হওয়া উচিত ছিল। কারণ বর্তমানে দুর্ঘটনা-ক্রমে একটা টালি খসে পড়ে আমাদের মাথা জখম করে ফেলতে পারে। দুষ্ট ছেলের ঢিলের আঘাতে কাতর হয়ে পড়ি, এমন কি ছোট নদীতেও আমরা ডুবে যাই। লেখক এই রকম কিছু যুক্তি উপস্থিত করেছেন এবং কি ভাবে এইসব বিপদ এড়িয়ে মানুষ জীবন যাপন করতে পারে তার জন্যে কিছু নৈতিক উপদেশ দিয়েছেন। প্রকৃতি নিয়ে নীতিজ্ঞান বা বাকবিতণ্ডা আমার তেমন পছন্দ হল না। তাছাড়া এসব তর্কেরও শেষ নেই। আমরা প্রকৃতিকে দেখি উদার দৃষ্টি দিয়ে কিন্তু এদেশের মানুষ দেখে সংকুচিত দৃষ্টিতে।

সামরিক বিভাগ নিয়ে ওদের অনেক গর্ব। মহারাজার আছে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পদাতিক সৈন্য এবং বত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। কিন্তু এটাকে ঠিক সামরিক বাহিনী বলা চলে না। কয়েকটি শহরের ব্যবসাদার ও গ্রামের কৃষকদের

নিয়ে বাহিনী গঠিত, তাদের সেনাপতি মনোনীত করা হয় কোনো অভিজাত পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে এবং কারও কোনো বেতন নেই। এরা উত্তম কুচকাওয়াজ করতে পারে এবং শৃংখলা মেনে চলে, শুধু এইজন্যে তাদের উত্তম যোদ্ধা বলা যায় না। ওদিকে প্রত্যেক কৃষক তাদের জমিদারের অধীন এবং ব্যবসাদাররা তাদের শহরের নিয়ন্ত্রণাধীন। সামরিক বিভাগে সৈন্য ভর্তি করার কোনো বাঁধাধরা নিয়ম আছে বলে মনে হয় না। শহরের কাছে কুড়ি ফুট চৌকো একটা মাঠে এই লোরব্রুলগ্রুড শহরের ফৌজকে আমি প্রায়ই কুচকাওয়াজ করতে দেখেছি। এই ফৌজে প্রায় পঁচিশ হাজার পদাতিক ও ছয়হাজার অশ্বারোহী সৈন্য আমি দেখে থাকব। সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। কারণ বিরাটাকার শরীর নিয়ে ওরা যে মাঠে কুচকাওয়াজ করছিল এবং যারা দূরে ছিল তাদের যথাযথ ভাবে গণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। একজন অশ্বারোহী যে ঘোড়াটির উপর বসে আছে সেই ঘোড়াটি প্রায় নব্বুই ফুট উঁচু। আমি দেখছি আদেশ পাওয়া মাত্রই এই অশ্বারোহী বাহিনী একসঙ্গে তাদের তলোয়ার সড়াৎ করে বার করে আন্দোলিত করতে লাগল। এমন বিস্ময়কর দৃশ্য চাক্ষুষ না দেখলে কল্পনা করা যায় না। মনে হয় যেন আকাশে বিশ হাজার বিদ্যুৎ একসঙ্গে ঝলসে উঠল।

কৌতূহলের বিষয় যে এ দেশের রাজা যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের যোগাযোগ একেবারেই নেই সে দেশের লোক একটা সৈন্যবাহিনী এবং তাদের সামরিক কুচকাওয়াজের কল্পনা কি করে করতে পারে? এ বিষয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলে ও বই পড়ে আমি কিছু জানতে পেরেছিলুম। এরাও আমাদের মতো সেই ব্যাধিতে একদা ভুগেছিল, যে ব্যাধির প্রভাবে রাজা চান প্রজাদের বশে রাখতে আর প্রজা চায় রাজাকে সরিয়ে নিজেরা বা নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে নিতে বা দিতে। দেশের তিনটি দল মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে প্রচলিত আইনের সাহায্যে তাদের দাবিয়ে দেওয়া হয়। শেষ বিদ্রোহ ঘটেছিল বর্তমান মহারাজার ঠাকুর্দার আমলে। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে সেই বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন। তখন থেকে সামরিক বাহিনীকে একটা নিয়ম শৃংখলার মধ্যে রাখা হচ্ছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহারাজা ও মহারাণী সীমান্তের দিকে যাত্রা করলেন। লেখকও তাঁদের সঙ্গে গেলেন। কি ভাবে তিনি দৈত্যদের দেশ ত্যাগ করলেন তার বিশদ বর্ণনা। লেখক ইংলণ্ডে ফিরলেন।

বরাবর আমার একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে আমি এদের হাত থেকে পালাতে পারব এবং কোনো না কোনো সময়ে আমি দেশে ফিরবই ফিরব। তবে কি করেই বা এদের হাত থেকে মুক্তি পাব এবং কি করে দেশে ফিরতে পারব সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কিংবা কোনো পরিকল্পনাও রচনা করতে পারি নি, শুধু একটা বিশ্বাস অথবা ভেতর থেকে কেউ আমাকে প্রেরণা যোগাতো। আমি যে জাহাজে এসেছিলুম সেইটাই প্রথম জাহাজ যা এদেশের সামুদ্রিক এলাকায় ঢুকে পড়েছিল এবং মহারাজা কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন যে যদি কোনো সময়ে ঐ রকম আর একটা জাহাজ এদিকে এসে পড়ে তাহলে সেখানা আটক করে যেন তার সমস্ত নাবিক ও যাত্রীসহ তাকে লোরব্রুলগ্রুডে তুলে আনা হয়। তাঁর ভীষণ ইচ্ছে আমার আকার মতো একটি রমণী যোগাড় করা, যাতে আমি তার সঙ্গে বিয়ে করে এদেশে সন্তান সন্ততির জন্ম দিতে পারি। কি ঘৃণিত প্রস্তাব। আমি এমন একটা বংশ এদেশে প্রতিষ্ঠা করব যারা বংশানুক্রমে পোশা ক্যানারি পাখির মতো খাঁচার মধ্যে বন্দী জীবন যাপন করবে। এবং নিজ কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে অথবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিজাত ব্যক্তিরা তাদের কিনে বন্দী করে রাখবে। আমাকে অবশ্য খুবই যত্নে রাখা হয়েছিল, আমি মহান রাজার এবং মহারাণীর প্রিয়পাত্র ছিলুম। রাজসভায় সকলের আনন্দের উৎস ছিলুম কিন্তু এইভাবে দাসের মতো জীবন যাপন করা আমি মানুষের মর্যাদা-হানির নামান্তর বলেই মনে করি। আমি ইংলণ্ডে আমার নিজের বাড়িতে যেসব কথা দিয়ে এসেছিলুম সেসব আমি কখনই ভুলতে পারি না। আমি আমার মতোই মানুষের সঙ্গে কথা বলতে চাই, তাদের সঙ্গে পথে প্রান্তরে বিচরণ করতে চাই, কেউ

আমাকে চলবার সময় ব্যাঙের মতো পায়ে মাড়িয়ে অথবা কুকুর-বান্দার মতো সজোরে লাথি মেরে হত্যা করুক এই চিন্তায় সর্বদা শংকিত থাকতে চাই না। কিন্তু আমি যা আশা করি নি তার চেয়েও আগে এবং সহজে মুক্তি পেয়ে গেলুম। সমস্ত কাহিনী ও ঘটনা আমি যথাসময়েই বলব।

দেখতে দেখতে এদেশে আমার দু'বছর কেটে গেল এবং আমি তিন বছরে পড়লুম। মহারাজা ও মহারাণী রাজ্যের দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে ভ্রমণে যাবেন। আমি এবং গ্লামডালক্লিচ তাঁদের সঙ্গী হলুম। আমাকে যথারীতি আমার সেই ছোট বাক্স-ঘরে বসিয়েই নিয়ে যাওয়া হল। এই ঘরের বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি, বারো ফুট চওড়া, বেশ আরামদায়ক। ছাদের চার কোণ থেকে সিলকের একটা হ্যামক ঝুলিয়ে দেবার নির্দেশ আমি দিয়েছিলুম। যাতে ভ্রমণের সময় আমি সেই হ্যামকে শুয়ে ঘুমোতে পারি। মিস্ত্রিকে আমি বলেছিলুম ছাদে এক ফুট ব্যাসওয়ালা গোল একটা ফুটো করে দিতে। তাহলে আমি যখন হ্যামকে শুয়ে থাকব তখন ঘরে হাওয়া খেলবে, আমি গরমে কষ্ট পাব না। তবে গর্তটা যেন ঠিক আমার মাথার ওপর না করা হয়, আর সেই ফুটোর নিচে একটা কাঠ এমনভাবে লাগানো থাকে যেটা আমি ইচ্ছামতো ঠেলে ফুটো বন্ধ করতে পারি।

আমাদের যাত্রাপথ শেষ হল, এইবার কিছুদিন বিশ্রাম। আমরা যেখানে থামলুম সেখান থেকে আমাদের বিলিতি হিসেবমতো সমুদ্র আঠারো মাইল দূরে। এখানে মহারাজার একটা প্রাসাদ আছে। কাছেই একটা শহর আছে, সে শহরের নাম হল ফ্ল্যানফ্ল্যাসনিক। গ্লাম এবং আমি, আমরা দু'জনেই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। আমার সামান্য সর্দি হয়েছিল। কিন্তু বেচারী গ্লাম এত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে, সে তার নিজের ঘরেই শুয়ে থাকত। এদিকে আমি সমুদ্র দেখবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সমুদ্র আমার পলায়নের একমাত্র পথ। অবশ্য সে সুযোগ যদি ঘটে যায়! আমার যত না সর্দি হয়েছিল, আমি তার চেয়ে বেশি কাতর হওয়ার ভান করলুম। আমি বললুম সমুদ্রের তাজা হাওয়া পেলে ভাল হয়। আমার আবেদন মঞ্জুর হল, সঙ্গে একজন বালকভৃত্য দেওয়া হল। এই বালক আমার অনুরক্ত ছিল, ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমি শলা পরামর্শও করেছি। গ্লামডালক্লিচের ইচ্ছে নয় আমি যাই। তাই সে বার বার সেই বালককে সতর্ক করে দিতে লাগল। গ্লাম ছল ছল চোখে আমাকে বিদায় দিল, আমি গ্লামের সে মুখ ভুলব না। কে জানে যা ঘটতে যাচ্ছে তা সে আশংকা করেছিল কি না। বালক আমাকে আমার বাক্সে বন্দী করে নিয়ে চলল। সমুদ্রের ধারে যেখানে পাহাড় ও পাথর আছে তা প্রাসাদ থেকে আধঘণ্টার পথ। সমুদ্রের ধারে পৌঁছে বালককে বললুম আমাকে নামিয়ে দিতে। সমুদ্রের ধারে এসে আমি নিজেকে সুস্থ বোধ করলুম না। বালককে বললুম আমি হ্যামকে উঠে একটু ঘুমোব। একটু ঘুমোলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আমি হ্যামকে উঠলুম। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল তাই বালক জানালা বন্ধ করে দিল। আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমোবার আগে একটা জানালা দিয়ে দেখেছিলুম ছেলেটা তখন

আমার বাক্স যেখানে নামিয়ে দিয়েছিল সেখানে কোনো বিপদের আশংকা না করে পাহাড় ও পাথরের খাঁজে খাঁজে পাখির ডিম খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি তারপর ঘুমিয়ে পড়লুম। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। বাক্সর মাথায় যে আংটা আছে সেটা ধরে কে যেন হঠাৎ টেনে তুলল। বাক্সটা সহজে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ঐ আংটা লাগানো হয়েছিল। আমার মনে হল আমার বাক্সটা আকাশে অনেক উঁচুতে উঠেছে আর সেটা প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথম ধাক্কাতেই আমি হ্যামক থেকে বাক্সর মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলুম, তখন বাক্স খুব দুলছিল কিন্তু তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেল। যত জোরে পারলুম আমি কয়েকবার চিৎকার করলুম কিন্তু বৃথা। জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখলুম শুধু আকাশ আর মেঘ। মাথার ওপর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, পাখি বা পাখিরা যেন ডানা ঝটপট করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলুম কি সাংঘাতিক বিপদে পড়েছি। নিশ্চয় কোনো ঈগল আমার বাক্স-ঘরের মাথার ওপরে আংটাটি তার ঠোঁট দিয়ে ধরে আকাশে উড়তে আরম্ভ করেছে, এবার পাথরের

ঈগল বাক্স ঘরের মাথার আংটাটি ঠোঁট দিয়ে ধরে উড়তে আরম্ভ করেছে

ওপর আছড়ে ফেলে দেবে, বাক্স ভাঙবে, আমি মরব, তখন ঈগলটা আমার মৃতদেহটা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। দূরে কোথাও পাহাড়ে এই পাখির বাসা, গন্ধ চিনে সে সেখানে যাবে। আমি আর আমার বাক্সর ভেতর কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারব! কে জানে ভাগ্যে কি আছে।

কিছুক্ষণ পরে ডানা ঝটপট ও আওয়াজ যেন খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গেল। বুঝতে পারলুম আমার বাক্সটা পড়ে গেল আর তারপরই অনুভব করলুম বাক্সটা কিছুর ওপর ওঠানামা করতে করতে দোল খাচ্ছে। পড়বার আগে বাক্সটা বেশ জোরে দুলে উঠেছিল, ডানা ঝটপটের আওয়াজও বেশ জোরে শুনেছিলুম। আমার মনে হয় যে ঈগল আমার বাক্স তার ঠোঁটে ধরে উড়ে পালাচ্ছিল তাকে অন্য এক বা একাধিক ঈগল তাড়া করেছিল এবং তখন প্রথম ঈগল বাক্সটা সোজা ফেলে দেয়। পড়বার সময় আতংকে আমি নিশ্বাস বন্ধ করেছিলুম। পড়বার সংগে সংগে একটা আওয়াজ শুনলুম। সে আওয়াজ নায়েগ্রা জল প্রপাতের চেয়েও জোর। তারপর মিনিট খানেক অন্ধকার। কি ঘটে গেল বুঝতে সময় লাগল। মাথা একটু ঠিক হতে বুঝলুম বাক্সটা ওঠা নামা করছে, জানালা দিয়ে বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। বাক্সটা একেবারে ফাঁকা নয় যে উলটে-পালটে যাবে। ভেতরে কিছু ওজন আছে, আমি আছি এবং কিছু মালপত্তরও আছে। বাক্সটা বেশ মজবুত। ওপর নিচে সবকটা কোণ লোহার অ্যাংগল দিয়ে শক্ত করে আঁটা। বাক্সটা তখন পাঁচ ফুট মতো জলে ডুবে ভাসতে ভাসতে চলেছে। আমার অনুমান ঠিক। ঈগল যখন আমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল তখন দুটো তিনটে ঈগল তাকে তাড়া করেছিল, তখন সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে জলে ফেলে দেয়। বাক্সর নিচে লোহার মজবুত পাত বসানো থাকায় নিচের অংশ ভারি ছিল অতএব সোজা হয়েই পড়েছে এবং জলে পড়ার আঘাতটাও সহ্য করেছে, বাক্সটা ভেঙে যায় নি। বাক্সটা বেশ মজবুত করেই তৈরি, অন্য দরজার মতো এর দরজা খোলার ব্যবস্থা নেই, ওপর থেকে নিচে টেনে নামিয়ে বন্ধ করতে হয়। পড়বার সময় দরজা বন্ধই ছিল, ফাঁক দিয়ে সামান্য জলই ঢুকেছিল। মাথার ওপর হাওয়া চলাচলের যে ফুটোটা ছিল সেটা বন্ধ করে দিলুম।

এখন আমার বারবার গ্লামডালক্লিচের কথা মনে পড়তে লাগল। মাত্র এক ঘণ্টা আগেও তার কাছে ছিলুম, মনে হচ্ছে কতদিন তাকে ছেড়ে আছি। আমি নিজেই এক দারুণ বিপদে পড়েছি তারই মধ্যে সত্যি কথা বলতে কি বেচারীর কথা ভেবে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমাকে আর না দেখতে পেয়ে বেচারী নিজে ত কষ্ট পাবেই উপরন্তু তাকে মহারাণীর ভৎর্সনা শুনতে হবে, তিনি হয়ত ওকে তাড়িয়েই দেবেন। আমার মতো কোনো ভ্রমণকারী বোধহয় এমন বিপদে ও দুর্দশায় পড়েনি। প্রতি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে বাক্সটা বুঝি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে অথবা হঠাৎ ঝড়ে বা বড় ঢেউয়ের আঘাতে উলটে যাবে। কোনো দিকের কাঠ ফেটে গেলে বা জানালা ভেঙে গেলে সংগে সংগে মৃত্যু। ভাগ্যিস জানালার কাঁচের ওপাশে দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে লোহার জাল লাগানো আছে এবং সে কাঁচও বেশ পুরু নইলে এতক্ষণে একটা কিছু হয়ে যেত। কোনো কোনো ছিদ্র থেকে জল চুঁইয়ে ভেতরে ঢুকছিল তবে ভয়ের কিছু নয়। আমি সেই জল বন্ধ করার চেষ্টা করছিলুম। আমি বাক্সর ছাদের ফুটোর ঢাকাটা খুলতে পারছিলুম না, পারলে বাক্সর ছাদে উঠে বসে থাকতুম। ঘরের বন্ধ অবস্থার যন্ত্রণার দায় থেকে মুক্তি পেতুম। বাক্সবন্দী হয়ে দু'চার দিন যদি এইভাবেই

থাকি তাহলেই বা তার ফল কি হবে? শীতে ও অনাহারে মৃত্যু। এইভাবে ঘণ্টা চারেক কাটল। প্রতি মুহূর্তে বিপদ আশংকা করছি, এই বুঝি সব শেষ হল।

আমি পাঠকদের আগেই বলেছি আমার বাক্সর দু'পাশে দুটি লোহার মজবুত হ্যাণ্ডেল ছিল। ওদিকে কোনো জানালা ছিল না। হ্যাণ্ডেল দু'টো রাখবার উদ্দেশ্য আমি যখন বেড়াতে যেতুম তখন একজন ভৃত্য ঐ দুটো হ্যাণ্ডেল দু'হাতে ধরে ঘোড়সওয়ারের কাছে তুলে দিত আর ঘোড়সওয়ার হ্যাণ্ডেল দুটোর ভেতর দিয়ে একটা বেল্ট ঢুকিয়ে দিয়ে সেই বেল্টটা নিজের কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকে দিত। আমার মনের অবস্থা যখন এইরকম, প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশংকা করছি, ঠিক সেই সময় আমার মনে হল বাক্সর হ্যাণ্ডেল দুটোতে যেন একটা আওয়াজ হল এবং আমার এও মনে হল আমার বাক্সটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দু'পাশে ঢেউ কাটছে ঢেউ জানালায় আছাড় দিচ্ছে অতএব বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মনে একটু ক্ষীণ আশা জাগল। যদিও বুঝতে পারছি না কি ভাবে আমার আশা ফলবতী হতে পাবে। আমি আমার একটা চেয়ারের স্ক্রু খুলে ফেললুম কারণ চেয়ার-গুলো ঐ স্ক্রু দিয়ে বাক্সর সঙ্গে আঁটা ছিল। তারপর সেই চেয়ারখানা তুলে এনে ছাদের ফুটোর ঠিক নিচে লাগালুম। এবার চেয়ারে উঠে ঢাকাটা সরিয়ে ফুটোর যত কাছে সম্ভব মুখ নিয়ে গিয়ে খুব জোরে চিৎকার করতে লাগালুম—জান বাঁচাও! যত রকম ভাষা আমার জানা আছে সবরকম ভাষায়। আমার সঙ্গে সব সময় যে ছড়ি থাকত তার ডগায় আমার রুমালটা আটকে ফুটো দিয়ে বাইরে বার করে কয়েকবার আন্দোলিত করলুম। যদি কাছে কোনো জাহাজ বা নৌকো থাকে তাহলে তারা বুঝতে পারবে একটা হতভাগা মানুষ বাক্সটার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে।

আমার মনে হল আমার সব চেষ্টাই বিফল হচ্ছে তবুও আমি চেষ্টা করে চলেছি। তবে বাইরে দেখতে না পেলেও আমি বেশ বুঝতে পারছি যে আমার বাক্সটা কেউ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই রকম ঘণ্টা খানেক চলল বা তারও কিছু বেশি হবে তারপর বাক্সটার যেদিকে হ্যাণ্ডেল আছে এবং যে দিকে জানালা নেই সেই দিকটা হঠাৎ একটা শক্ত কিছুতে ধাক্কা খেল। আমার মনে হল পাথরে ধাক্কা লেগেছে। ধাক্কার ফলে আমাকে বাক্সর মধ্যে কয়েকবার গড়াগড়ি খেতে হল। আমার বাক্সর ওপর কয়েকটা শব্দ শুনলুম। যেন একটা আংটার কাছি আমার বাক্সর ওপর পড়ল এবং সেই কাছি বুঝি কেউ বাক্সর মাথায় পরাচ্ছে। তারপর কেউ আমার বাক্সটাকে ওপর দিকে তুলছে, অন্ততঃ ফুট তিনেক ত তুলেছেই। তখন আমি আমার ছাদের ফুটো দিয়ে রুমাল বাঁধা ছড়িটা ওপর দিকে তুলে ধরলুম আর সেই সঙ্গে বেশ জোরে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করতে লাগলুম, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার গলা ভেঙে গেল। যাক তারপরেই বাইরে থেকে আমি একটা উত্তর শুনতে পেলুম। বার,বার তিন বার। আমার তখন যা আনন্দ হল তা এমন কেউ বুঝবে না যে না, আমার মতো বিপদে পড়েছে। মাথার ওপর আওয়াজ শুনছি, ছাদের গর্তের দিকে মুখ করে কেউ ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, ভেতরে কেউ আছ নাকি? কথা বল। আমি উল্লসিত।

ইংরেজিতেই জবাব দিলুম, আমি ইংরেজ, খুব বিপদে পড়েছিলুম, এমন বিপদে মানুষ পড়ে না, এখন আমাকে এই বন্দীঘর থেকে উদ্ধার কর। ওপর থেকে উত্তর এল, আর ভয় নেই, তুমি বেঁচে গেছ, তোমার বাক্স এখন একটা জাহাজের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে, ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকা হয়েছে, সে এসে বাক্স কেটে তোমাকে বার করবে। আমি বললুম তার দরকার নেই। তাতে অনেক সময় লাগবে। বাক্সর মাথার আংটা ধরে বাক্সটা জাহাজের ওপর টেনে তোলো। তারপর ক্যাপটেনের কেবিনের সামনে নিয়ে চল। আমি বুঝি তখন উত্তেজনায় পাগল হয়ে গেছি। আমি পাগলের মতো চিৎকার করে কথা বলছি। ওরা ভাবল আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি। ওরা হাসতে লাগল অথচ আমি আমারই মতো ইংরেজ এবং আমারই মতো মানুষদের মধ্যে এসে গেছি। তাদের শক্তিও আমার মতো। তবুও ছুতোর মিস্ত্রি এল এবং বাক্সর মাথায় চারফুট চওড়া একটা গর্ত কাটল, তারপর ভেতরে একটা মই নামিয়ে দিল। আমি সেই মই বেয়ে ওপরে উঠলুম। এবং আমাকে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হল। আমি তখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুর্বল।

জাহাজের নাবিকেরা অবাক, স্তম্ভিত। আমাকে তারা হাজার প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল। কিন্তু আমার তখন সে সব প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না। নাবিকদের মতো আমিও অবাক ও বিহ্বল। ভাবছি এতগুলি বেঁটে মানুষ এখানে এল কি করে অথচ তারা আমারই মতো মানুষ। আসলে দীর্ঘদিন দৈত্যপুরীতে থাকায় আমার দৃষ্টি তখন পর্যন্ত অভ্যস্ত হয় নি, নিজেকেও তখন দৈত্য মনে হচ্ছে। কিন্তু জাহাজের ক্যাপটেন মিঃ টমাস উইলকক্স একজন সজ্জন ও যোগ্য ব্যক্তি, স্রপশায়ারে তাঁর বাড়ি। তিনি আমার অবস্থা বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন আমি বোধহয় জ্ঞান হারাব, তিনি নাবিকদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন। তারপর আমাকে সুস্থ করবার জন্যে বলদায়ক একটি পানীয় (করডিয়াল) পান করতে দিলেন। বললেন ওঁরই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে। ঘুমোবার আগে আমি ক্যাপটেনকে বললুম, যে বাক্সটি তাঁরা উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে বেশ কিছু দামী আসবাব আছে। যা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। ঐ বাক্সয় আছে চমৎকার একটি হ্যামক, উত্তম বিছানা সমেত একটি খাট, দুটি চেয়ার, একটি টেবিল এবং কাপড়চোপড় রাখবার একটি ক্যাবিনেট। এছাড়া বাক্সর ভেতরের দেওয়াল সিলকের ওয়াড় দেওয়া নরম ও পাতলা গদি দিয়ে আচ্ছাদিত। ক্যাপটেন যদি বাক্সটা তার কেবিনে আনান তাহলে আমি কৃতার্থ হ'ব। আমি তখন বাক্সর দরজা খুলে দেখাতে পারব ভেতরে কি আছে। বাক্স আমি তাঁরই সামনে রেখে খুলব। আমি অবশ্য ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলুম না তাই আমার কথা বলার ধরন দেখে ক্যাপটেন ভাবলেন আমার মাথা গুলিয়ে গেছে, আমি আবোল তাবোল বকছি। আমাকে বোধহয় সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই তিনি তখন বললেন ঠিক আছে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি জাহাজের ডেকে গেলেন এবং আমার বাক্স-ঘরে কয়েকজন লোককে পাঠালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নাবিকেরা (আমি পরে জানতে

পেয়েছিলুম) বাক্স-ঘরের ভেতর থেকে সব কিছু টেনে বার করেছে। দেওয়াল থেকেও তুলোর অন্তরণ খুলে ফেলেছে। নাবিকদের জানা ছিল না যে টেবিল চেয়ারগুলো স্ক্রু দিয়ে আঁটা তাই সেগুলো টেনে তুলতে গিয়ে তারা সব রীতিমতো জখম করেছে। এমন কি বাক্স থেকে কিছু কাঠ বার করে সেগুলো জাহাজ মেরামতের কাজে লাগিয়েছে। যখন তারা বুঝেছে ভাঙা বাক্সটা নিয়ে আর কিছু করবার নেই তখন সেটা জলে ফেলে দিয়েছে। বাক্সটার সব দিক ভেঙে যাওয়ায় সেটা সহজে জলে ডুবে গেছে। যাইহোক এ দৃশ্য আমাকে দেখতে হয় নি। আমার দীর্ঘ দিনের সঙ্গীর এমন দুরবস্থা দেখলে আমার ভীষণ মানসিক কষ্ট হত। যদিও আমি তখন সব কিছু ভুলতে চাই তবুও সেই সময়ে অতীতের অনেক কথাই হয়ত আমার মনে পড়ত।

আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। কিন্তু দৈত্যপুরীর নানা ঘটনা এবং যেসব বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলুম সেগুলি স্বপ্নে দেখতে দেখতে বার বার আমার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। যাইহোক ঘুম থেকে ওঠার পর নিজেকে সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হল। এখন রাত্রি প্রায় আটটা। ক্যাপটেন তখনি রাতের আহার দিতে বললেন। ভেবেছিলেন আমি অনেকক্ষণ অভুক্ত আছি। যখন তিনি লক্ষ্য করলেন আমি স্বাভাবিক হয়েছি, দৃষ্টি সহজ হয়েছে, এলোমেলো কথা বলছি না তখন তিনিও নিম্ন কণ্ঠে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, অত্যন্ত ভদ্রভাবে। ঘরে আমরা দু'জন ব্যতীত যখন আর কেউ রইলুম না তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলেন। আমি কোথায় গিয়েছিলুম এবং কি ভাবে ঐ বাক্সবন্দী হয়ে জলে ভাসছিলুম। ক্যাপটেন বললেন বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে দুপুরে তিনি যখন চোখে দুরবীন লাগিয়ে দূর সমুদ্রের দিকে নজর রাখছিলেন তখন অদ্ভুত বাক্সটা দূরে জলে ভাসতে দেখেন। প্রথমে উনি ভেবেছিলেন ওটি কোনো নৌকোর পাল, তার মানে কাছে কোনো বন্দর আছে। ওদের কিছু বিসকুট কেনার দরকার ছিল। কিন্তু কাছে আসতে তাঁর ভুল ভাঙল। কোনো কোনো নাবিক আবার সেটা দেখে ভয় পেয়েছিল। তারা ক্যাপটেনকে বলল, একটা বাড়ি সাঁতার কাটছে। তাদের বোকামি দেখে তিনি হাসতে থাকেন এবং তখন কয়েকজন নাবিক নিয়ে তিনি নিজেই নৌকায় উঠে, তাদের বললেন সঙ্গে মজবুত দাঁড় নিতে। সমুদ্র তখন শান্ত ছিল। আমাকে অর্থাৎ আমার বাক্স-বাড়িটা প্রথমে তিনি কয়েকবার প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর জানালা ও লোহার জাল লক্ষ্য করলেন, কিন্তু ভেতরে কিছু দেখা গেল না। তখন বাক্সর দু'দিকে দু'টো লোহার হ্যাণ্ডেল দেখতে পেয়ে নাবিকদের বললেন নৌকো তার কাছে নিয়ে যেতে। তারপর নির্দেশ দিলেন একটা হ্যাণ্ডেলের ভেতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে সিন্দুকটাকে (ক্যাপটেন আমার বাক্স-বাড়িকে সিন্দুক বলতেন) জাহাজের দিকে টেনে আনতে। তাই আনা হল। বাক্সটা জাহাজের কাছে আসতে তিনি এবার বললেন তার মাথার ওপর আংটায় দড়ি লাগিয়ে সেটা টেনে জাহাজের ওপর তুলতে। নাবিকেরা পুলি লাগিয়ে তার ভেতর দিয়ে দড়ি গলিয়ে বাক্সটা টেনে তুলতে লাগল। কিন্তু দু তিন ফুটের বেশি তুলতে পারল না।

ক্যাপটেন বললেন, তারপর ছড়ির ডগায় বাঁধা রুমাল দেখতে পেয়েই তাঁরা বুঝতে

পারলেন কোনো দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ঐ বাক্সর মধ্যে আটকে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি অথবা তাঁর কোনো নাবিক আকাশে তখন বিরাট আকারের কোনো পাখি দেখতে পেয়েছিল কি না? অর্থাৎ যখন বাক্সটা সর্ব প্রথম ওদের নজরে পড়েছিল। তিনি ভেবে বললেন আমি যখন ঘুমোচ্ছিলুম তখন নাবিকদের মধ্যে আমাকে নিয়ে কিছু আলোচনা চলছিল। তখন একজন নাবিক বলেছিল, সে দূরে আকাশে উত্তর দিকে তিনটে ঈগল উড়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু সেগুলো আমাদের দেখা ঈগল অপেক্ষা ছোট কি বড় তা সে বলে নি। না বলতে পারার সম্ভবত কারণ ঈগলগুলো দূরে এবং অনেক উঁচুতে উড়ছিল। আমি ক্যাপটেনকে জিজ্ঞাসা করলুম তিনি তখন কূল থেকে কত দূরে ছিলেন বলে মনে করেন?

তিনি অনেক ভেবে ও কিছু হিসেবনিকেশ করে বললেন তা একশত লিগ হবে। আমি বললুম আপনি বোধহয় ভুল করছেন, আপনি ওর অর্ধেক দূরেও ছিলেন না। কারণ আমি যে দেশ থেকে আসছি এবং ঈগল যখন আমাকে জলে ফেলে দিয়েছে ইতিমধ্যে দু ঘণ্টার বেশি সময় পার হয়েছিল। ক্যাপটেন আবার চিন্তা করতে লাগলেন তারপর বললেন, বিপদের আশংকায় তোমার মাথা তখন নিশ্চয়ই ঠিক কাজ করছিল না এবং আমার মনে হয় এখনও তা স্বাভাবিক হয় নি। তুমি তোমার কেবিনে গিয়ে আরও কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। আমি বললুম আপনি ও আপনার লোকজনের সযত্ন পরিচর্যায় আমি বেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়েছি এবং এখন পূর্বের মতোই আমার বুদ্ধি বৃত্তি কাজ করছে।

এবার তিনি গম্ভীর হলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি কোনও গুরুতর অপরাধ করে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছি? তোমার অপরাধের জন্যে তোমার দেশের রাজা কি দণ্ডবিধান স্বরূপ তোমাকে সিন্দুকে বন্ধ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? অনেক দেশে এমন শাস্তি বিধান করা হয়। অপরাধীকে জোর করে ছিদ্র নৌকায় তুলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে কোনো খাবার বা পানীয় জল দেওয়া হয় না।

ক্যাপটেন বললেন, এমন একজন ব্যক্তিকে জাহাজে তুলে তিনি যদিও দুঃখ বোধ করছেন তথাপি তিনি আমার কোনো ক্ষতি করতে চান না। প্রথমে যে বন্দরে জাহাজ ভিড়বে সেই বন্দরে তিনি আমাকে নামিয়ে দেবেন। তিনি বললেন জাহাজে উঠে আমি নাবিকদের যে সমস্ত অসম্ভব ও অবিশাস্য কথা বলেছি এবং পরে আমার সিন্দুক বা বাক্স সম্বন্ধে তাঁকেও যা বলেছি তাতেই তার সন্দেহ হয়েছিল। তাছাড়া রাতে আহারের সময় আমার দৃষ্টি ও ব্যবহার লক্ষ্য করেও তাঁর এইরকম ধারণা হয়েছে।

আমি বললুম তাহলে আমার কথা ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। তারপর আমি ইংলণ্ড ছাড়ার পর থেকে তিনি আমাকে জাহাজে তোলা পর্যন্ত যা ঘটেছিল সেই কাহিনী তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বললুম। মানুষের যুক্তিবাদী মন সত্য মিথ্যা বুঝতে পারে। জাহাজের ক্যাপটেন যোগ্য ও সৎ এবং তিনি শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি আমার কাহিনী বিশ্বাস করলেন।

আমার কাহিনীর কিছু প্রমাণ দেবার জন্যে আমি তাঁকে অনুরোধ করলুম যে, আমার ক্যাবিনেটটি এই কেবিনে আনার ব্যবস্থা করতে যার চাবি আমার পকেটেই আছে। নাবিকেরা আমার বাক্সর কি দুর্দশা করেছে সে কথা তিনি আমাকে আগেই বলেছিলেন।

আমি বললুম আমার কথা ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে

ক্যাবিনেট আনা হলে আমি সে দেশে যে সব দুর্লভ সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলুম সেগুলি তাঁকে দেখাতে লাগলুম। সৌভাগ্যক্রমে আমি সেগুলি আমার ছোট বাক্স-ঘরের ক্যাবিনেটেই রেখেছিলুম। মহারাজার দাড়ি কেটে যে চিরুণি করেছিলুম এবং মহারাণীর বুড়ো আঙুলের কাটা নখে মহারাজার দাড়ি বসিয়ে যে আরেকটা সব আমি ক্যাপটেনকে দেখালুম। তারপর ছুঁচ ও পিনের সংগ্রহ ছিল যা এক একটা এক ফুট থেকে দেড় ফুট লম্বা। বোলতার চারটে হুল জুড়ে একটা ছোট যন্ত্র। মহারাণী একদিন আমাকে একটা সোনার আংটি উপহার দিয়েছিলেন, হাসতে হাসতে সেটা আবার তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ সেটা তার কড়ে আঙুলের আংটি, তাও দেখালুম। ক্যাপটেন আমার প্রতি যে ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখিয়েছেন তার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আংটিটা আমি ক্যাপটেনকে উপহার দিতে চাইলুম। কিন্তু তিনি নিতে রাজী হলেন না।

মহারাণীর একজন সহচরীর পায়ের আঙুলের একটা কড়া আমি কেটেছিলুম, এই যে সেই কড়াটা, দেখেছেন কত বড়। এটা ক্রমশঃ শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আমি যখন ইংলণ্ডে পেঁছিব তখন এটা আরও শক্ত হবে। আমি তখন এটা দিয়ে একটা বাটি বানিয়ে রূপো দিয়ে মুড়ে দোব।

অবশেষে আমি যে ব্রিচেশ পরে আছি সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম, তাঁকে বললুম এই ব্রিচেশ ও দেশের ইঁদুরের চামড়ার তৈরি। গ্লামডালক্লিচের একজন

ভৃত্যের একটি দাঁত আমার কাছে ছিল। একজন আনাড়ি ডাক্তার তার যন্ত্রণাদায়ক দাঁতটা তুলতে গিয়ে ভাল দাঁত তুলে ফেলেছিল। আমি সেই দাঁত পরিষ্কার করে আমার কাছে রেখে দিয়েছিলুম। দাঁতটা এক ফুট লম্বা এবং বেড় চার ইঞ্চি। দাঁতটার প্রতি ক্যাপটেন কৌতূহল প্রকাশ করতে থাকায় সেটা আমি তাকে উপহার দিলুম। তিনি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে সেটি নিজের কাছে রাখলেন।

ক্যাপটেন আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং আমাদের উভয়ের সম্পর্ক নিবিড় হল। তিনি আমাকে বললেন যে আমি ইংলন্ডে ফিরে আমার এই অভিজ্ঞতা সংবাদ-পত্র মারফত যেন পৃথিবীকে জানিয়ে দিই। আমি বললুম ভ্রমণের বই প্রচুর আছে, এত বেশি যে আমরা সব বই পড়ে উঠতে পারি না এবং নতুন যে বই লেখা হবে তা অসাধারণ না হলে কেউ পড়বে না। তবে কিছু ভ্রমণকারী বা লেখক এমন কাহিনী লিখেছেন যা তিনি নিজে দেখেন নি বা অতিরঞ্জিত করেছেন। আমি বললুম আমার অভিজ্ঞতার বিষয় নতুন করে কি আর লিখতে পারি? অন্যান্য ভ্রমণকারীর মতোই আমিও বিভিন্ন দেশের মানুষজন, গাছপালা, পশুপাখি, রীতিনীতি, অসভ্যদের মূর্তিপূজা, এই সবই ত দেখেছি। এসব বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন। ক্যাপটেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম আপনি যখন বললেন তখন আমি ভেবে দেখব।

ক্যাপটেন আমাকে বললেন, একটা জিনিস ভেবে তিনি অবাক হচ্ছেন যে আমি এত জোরে কথা বলছি কেন? সে দেশের রাজা ও রাণী কি কানে কম শুনতেন? আমি বললুম গত দু' বছর ধরে জোরে কথা বলে বলে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। রাজা ও তার প্রজাদের কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক ও শ্রুতিমধুর, তাঁরা আমার সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলতেন তাই আমি শুনতে পেতাম বেশ ভালভাবেই। কিন্তু ওদেশে আমি যার সঙ্গে কথা বলতুম আমার মনে হত সে বুঝি কোনো রাস্তার ধারে উঁচু বাড়ির চুড়োয় বসে আছে, তারা এত লম্বা ছিল। আমাকে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে তাঁরা সামনে চেয়ারে বসলে অথবা আমাকে হাতে করে তুলে না নিলে তাঁরা আমার কথা শুনতে পেতেন না। আরও একটা কথা বলি, সে দেশে সব মানুষ ত বিরাট লম্বা। দু বছর তাদের দেখে দেখে আমার নজরও সেই রকমই হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি যখন বাক্স থেকে বেরিয়ে জাহাজে চারপাশে তাকালুম তখন আপনার নাবিকদের দেখে আমার মনে হচ্ছিল এ কোথায় এলুম! এখানে সব মানুষ তো ক্ষুদ্রকায়! তখন আমার মনে হচ্ছিল এমন বেঁটে মানুষ আমি বুঝি কখনো দেখি নি। ঐ মহারাজার দেশে আমি যখন ছিলুম তখন আমি আয়নায় নিজেকে দেখতে লজ্জা পেতুম কারণ আমার চারদিকে সব বিরাটাকায় মানুষ। তাদের তুলনায় নিজেকে পিপীলিকা মনে হত।

ক্যাপটেন আমাকে বললেন রাতে আহারের সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন আমি যেন অনেক কিছু অবাক হয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে হাসি দমন করতে পারছি না। তখন ক্যাপটেন মনে করেছিলেন আমার মাথার হয়ত কোনো গোলমাল আছে। আমি বললুম, আপনি ঠিক বলেছেন, তবে আমার মাথার কোনো গোলমাল হয় নি।

আসলে ওদেশে সব কিছু বড় বড় আকারের দেখে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই খাবার টেবিলে ডিশ দেখে মনে হল ওটা বুঝি আমাদের তিন পেন্স রূপোলি মুদ্রার চেয়ে বড় নয়। পর্ক-এর ঠ্যাং বুঝি এক গ্রাসেই খেয়ে নেওয়া যাবে। একটা কাপ বুঝি বাদামের খোলার চেয়ে বড় নয়। এই ভাবে আমি ওদেশের মহারাজাদের প্রাসাদের নানা সামগ্রীর সঙ্গে আমাদের নিজেদের নানা সামগ্রীর তুলনা করে ক্যাপটেনকে বললুম এই আমার অবাক হবার ও হাসবার কারণ। মহারাণীর কাছে এবং তাঁর সেবায় আমি বেশ আনন্দেই ছিলুম। তিনি অবশ্য আমার ব্যবহারের জন্যে সব কিছুই মাপ মতো তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চারপাশে যা দেখতুম সেগুলির সঙ্গে আমার নিজস্ব সামগ্রীগুলি ও নিজেকে তুলনা করে আমি নিজে নিজেই হাসতুম। কখনও মনে হত ছোট হওয়াটা বুঝি একটা ত্রুটি।

এতক্ষণে ক্যাপটেন আমার বক্তব্য বুঝলেন এবং মজা করে বললেন আমার চোখ অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু আমার পেট সে তুলনায় ছোট। কারণ সারাদিন উপবাস করার পর রাত্রে যা খেলুম তা যৎসামান্য। তারপর কৌতুকের সঙ্গে বললেন আমার বাক্সটা ঈগল পাখি ঠোঁটে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ও তারপর সেটা অনেক উঁচু থেকে সে জলে ফেলে দিল, এ দৃশ্য দেখবার জন্যে তিনি সানন্দে একশ পাউন্ড খরচ করতে পারেন। এই বিরল ঘটনা ও দৃশ্য ভবিষ্যৎ বংশের জন্যে অবশ্যই লিপিবন্ধ করে রাখা উচিত। তবে তিনি ফেটনের সঙ্গে তুলনা করে যে মন্তব্য করলেন তা আমি ঠিক হজম করতে পারলুম না।

ক্যাপটেন টনকিন থেকে ইংলন্ডে ফিরছিলেন। কিন্তু জাহাজ উত্তর-পূর্বদিকে পথভ্রষ্ট হয়ে ৪৪ ডিগ্রি অক্ষাংশ ও ১৪৩ ডিগ্রি দ্রাঘিমা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। আমি জাহাজে ওঠার দু'দিন পরেই ট্রেড উইন্ডের প্রভাবে এসে আবার সে পথ পেয়ে যায় এবং সেই হাওয়া অনুসরণ করে দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ দিকে গিয়ে নিউ হল্যান্ড বন্দরে নোঙর ফেলে। তারপর নোঙর তুলে পশ্চিমদক্ষিণের পশ্চিমে এবং পরে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে কম্পাসের কাঁটার দক্ষিণ—দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গিয়ে আমরা কেপ অফ গুড-হোপ বন্দরে পেঁছিই। এই সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত সফল হয়েছিল। তবে তার বিবরণ দিয়ে পাঠকদের ধৈর্যের পরীক্ষা করতে চাই না। ফেরার পথেও কয়েকটা বন্দরে ক্যাপটেন জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন। তাজা পানীয় জল ও আহার্য দ্রব্যের জন্য ক্যাপটেন তীরে নৌকো পাঠাতেন কিন্তু আমি জাহাজেই থাকতুম এবং ইংলন্ডে ডাউনস না পেঁছনো পর্যন্ত আমি আর কোথাও নামি নি। আমি দৈত্যপুরী থেকে পলায়নের পর প্রায় ন মাস পরে ১৭০৬ সালের ৩রা জুন দেশের বন্দরে পেঁছলুম। শুল্ক বাবদ আমি আমার মালপত্র জাহাজে ক্যাপটেনের কাছে জমা রাখার প্রস্তাব করলুম। কিন্তু ক্যাপটেন বললেন আমার মাল নামিয়ে নিতে, শুল্ক বাবদ তিনি এক ফার্দিংও নেবেন না। আমরা হৃদ্যভাবে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। আমি তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করালুম তিনি যেন রেডরিফ-এ আমার বাড়িতে আসেন। জাহাজ থেকে নেমে আমি পাঁচ শিলিং দিয়ে একটা বড় ঘোড়া ও পথপ্রদর্শক ভাড়া করলুম। ঐ পাঁচ শিলিং আমি ক্যাপটেনের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলুম।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দু'পাশের বাড়ি, গাছ, মানুষ, গরু, ছাগল সব কিছু দেখে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন লিলিপুটদের দেশে বিচরণ করছি। আমি কি আমার সামনের পথিককে মাড়িয়ে ফেলব নাকি? তাই আমি তাদের হেঁকে বলছিলুম সরে যেতে নইলে ওদের হয়ত আমি মাড়িয়েই ফেলব।

অনেক দিন বাড়ি ছাড়া। বাড়ির খবর আগে নেওয়া দরকার। কিন্তু তখনও আমি নিজেকে দৈত্য ভাবছি তাই যখন একজন ভৃত্য দরজা খুলে দিল তখন রাজহাঁস যেমন তার লম্বা ঘাড় বেঁকিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে, পাছে মাথা ঠুকে যায়, সেই এক ভয়ে আমিও মাথা নিচু করে ঘরে ঢুকলুম। আমাকে আলিঙ্গন করার জন্যে আমার স্ত্রী ছুটে এল আমি তখন হাঁটু মুড়ে প্রায় তার হাঁটুর সমান নিচু হয়েছি। আমার মেয়েও এল আমার আশীর্বাদ নিতে। আমি ত দৈত্যপুরীতে দৈত্যদের মুখ দেখবার জন্যে সর্বদা মাথা তুলে রাখতুম, সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই এই অবস্থায় আমি প্রথমে আমার মেয়েকে দেখতে পাই নি। দৈত্যদের মতো তাকে আমার চোখের কাছে নেবার জন্যে তার কোমর ধরে উঁচু করে তুললুম। ঘরে ভৃত্যরা এবং কয়েকজন বন্ধু ছিল। তখন তাদেরও আমি বামন ভাবছি। আমার স্ত্রীকে বললুম তুমি বুঝি খুব হাত টিপে খরচ করেছো, দেখছি না খেয়েই ছিলে, মেয়েটাও রোগা হয়ে গেছে। আমি এমন ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলুম যে জাহাজের ক্যাপটেনের মতো আমার স্ত্রী ও আর সকলেও ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে আমার মাথায় কিছু গোলমাল হয়েছে। ভিন্ন দেশে থেকে আমার স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছিল, অভ্যাসও পালটে গিয়েছিল।

আমার স্ত্রী ও বন্ধুরা ক্রমশঃ আমার অবস্থা বুঝল এবং আমিও ক্রমশঃ স্বাভাবিক হতে থাকলুম। আমার স্ত্রী আমাকে বলল তোমার আর সমুদ্রে যাওয়া চলবে না কিন্তু আমার মাথার পোকা যখন নড়ে ওঠে তখন স্ত্রী বাধা দিলে আর কি হবে? পাঠক শিগগির জানতে পারবেন কি ঘটল। তবে এই সঙ্গে শেষ হল আমার সমুদ্র-যাত্রার দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

তৃতীয় ভাগ

লাপুটা, বালনিবারবি, লাগনাগ, গ্লাবডাবড্রিব এবং জাপান ভ্রমণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

লেখক তৃতীয় সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। জলদস্যুর হাতে বন্দি— একজন ওলন্দাজের বিদ্বেষ। একটি দ্বীপে তাঁর আগমন! লাপুটা তাঁকে গ্রহণ করল।

বাড়ি ফিরেছি, দশ দিনও হয় নি এমন সময় আমার বাড়িতে এলেন ক্যাপটেন উইলিয়ম রবিনসন, 'হোপওয়েল' জাহাজের কমাণ্ডার, কর্নওয়ালের মানুষ। তিনশ টনের জাহাজখানা বেশ মজবুত। আমি যখন লেভাণ্ট ভ্রমণে গিয়েছিলুম তখন আমি যে জাহাজে ছিলুম তিনি ছিলেন সেই জাহাজের ক্যাপটেন আর আমি সার্জন। আরও একটা জাহাজের আমি সার্জন ছিলুম, সে জাহাজের তিনি ছিলেন মালিক। একজন অধস্তন কর্মচারী অপেক্ষা তিনি আমার সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের মতো ব্যবহার করতেন। আমি দেশে ফিরেছি শুনে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, দীর্ঘদিন অদর্শনের পর একজন বন্ধু যেমন অপর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে। এরপর তিনি মাঝে মাঝে আসতে লাগলেন এবং আমার স্বাস্থ্য আবার ভাল হয়েছে দেখে বেশ আনন্দিত হলেন। তারপর একদিন বললেন, তিনি ইস্ট ইণ্ডিজ যাচ্ছেন। আমি কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছি কিনা তারও খোঁজ নিলেন তিনি। এরপর দু'মাস কেটে গেল এবং একদিন তিনি আমাকে সরাসরি এবং বিনয়ের সঙ্গে বললেন তাঁর জাহাজের সার্জন পদ গ্রহণ করতে আমি রাজি আছি কিনা। আমার অধীনে আর একজন সার্জন থাকবে এবং প্রচলিত বেতন অপেক্ষা আমার বেতন দ্বিগুণ হবে। তিনি আমাকে সঙ্গে নিতে আগ্রহী কারণ তাঁর মতে সমুদ্র বিষয়ে আমার জ্ঞান প্রচুর অন্ততঃ তাঁর সমান সমান। দরকার হলে তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন যেন জাহাজ পরিচালনায় আমারও অংশ আছে।

একেই ত তিনি একজন সৎ মানুষ তার ওপর তিনি অনেক ভাল ভাল কথা বললেন যা শুনে আমি তাঁর প্রস্তাব বাতিল করাতে পারলুম না। যদিও আমি আগে

অনেকবার অনেক বিপদে পড়েছি তবুও সমুদ্র যখন ডাকে আমিও তখন চঞ্চল হয়ে উঠি। একমাত্র বাধা আমার স্ত্রী, তাকে রাজি করাতে হবে, বাড়িতে ছেলেমেয়েরাও আছে। ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত ভেবেই আমি সমুদ্রযাত্রায় যেতে চাই এই অজুহাতে আমি স্ত্রীকে রাজী করালুম।

১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পঞ্চম দিবসে আমরা যাত্রা করলুম এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ বন্দরে পেঁছিলুম ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের এগারো তারিখে। জাহাজের অনেক নাবিক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাদের সুস্থ হবার জন্যে আমরা বন্দরে তিন সপ্তাহ রইলুম। এই বন্দর থেকে আমরা গিয়ে পেঁছিলুম টনকিন বন্দরে। এখানে ক্যাপটেন কিছুদিন থাকবেন কারণ এখানে যে সব মাল তিনি কিনবেন সেগুলি তখনও তৈরি হয় নি, জাহাজে বোঝাই করতে কয়েক মাস সময় লাগবে। চুপ করে বসে থাকা যায় না, ইতিমধ্যে কিছু কাজ ও কিছু আয় করা দরকার। তাই তিনি মাস্তুলওয়ালা পালতোলা ছোট একখানা জাহাজ কিনে কয়েকরকম মাল বোঝাই করলেন। যেসব মাল টনকিনবাসীরা কাছাকাছি দ্বীপগুলোতে বিক্রী করে। সেই জাহাজে তিনি চৌদ্দজন নাবিক ও অন্যান্য কর্মী দিলেন যার মধ্যে তিনজন ছিল স্থানীয় ব্যক্তি। তিনি আমাকে সেই জাহাজের মাস্টার নিযুক্ত করে এবং পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজে টনকিনে থেকে মালগুলির তদারক করবেন।

আমরা সবে তিন দিন পার হয়েছি কি হই নি এমন সময় প্রবল ঝড় উঠল, ঝড়ের তোড়ে জাহাজ পাঁচ দিন ধরে উত্তর—উত্তর-পূর্ব দিকে ভেসে চলল তারপর পূর্ব দিকে। শেষ পর্যন্ত ঝড় থামল বটে কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে বেশ জোর বাতাস বইতে লাগল। দশ দিনের মাথায় দুটো বোম্বেটে জাহাজ আমাদের তাড়া করল। আমাদের জাহাজ মাল ভর্তি তাই দ্রুত গতিতে যেতে পারছিল না আবার নিজেদের রক্ষা করার জন্যে লড়াই করার কোনো ব্যবস্থাও আমাদের ছিল না। বোম্বেটেরা আমাদের পাশে এসে আমাদের থামতে বাধ্য করল।

দুটো জাহাজের বোম্বেটেরা তাদের লোকলস্কর নিয়ে হল্লা করতে করতে আমাদের জাহাজে উঠে পড়ল। ইতিমধ্যে আমার আদেশ অনুসারে আমাদের জাহাজের সব লোক ডেকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। বোম্বেটেদের দয়ামায়া নেই, তারা শক্ত দাঁড় দিয়ে আমাদের মজবুত করে বেঁধে ফেলল। একজন প্রহরীকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা জাহাজ তল্লাস করতে আরম্ভ করল।

দলের মধ্যে একটা ওলন্দাজ ছিল, তার কিছু কর্তৃত্ব আছে বলে মনে হল। যদিও সে দুটির কোনও জাহাজের কমাণ্ডার নয়। আমরা যে ইংরেজ তা সে আমাদের মুখ দেখে চিনতে পেরেছিল। নিজের ভাষায় সে বকবক করছিল আমাদেব নাকি পিঠে পিঠে দু'জনকে একসঙ্গে বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। ওলন্দাজদের ভাষাটা আমি মোটামুটি বলতে পারতুম। আমি তাকে অনুরোধ করে বললুম যে আমরা খ্রীষ্টান এবং প্রোটেস্ট্যাণ্ট, ওদের প্রতিবেশী। ইংলণ্ডের সঙ্গে ওদের দেশ হল্যাণ্ডের

মিত্রতা আছে। অতএব ওর কি উচিত নয় ওর ক্যাপটেনের কাছে আমাদের জন্যে দয়া ভিক্ষা করা? আমার কথা শুনে সে ত ক্ষেপে লাল, উলটে আমাদের শাসাতে

আমার কথা শুনে সে ত ক্ষেপে লাল

লাগল। তারপর বেশ চীৎকার করে সংগীদের জাপানী ভাষায় কি সব বলল কে জানে। তবে ক্রিশ্চিয়ানস শব্দটা বেশ কয়েকবার শোনা গেল।

দুটো বোম্বেটে জাহাজের মধ্যে বড় জাহাজটার ক্যাপটেন ছিল একজন জাপানী যে কিছু ডাচ ভাষা বলতে পারত যদিও ভুল। সে আমার কাছে এসে কয়েকটা প্রশ্ন করল। আমি একেবারে বিনয়ী হয়ে সেগুলোর উত্তর দিলুম। জাপানী ক্যাপটেন বলল, না, আমরা মরব না। আমি তখন যথাসম্ভব কোমর বেঁকিয়ে ক্যাপটেনকে অভিবাদন জানিয়ে সেই ওলন্দাজের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, আমি খুবই দুঃখিত, একজন বিধর্মীর কাছে যে দয়া পেলুম সেটুকু দয়া একজন খ্রীশ্চান ভাইয়ের কাছে পেলুম না। কথাগুলি বলে কিন্তু বোকামি করে ফেললুম এবং অচিরে আমাকে অনুতাপ করতে হল। সেই হিংসুটে ওলন্দাজ ঈশ্বরের ধার ধারে না। সে দুই জাহাজের ক্যাপটেনের কাছে বারবার আমার মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে লাগল এবং বলতে লাগল বদমায়েশটাকে জলে ফেলে দাও। কিন্তু বড় জাহাজের ক্যাপটেন তার কথায় যখন কর্ণপাত করল না তখন সে ব্যাটা আমার ওপর এমন অমানুষিক অত্যাচার চালাতে লাগল যার চেয়ে বোধ হয় মৃত্যু ভাল ছিল। বদমায়েশটা আমার জাহাজের

মাঝিমাল্লাদের দুভাগে ভাগ করে দুই জাহাজে পাঠিয়ে দিল আর আমার জাহাজে নতুন লস্কর নিয়ে এল। তারপর আমাকে করল কি ছোট একটা পালতোলা নৌকায় তুলে, সঙ্গে দিল মাত্র চার দিনের খাবার। তবে সেই জাপানী ক্যাপটেন দয়া পরবশ হয়ে তাঁর নিজের ভাণ্ডার থেকে আরও চার দিনের খাবার দিলেন এবং তিনি কাউকে আমার দেহ সার্চ করতে দিলেন না। আমাকে সেই নৌকোয় সমুদ্রে নামিয়ে দেওয়া হল। ওলন্দাজটা তারপর জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আমাকে শাপশাপান্ত করতে লাগল এবং ওর ভাষায় কুৎসিতম গালাগাল দিতে লাগল।

বোম্বেটেরা আমার জাহাজ পাকড়াও করবার ঘণ্টাখানেক আগে সমুদ্রে আমাদের অবস্থানটা আমি নিরূপণ করেছিলুম। আমরা তখন ছিলুম ৪৬ ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমা এবং ১৮৩ ডিগ্রি অক্ষাংশে। বোম্বেটেদের জাহাজ থেকে কিছুদূরে যাওয়ার পর আমি আমার ছোট দূরবীন দিয়ে চারিদিক পরিদর্শন করতে করতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ দেখতে পেলুম। এই সময়ে অনুকূল বাতাস পেয়ে আমি নৌকোর পাল তুলে দিলুম যাতে নিকটতম দ্বীপটায় গিয়ে নামতে পারি। ঘণ্টা তিনেক যাবার পর আমি সেই দ্বীপে পৌঁছিলুম। দ্বীপটা পাহাড়ে তবে সেখানে পাথরের খাঁজে খাঁজে বেশ কিছু পাখির ডিম পাওয়া গেল। তখন আমি কিছু শুকনো ডালপালা যোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে ডিমগুলোকে সেদ্ধ করে আহার করলুম। ডিম ছাড়া আর কিছু খেলুম না, সঞ্চিত খাবার যতটা পারা যায় বাঁচিয়ে রাখাই ভাল। তারপর একটা বড় পাথরের আড়ালে বেশ কিছু পাতা ও সমুদ্রের শুকনো শ্যাওলা যোগাড় করে মাটিতে পেতে তার ওপর শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুম বেশ ভালই হল। পরদিন আমি কখনও পাল তুলে, কখনও দাঁড় টেনে পরপর কয়েকটা দ্বীপে গেলুম। এই সব সাধারণ বিষয়ের বিবরণ দিয়ে আমি আর পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না তবে এইটুকু বলা উচিত যে পঞ্চম দিনে আমি শেষ দ্বীপটায় পৌঁছিলুম। আগেকার দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এই দ্বীপটা অবস্থিত এবং এর পরে আর কোনো দ্বীপ আমার নজরে পড়ে নি।

আমি যতটা দূরত্ব আশা করেছিলাম, এ দ্বীপ তার চেয়েও অনেক দূরে, পৌঁছতে পাঁচ ঘণ্টা লেগে গেল। নৌকো ভেড়াবার উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করতে করতে প্রায় সব দ্বীপটাই ঘুরতে হল। অবশেষে আমার নৌকো অপেক্ষা তিন গুণ চওড়া একটা খাঁড়ি দেখতে পেয়ে তার ভেতর ঢুকে পড়লুম। দ্বীপটা পাহাড়ে, মাঝে মাঝে ঘাস আর সুগন্ধী কিছু লতা গুল্ম। ডাঙায় নামলুম, ক্ষিধে পেয়েছিল, খাবার বার করে কিছু খেলুম।

একটা গুহা পাওয়া গেল, সেখানে বাকি খাবারটুকু রেখে দিলুম। গুহার এখানে অভাব নেই। পাথরের খাঁজ থেকে বেশ কিছু পাখির ডিম সংগ্রহ করলুম আর সংগ্রহ করলুম সমুদ্রের শুকনো শ্যাওলা আর ঘাসপাতা। এগুলোর ওপর শোয়াও যাবে, জ্বালানও যাবে। (চকমকি, দেশলাই আর আতশী কাঁচ আমার সঙ্গে আছে)। যে গুহাতে আমার খাদ্যভাণ্ডার রেখেছিলুম সেই গুহাতেই আমি সারারাত ঘুমোলুম।

আগুন জ্বালাবার জন্যে যেসব ঘাস, লতাপাতা ও শ্যাওলা যোগাড় করেছিলুম তার ওপরেই শুয়েছিলুম। তবে ঘুম ভাল হয় নি, যদিও ক্লান্ত ছিলুম কিন্তু দুশ্চিন্তার জন্যে ঘুম বারবার ভেঙে যাচ্ছিল। আমি ভাবছিলুম এমন একটা নিষ্ফলা ও নির্জন দ্বীপে আমি কি করে বেঁচে থাকব? হতাশা আমাকে এমন ভাবে চেপে ধরল যে শয্যা ত্যাগ করে উঠতে ইচ্ছে হল না। তবে শেষ পর্যন্ত হতাশা ও আলস্য ছেড়ে আমি যখন গুহার বাইরে আসি দেখি বেলা বেশ এগিয়ে গেছে। আমি পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করলুম। কিন্তু আকাশ থেকে তখন যেন আগুন ঝরছে, সূর্যের দিকে তাকানো যায় না। হঠাৎ সেই তপ্ত সূর্য চোখের আড়াল হয়ে গেল। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ল না, কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল। পিছন ফিরলুম দেখি, বিরাট একটা অস্বচ্ছ বস্তু আমার ও সূর্যের মধ্যে, সেটা দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। সেই বস্তুটা বোধহয় দুমাইল উঁচু হবে, সূর্যকে ছ সাত মিনিট আড়াল করে রইল। অথচ গরম কমল না, আকাশও বেশি কালো হল না, মনে হল যেন পাহাড়ের আড়ালে ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, বিরাট বস্তুটা তার কাছাকাছি আসতে লাগল। বস্তুটা নীরেট, তলভাগ চ্যাপ্টা, মসৃণ এবং সমুদ্রের জল থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে তার ওপর চকচক্ করছে। সমুদ্রের ধার থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে আমি একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিলুম। আমি লক্ষ্য করলুম বস্তুটা আমার সমান্তরাল নীচের দিকে নেমে আসছে। ইংরেজী হিসেবে তার দূরত্ব তখন মাইল খানেক। আমার ছোট দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দেখলুম সেই বস্তুর ওপর লোকজন ওপর নিচে চলাফেরা করছে। জায়গাটা ঢালু মনে হল কিন্তু ওরা কি করছে তা আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম না।

বাঁচবার আকাংখা এবং প্রাণের প্রতি আকর্ষণ আমার মনে আশা জাগাল যে আমি হয়ত এ যাত্রায় এই নিরালা ও দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি পাব। তবে আমি একটা দ্বীপকে আকাশে উড়তে দেখলাম, যে উড়ন্ত দ্বীপে মানুষ রয়েছে। এবং মনে হল তারা নড়তে চড়তে বা কাজকর্ম করতে পারে। তাদের দেখে আমি যে কতদূর বিস্মিত হয়েছি তা পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন না। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমি দার্শনিক মনোভাব মুলতবী রেখে ভাবতে লাগলুম উড়ন্ত দ্বীপটা এখন কি করবে? কারণ আমার মনে হল দ্বীপটা বুঝি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে আরও কাছে এগিয়ে আসতে আমি দেখতে পেলুম উড়ন্ত দ্বীপের গায়ে ধাপ কাটা রয়েছে, মাঝে মাঝে সিঁড়িও রয়েছে যা দিয়ে ওঠা নামা করা যায়। সবচেয়ে নিচের ধাপে দেখলুম কয়েকজন লোক ছিপ ফেলে মাছ ধরছে আর কেউ কেউ তাই চেয়ে দেখছে। আমি আমার মাথার ক্যাপ (হ্যাট অনেক দিন আগেই ছিঁড়ে গেছে) এবং রুমাল ওদের দিকে নাড়তে লাগলুম। দ্বীপটা আরও এগিয়ে আসতে আমি যত জোরে পারলুম চিৎকার করতে লাগলুম। ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে। পরস্পরের মধ্যে ও আমার দিকে তারা আঙুল দেখাতে লাগল। কিন্তু আমার চিৎকারে ওরা কোনো সাড়া দিল না। আমি শুধু দেখলুম চার পাঁচজন মানুষ দ্বীপের মাথার দিকে

দ্রুত ছুটে গেল, একটু পরে তাদের আর দেখা গেল না। আমি সঠিকভাবেই অনুমান করেছিলুম যে কোনো আদেশ জারী করবার জন্যে কেউ তাদের ডেকে পাঠিয়েছিল বোধহয়।

মানুষের ভিড় বাড়তে থাকল এবং আধ ঘন্টার মধ্যে খাড়া দ্বীপ এমনভাবে সোজা হল যে সবচেয়ে নিচের শেষ ধাপ আমার সমান সমান হয়ে গেল। কিন্তু তখনও তা আমার থেকে একশ গজ দূরে। আমি তখন সনির্বন্ধ অনুরোধের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে কথা বলতে আরম্ভ করলুম কিন্তু কোনো উত্তরই পেলুম না। যারা আমার সবচেয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তাদের পরিচ্ছদ দেখে মনে হল ওরা দ্বীপের কেউকেটা হবে। আমার দিকে প্রায়ই দৃষ্টি ফেরাতে ফেরাতে ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল। তারপর একজন ভদ্রভাবে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে আমাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলল, শুনে মনে হল ভাষাটা ইটালিয়ান অতএব আমি ইটালিয়ান ভাষাতে বললুম, ভাবলুম, আমার কথা ওরা বুঝতে পারবে। কিন্তু আমরা পরস্পরের ভাষা কেউ বুঝতে পারি নি তবে ওরা আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছিল, আমি যে বিপদে পড়েছি তাও বুঝতে পেরেছে।

ওরা ইসারা করে আমাকে বলল পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে যেতে। আমি তাই করলুম। উড়ন্ত দ্বীপ যতটা পারল নেমে এল তারপর ওরা সর্বনিম্ন ধাপ থেকে

ওরা আমাকে টেনে তুলে নিল

পুলির সঙ্গে লাগানো আমার দিকে একটা শেকল নামিয়ে দিল। শেকলের নিচে বসবার আসন ছিল আমি সেই আসনে বসে শেকল ধরলুম। ওরা আমাকে টেনে তুলে নিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লাপুটিয়ানদের রসবোধ ও মেজাজের বিবরণ। তাদের বিদ্যার বহর, রাজা ও দরবার, সে দেশে লেখক কি ভাবে গৃহীত হলেন। বাসিন্দাদেরও উদ্বেগ। মহিলাদের বিবরণী।

সেই দ্বীপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ আমাকে ঘিরে ফেলল তবে আমার কাছে যারা ছিল তাদের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ বলে মনে হল। তারা আমাকে দেখে যে রীতিমতো অবাক তা তাদের সব রকম লক্ষণ দেখে বেশ বোঝা গেল। আমিও এমন বিচিত্র মানুষ দেখে কম অবাক হই নি। কি আকারে, কি প্রকারে, কি পোশাকে, কি চেহারায়, এমন মানুষ আমি দেখি নি। তাদের সকলের মাথা ডান দিকে বা বাঁ দিকে হেলানো, একটা চোখ নিজেদের দিকে চেয়ে আছে আর অপর চোখটা আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তাদের পোশাকের ওপর নানারকম ছবি আঁকা রয়েছে যেমন সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্র। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে নানারকম বাদ্যযন্ত্র, যেমন বেহালা, বাঁশি, হার্প, ট্রামপেট, হারপসিকর্ড এবং আরও নানারকম বাদ্যযন্ত্র আঁকা। অনেক বাদ্যযন্ত্র আমরা ইউরোপে দেখিও নি, নামও শুনি নি। ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদিক ওদিক চাইতে এমন কয়েকজন মানুষ আমার নজরে পড়ল যারা ভৃত্য না হয়ে যায় না, তাদের পোশাকেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। তাদের হাতে ছোট লাঠির ডগে বেলুনের মতো ফোলানো ব্লাডার দেখলুম। ঐ ব্লাডারের ভেতর শুকনো মটর দানা নয়ত খুব ছোট ছোট নুড়ি আছে (এটা আমি পরে জেনেছিলুম)। ওদের আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওরা মাঝে মাঝে ঐ ব্লাডার দিয়ে তাদের মুখে ও কানে আঘাত করছে, এর কারণ কি হতে পারে তা আমি ধারণা করতে পারি নি। আমার মনে হল লোকগুলি ভীষণ অন্যমনস্ক বা কল্পনাপ্রবণ, আশেপাশে কি কথাবার্তা বা আলোচনা হচ্ছে, সেদিকে তাদের মন নেই। তাই তাদের বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনতে বা সজাগ করে দিতে ওদের মুখে ও কানে আঘাত করে বলা হচ্ছে ওহে কথা বল বা শোনো।

এই জন্যেই বোধহয় যে সকল ব্যক্তির ক্ষমতা আছে তারা তাদের পরিবারে একজন করে আঘাতকারী বা 'ফ্ল্যাপার' (মূল শব্দটা বুঝি 'ক্লাইমনোল') রাখে। ওরা যখন কারও বাড়ি যায় বা বাইরে যায় তখন ঐ রকম একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিতে ভোলে না। তাই এইসব ভৃত্য বা ফ্ল্যাপারের কাজ হল মনিব যখন কারও সঙ্গে কথা বলবেন তখন তাঁর মুখে ঐ ফোলা ব্লাডার দিয়ে আঘাত করা আর যিনি শুনবেন তাঁর যে কানটি মনিবের দিকে আছে সেই কানে আঘাত করা। মনিব যখন বেড়াতে যাবেন তখনও ফ্ল্যাপার সঙ্গে থাকবে কারণ তখন ত পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে মনিবের কোন জ্ঞান নেই। তিনি কোন চিন্তায় তখন বিভোর কে জানে। তিনি পাহাড় থেকে নিচে পড়েন, কি কোনো খানা খন্দ বা নর্দমায় পড়ে যাবেন কি কোনো থামের সঙ্গে কি মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খাবেন কেউ বলতে পারে না। তাই ফ্ল্যাপার বিপদের আশংকা দেখলেই মনিবের চোখে ফাঁপা ব্লাডার দিয়ে আঘাত করে।

পাঠকদের এই তথ্যটি আগে জানিয়ে না রাখলে তারা পরে আমারই মতো বিভ্রান্ত হতেন, কেন এমন কাণ্ড ঘটে। আমিও প্রথমে ব্যাপারটা ধরতে পারি নি। ধরতে পেরেছিলুম ওরা যখন আমাকে দ্বীপের ওপরে ওদের রাজার কাছে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে নিয়ে যেতে যেতে ফ্ল্যাপাররা মাঝে মাঝে নিজেরাই ভুলে যাচ্ছিল যে আমাকে ওরা কোথায় বা কেন নিয়ে যাচ্ছে। তাই ওরা মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবতে আরম্ভ করছিল, তারপর মনে পড়লে আবার আমাকে নিয়ে চলতে আরম্ভ করছিল। আমার ঘাড় সোজা, ওদের মতো বাঁকা নয়। তারপর আমার পোশাকও অন্যরকম। এসব যেন ওদের খেয়াল থাকত না। পথের মানুষের চেঁচামেচিতে তাদের হয়ত চমক ভাঙত।

অবশেষে আমরা রাজদরবারে উপস্থিত হলুম এবং আমাকে রাজদরবারের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। রাজা সিংহাসনে বসে আছেন, তার দুপাশে কিছু বসে আছেন জ্ঞানী গুণী মানুষ। রাজার সিংহাসনের সামনে মস্ত বড় একটি টেবিল রয়েছে, টেবিলের ওপর ভূ-গোলক, অন্যান্য গোলক, কিছু গাণিতিক ও আমার না-জানা কিছু যন্ত্রপাতি।

রাজা নির্বিকার, তিনি চুপ করে বসে আছেন। আমাকে নিয়ে লোকগুলি দরবারে প্রবেশ করলেন, কিছু গোলযোগও হল কিন্তু রাজার কানে যেন কিছুই গেল না। তখন তিনি একটা সমস্যার সমাধান করছিলেন। গভীর চিন্তায় তাই মগ্ন। সেই সমস্যার সমাধান হতে একটি ঘণ্টা লাগল। আমরাও চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলুম। রাজার দু'পাশে ফাঁপা ব্লাডার হাতে দু'জন ছোকরা ছিল। তারা সর্বদা রাজার দিকে চেয়ে ছিল। যখন তারা বুঝল রাজা সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন তখন তারা রাজার মুখে ও কানে মৃদু আঘাত করল। আমার মতো একজন অদ্ভুত মানুষ যে দ্বীপে এসেছি এবং আমাকে তার দরবারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এ খবর আগে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি এখন তা ভুলে গিয়েছিলেন। এখন তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের দেখে তাঁর সব মনে পড়ল।

তিনি আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে আরম্ভ করতেই একজন আমার ডান কানে ফাঁপা ব্লাডার দিয়ে আঘাত করল। আমি ইসারায় বুঝিয়ে দিলুম যে আমাকে ওভাবে আঘাত করার কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা সর্বদা সজাগ। কিন্তু আমি পরে শুনেছিলুম আমার এই ব্যবহার রাজা ও তাঁর অমাত্যরা পছন্দ করেন নি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন আমি নিম্নস্তরের মানুষ। আমি অনুমান করলুম রাজা আমাকে কিছু প্রশ্ন করলেন। আমি যত রকম ভাষা জানতুম সবরকম ভাষায় উত্তর দিলুম অবশ্য প্রশ্নগুলি না বুঝে শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু অচিরে বোঝা গেল যে আমি যেমন রাজার কথা বুঝি নি তেমনি রাজাও আমার কথা বোঝেন নি। রাজা শুধু বুঝেছিলেন আপাততঃ আমার বিশ্রাম প্রয়োজন তাই তিনি আমাকে তাঁর প্রাসাদে অন্য এক প্রকোষ্ঠে পাঠিয়ে দিলেন। (রাজা অতিথিদের আপ্যায়ন করতে যত্নবান, এমন নাকি তাঁর পূর্ববর্তী রাজারা ছিলেন না)। আমার পরিচর্যার জন্যে দু'জন ভৃত্য নিযুক্ত করা হল। আমার জন্য আহার আনা হল সেই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর চারজন ভদ্রমহোদয় এলেন, এঁদের আমি রাজার কাছে দেখেছি। এঁরা আমার সঙ্গে আহার করে আমাকে সম্মানিত করলেন। আমাদের তিনটি ডিশে দুটি করে পদ দেওয়া হল।

প্রথম দফায় আমাদের দেওয়া হল মাটনের স্কন্ধ, সম-ত্রিকোণ করে কাটা। আর দেওয়া হল বিফ—রম্বস আকারে কাটা, পুডিং দেওয়া হল বৃত্তাকার। দ্বিতীয় পদে এল দু'টি করে হাঁসের মাংস বেহালার আকারে কাটা, সসেজ এবং পুডিং এল বাঁশি ও সানাইয়ের আকারে, ভিল এল তারের যন্ত্র হার্প-এর আকৃতিতে। ভৃত্যেরা আমাদের জন্যে নানা আকারের রুটি কাটতে লাগল, কোনোটা মোচার মতো, কোনোটা নলের মতো আবার কোনোটা প্যারালেলোগ্রাম বা সামন্তরিক। অর্থাৎ সব রুটিগুলো কোনো না কোনো একটা জ্যামিতিক আকারে কাটা হল। খাবার সময় আমি সাহস করে কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলুম, ওদের ভাষায় এসব জিনিসের নাম কি? ভদ্রমহোদয়রা তাঁদের ফ্ল্যাপারের সাহায্যে সানন্দে জিনিস গুলির নাম বলে দিলেন। তাঁরা হয়ত আশা করলেন যে আমি তাঁদের এই কৃতিত্বের প্রশংসা করব যদি আমি তাঁদের ভাষা শিখতে পারি। যাইহক আমি অচিরেই তাঁদের ভাষায় রুটি, জল বা অন্য কিছু চাইতে লাগলুম।

আহার সমাধা হল, সঙ্গীরা বিদায় নিলেন। রাজার আদেশে একজন ফ্ল্যাপারসহ এক ব্যক্তি এলেন। তিনি সঙ্গে কালি, কলম ও কাগজ এবং তিন চারখানা বই এনেছেন। তিনি আমাকে ইসারা করে বুঝিয়ে দিলেন যে দ্বীপের ভাষা শেখাবার জন্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। আমরা আসন গ্রহণ করলুম। প্রথম দিন চার ঘণ্টা ক্লাশ চলল। কাগজে আমি ওপর থেকে নিচে লম্বালম্বি লাইন টেনে বাঁ দিকের ভাগে কয়েকটি সামগ্রীর নাম লিখলুম যা সেই ঘরে ছিল। তারপর শিক্ষককে সামগ্রীগুলি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি তাঁদের ভাষায় সামগ্রী গুলির নাম বলতে লাগলেন। আমি নামগুলি আমার লেখা নামের পাশে কাগজের

ডান দিকে লিখে নিতে লাগলুম। আমি ছোট ছোট কয়েকটা বাক্যও শিখলুম। আমার শিক্ষক মাঝে মাঝে তাঁর ভৃত্যকে আদেশ করছেন, যেমন জল আনতে, দাঁড়াতে বা বসতে অথবা কোনো বই বা সামগ্রী আনতে। আমি সেই আদেশগুলো শুনে কাগজে লিখে ফেললুম। শিক্ষক একখানা বই বার করে তাতে আমাকে সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রের ছবি দেখালেন। তারপর দেখালেন রাশিচক্রের ছবি, পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডল, মেরুদেশ এবং অনেক জ্যামিতিক ছবি। তিনি নাম বলতে লাগলেন আর আমিও সংগে সংগে নাম লিখে নিতে লাগলুম। এরপর তিনি আমাকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেখাতে লাগলেন, আমিও সংগে সংগে তাঁদের ভাষায় নাম লিখতে লাগলুম। পরে তিনি বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাবার কৌশল দেখালেন। তিনি চলে যাবার পর সেদিন যেসব শব্দ শিখলুম সেগুলি আমি বর্ণানুক্রমিক ভাবে খাতায় লিখে রাখলুম এবং সেই সংগে তাদের অর্থ অভিধানে যেভাবে লেখা থাকে। আমার স্মরণশক্তি বোধহয় কিছু প্রখর কারণ এইভাবে আমি কয়েকদিনের মধ্যে তাদের ভাষা মোটামুটি শিখে ফেললুম।

এদের ভাষায় উড়ন্ত বা ভাসন্ত দ্বীপ হল লাপুটা কিন্তু আমি এর শব্দ প্রকরণ বা ইটিমলোজি, বুঝতে পারলুম না। প্রাচীন ও অপ্রচলিত '—লাপ' শব্দের অর্থ উচ্চ এবং 'উনটু' শব্দটির অর্থ শাসনকর্তা। ওরা বলেন মূল শব্দ হল 'লাপুনটু' যা ক্রমে লাপুটা শব্দে পরিণত হয়েছে কিন্তু এই শব্দগঠনটি মেনে নিতে পারলুম না কারণ শব্দটা যেন জোর করে তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁদের জ্ঞানী মনে হল তাঁদের আমি বললুম 'লাপ' শব্দের অন্য অর্থও আছে, সমুদ্রে সূর্যকিরণের নৃত্য। এবং 'আউটেড' শব্দের অর্থ ডানা। দুটি শব্দ জুড়ে যে শব্দ হয় তা আমি জোর করে কারও ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না তবে দুটি শব্দ জুড়ে লাপুটা-এর একটি কাব্যময় রূপ দেওয়া যায়।

আমার পরিচর্যার জন্যে রাজামশাই আমার কাছে যাদের পাঠিয়েছিলেন তারা হঠাৎ আমার বিবর্ণ পোশাক লক্ষ্য করে দর্জি ডেকে পাঠাল। পরদিন সকালে দর্জি এল। আমার পোশাক তৈরির জন্যে দর্জি মাপ নিতে লাগল। এদের পোশাকের মাপ নেওয়ার পদ্ধতি বিচিত্র। ইউরোপে প্রচলিত পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোয়াড্রান্ট যন্ত্রের সাহায্যে দর্জি আমার উচ্চতা মাপল তারপর রুল ও কম্পাসের সাহায্যে আমার সারা দেহটা মেপে ফেলল এবং সব মাপজোক কাগজে লিখে নিল। ছ'দিন পরে যে পোশাক তৈরি করে নিয়ে এল তা দেখে আমার চক্ষুস্থির। কোথায় কি মাপজোকের ভুল করেছে বা কি ভাবে কাটছাঁট করেছে কে জানে। সে পোশাক আমাকে ফিট করল না, যাকে বলে বেঢপ তাই হয়েছে। তবে এদেশে এমন ঘটে থাকে এবং এজন্যে এরা কোনো গুরুত্ব দেয় না। অতএব আমিও তা মনে মনে মেনে নিলুম, যতদিন এদেশে থাকব এরকম হবে ও তা মেনে নিতেই হবে, তাই সই।

আবার নতুন করে পোশাক তৈরি করতে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে আমি উপযুক্ত পোশাকের অভাবে বাইরে যেতে পারছি না এবং আমার শরীরও কিছু খারাপ

হয়েছিল। তাই এই সময়ে আমি আমার শব্দ অভিধান ঝালিয়ে নিতে লাগলুম। ফলে আমি আবার যখন রাজদরবারে গেলুম তখন রাজার কথা বুঝতে ও উত্তর দিতে

আমার সারা দেহটা মেপে ফেলল

আমার কোনো অসুবিধে হল না। রাজামশাই আদেশ দিয়েছেন যে রাজার রাজধানী লাগাডো-এর কেন্দ্র থেকে পূব দিক ঘেঁসে এই দ্বীপ উত্তর-পূব দিকে সরে যাবে। পৃথিবী অবশ্য নিচে থাকবে। অর্থাৎ নব্বুই লিগ পার হয়ে দ্বীপ থামবে। আমরা প্রায় সাড়ে চার দিন উড়ে চললুম। দ্বীপ যে শূন্যে উড়ে চলেছে তা আমি অনুভব করতেই পারি নি। দ্বিতীয় দিন সকালে বেলা প্রায় এগারোটার সময়ে রাজামশাই তাঁর সভাসদ, অমাত্যবর্গ এবং রাজকর্মচারীরা সমবেত হয়ে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র একত্র করে বাজাতে আরম্ভ করলেন। বিরামহীন ভাবে সেই বাদ্যবাদন চলল তিন ঘণ্টা ধরে। বাজনার আওয়াজে আমার কান তখন ঝালাপালা। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কি তা আমি বুঝতে পারি নি। উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বললেন আমার এক শিক্ষক। তিনি বললেন দ্বীপবাসীরা নির্দিষ্ট সময়ে গোলাকার বাদ্যযন্ত্র বাজাতে ও শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু এখন তারা অন্য বাদ্যযন্ত্রেও তাদের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে।

রাজধানী লাগাডো যাবার পথে রাজামশাই আদেশ দিলেন দ্বীপ এই কয়েকটি গ্রাম ও শহরে থামবে। সেসব গ্রামে ও শহরে রাজামশাই প্রজাদের আবেদন গ্রহণ করবেন। এজন্যে কয়েক গাছা দড়ির ডগে ঢিল বেঁধে নিচে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। প্রজারা এই দড়িতে তাদের আবেদন পত্রগুলি পর পর লাগিয়ে দিতে লাগল। ছোট ছেলেরা

যেমন তাদের দড়িতে বা সুতোতে পরপর কাগজ জুড়ে দেয়, এই দাড়িগুলোর চেহারা তখন অনেকটা সেই রকম হল। অনেকে আবার দাড়িতে কিছু খাবার বা সুরাভর্তি বোতলও বেঁধে দিল। তারপর দাড়িগুলি পুলির সাহায্যে টেনে তুলে নেওয়া হল।

অংকয় আমার যে জ্ঞান আছে তার ফলে এদের রচনাশৈলী বা ভাষাতত্ত্ব বুঝতে আমার খুব সুবিধে হত। কারণ এরা কথায় কথায় গণিত বা সংগীতের ব্যবহৃত অনেক শব্দ ব্যবহার করে। অবশ্য সংগীত সম্বন্ধেও আমার কিছু জ্ঞান আছে। কিছু বোঝাতে বা কোনো কিছুর নিন্দা বা প্রশংসা করতে এরা জ্যামিতিক রেখা বা চিত্রের উদাহরণ দেয়। যেমন একজন নারীর রূপের প্রশংসা করতে এরা রম্বস, বৃত্ত, উপবৃত্ত বা প্যারালেলোগ্রামের সঙ্গে তার তুলনা করে। কোনো জন্তুর দৈহিক বর্ণনা দেবার সময় ওরা জ্যামিতির আশ্রয় নেয়। কিংবা সংগীতের রাগ বা সুরের উপমা দেয়। রাজামশাইয়ের রন্ধনশালায় আমি সব রকম বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ দেখেছি। তারা এই সব বাদ্যযন্ত্রের অনুকরণে আহার্য তৈরি করে রাজামশাইয়ের টেবিলে পরিবেশন করে। যেমন ওরা আমাকে দিয়েছিল।

ওদের স্থপতিবিদ্যার প্রশংসা করা যায় না। বাড়িগুলি হতশ্রী। দেওয়ালগুলি এলোমেলো, কোথাও সমকোণ প্রয়োগ করা হয় নি। বাড়ি তৈরির সময় ওরা জ্যামিতির কোনো সাহায্য নেয় না বরঞ্চ যাতে এই বিদ্যা প্রয়োগ করতে না হয় সেই চেষ্টাই করে। কারণ জ্যামিতির ওপর ভিত্তি করে কারিগর বা মিস্ত্রিদের কোনো নির্দেশ দিলে ওরা বুঝতে পারবে না, কাজ খারাপ করে ফেলবে। ওসব জ্যামিতিক বা গাণিতিক বিদ্যা উচ্চতর কাজে, ভাষায়, সাহিত্যে ব্যবহার বা প্রয়োগ করা যায় কিন্তু বাড়ি বা আসবাব তৈরির কাজে নয়। তাই বুঝি ওরা আমার ওরকম বেঢপ জামা তৈরি করেছিল। অথচ ওরা কাগজ পেনসিল এবং ডিভাইডার দিয়ে কত সুন্দর চিত্র বা নকশা নিখুঁতভাবে আঁকতে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন কাজেকর্মে এই বিদ্যায় তারা যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের হাতের কাজের প্রশংসা ত করাই যায় না উপরন্তু অন্য কাজকর্মও ওরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারে না। কিন্তু গণিত ও সংগীতকে ওরা অবহেলা করে না। ওরা যে মতে বিশ্বাসী তার বিরুদ্ধে কোনো মন্তব্য তা সে যতই যুক্তিপূর্ণ হক ওরা স্বীকার করতে রাজি নয়। এরা মোটেই কল্পনাপ্রবণ নয় এমন কি কোনো অলীক কল্পনাকে ভাষা দিয়ে বোঝাতেও পারে না। কোনো কিছু আবিষ্কার করার চিন্তা এবং তা করতেও পারেও না। এমন কি এসব শব্দ ওদের অভিধানে নেই। ওদের জ্ঞান ও কল্পনাশক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ওদের বিজ্ঞান বলতে শুধু জ্যামিতি ও সংগীত।

তবে আর একটা বিদ্যা ওদের জানা আছে। সেটি হল জ্যোতির্বিদ্যা। এই বিদ্যা সম্বন্ধে ওদের অধিকাংশেরই জ্ঞান আছে। কিন্তু এই জ্ঞান প্রকাশ করতে ওরা কুণ্ঠিত। জ্যোতির্বিদ্যা যাদের জানা আছে তারা জ্যোতিষী বিদ্যাতেও পারঙ্গম। এরা তা কিন্তু স্বীকার করতে চায় না, প্রকাশ্যে ত নয়ই। এই বিষয়ে আমি তাদের প্রশংসা

করি। আমি লক্ষ্য করেছি যে সংবাদ ও রাজনীতি সম্বন্ধে তারা খুব সচেতন। সব রকম খবরাখবরে তাদের আগ্রহ আছে রাজ্যের নীতি বা কোনো সিদ্ধান্তের তারা সমালোচনা করে, নিজ মতামত প্রকাশ করে। ইউরোপে গাণিতিকদের মধ্যেও আমি এই প্রবণতা লক্ষ্য করেছি অথচ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও গণিতের মধ্যে আমি কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাই নি। তবে তাঁরা যদি মনে করেন যে একটি ছোট বৃত্ত ও একটি বড় বৃত্তের ডিগ্রি সমান তাহলে তাঁরা ভাবতে পারেন যে কোনো দণ্ডের ওপর রক্ষিত পৃথিবীর একটি গোলককে ঘোরানো এবং রাজনীতি পরিচালনা করা একই ব্যাপার। মানুষের নানারকম দুর্বলতা আছে, সেই দুর্বলতা থেকে নানারকম ধ্যানধারণা ব্যক্তিবিশেষ গঠন করতে পারেন। নানা বিষয়ে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামতো বিচার বিবেচনা করতে পারেন। এ নিয়ে আপাততঃ মাথা না ঘামালেও চলে।

এদেশের মানুষ যেন সর্বদা অশান্তি ভোগ করছে। এক মিনিটের জন্যেও এরা মনকে শান্ত রাখতে পারে না। এমন সব বিষয় নিয়ে এরা অহেতুক চিন্তা করে যার জন্যে অধিকাংশ মানুষ আগ্রহী নয়। মহাশূন্যে গ্রহ নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন হলে এরা বিপদ আশংকা করে। তারা মনে করে পৃথিবী ক্রমশঃ সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কালক্রমে সূর্য পৃথিবীকে গিলে ফেলবে এবং সূর্যও ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হতে হতে একদিন নিবে যাবে। পৃথিবীকে তখন আর সে আলো দিতে পারবে না। গতবার যে ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল তার আঘাত থেকে পৃথিবী খুব বেঁচে গেছে, আর একটু হলেই পৃথিবী ছাইগাদা হয়ে যেত। তবে ওদের ধারণা আর একত্রিশ বছর পরে যে ধূমকেতুটা আসছে তার হাত থেকে পৃথিবীর রক্ষা নেই। পৃথিবী কিভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ওরা তার একটা সম্ভাব্য চিত্র তৈরি করেছে। ওরা বলছে ধূমকেতুটা তার কক্ষপথে আসতে আসতে সূর্যের নিকটতম বিন্দুতে যখন আসবে তখন সে সূর্যের আগুনে তেতে গরম লাল লোহা অপেক্ষা দশ হাজার গুণ বেশি তাপ দেবে। সেই ধূমকেতু তখন তার দশ লক্ষ চৌদ্দ মাইল লম্বা লেজ নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটতে থাকবে। পৃথিবী যদি সেই ধূমকেতুর কেন্দ্র থেকে এক লক্ষ মাইল দূরেও থাকে তবুও তার লেজের আগুনের ঝাপটায় পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। তাছাড়া সূর্য প্রতি মুহূর্তে রশ্মি বিকিরণ করতে করতে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। অথচ তার কোনো পূরণ হচ্ছে না। এইভাবে সূর্য দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সূর্য থেকে পৃথিবী সমেত যেসব গ্রহ আলো পাচ্ছে তারাও একদিন সূর্যের সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এই আশংকায় তারা এতদূরে ভীত যে তারা রাত্রে শান্তিতে ঘুমোতে পারে না, কোনো আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পারে না। সর্বদা ভয় এই বুঝি সব ধ্বংস হয়ে গেল। সকালে কারও সঙ্গে দেখা হলে তাদের প্রথম প্রশ্ন সূর্যের স্বাস্থ্য কেমন আছে, যে ধূমকেতুটা আসছে তার সঙ্গে সংঘাত এড়ানো যাবে কি? কোনো আশা আছে? শিশু বা ছোটছেলেরা যেমন দৈত্যদানা বা ভুতের গল্প শুনে একলা বিছানায় শুতে যেতে ভয় পায় এই দ্বীপের মানুষও ঠিক তেমনি সদা সর্বদা একটা কাল্পনিক আতংকে ভুগছে।

এই দ্বীপের মহিলারা কিন্তু প্রাণবন্ত। তারা তাদের ভীতু স্বামীদের দেখতে পারে না। এজন্যে তারা বিদেশীদের বেশি পছন্দ করে। রাজদরবারের কোনো কাজে, শহর বা পুরসভার কোনো সমস্যা নিয়ে বা ব্যক্তিগত কোনো কাজে নিচের মহাদেশ থেকে সর্বদাই এই দ্বীপে মানুষজন যাওয়া-আসা করছে। তারা এদেশের মানুষদের মত সমান অধিকার দাবি করে। কিন্তু তারা এখানে অবাঞ্ছিত। এই বিদেশীদের মধ্যে যারা সাহসী তাদের এ দ্বীপের মেয়েরা বেছে নেয় এবং বেশ সহজভাবেই এরা মেলামেশা করে। স্বামী হয়ত কাগজ পেনসিল নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে এবং পাশে ফ্ল্যাপার নেই তখন মহিলারা এদের নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়।

পত্নী ও কন্যারা এই দ্বীপে থাকতে চায় না। তারা নিজেদের এই দ্বীপে বন্দী মনে করে, সব সময় বিলাপ করে। অথচ আমার ত মনে হয় তারা পৃথিবীর এক অতি চমৎকার দেশে বাস করছে। দেশটি ধনধান্যে পুষ্পেভরা। সম্পদ উপচে পড়ছে। তারা ত স্বাধীনভাবে যত্রতত্র বিচরণ করে তবু তাদের মন ভরে না কেন? আসলে তারা জগৎটাকে দেখতে চায়। বড় বড় নগরের আনন্দ-সাগরে ডুব দিতে চায়। কিন্তু রাজার বিশেষ একটি অনুমতি পত্র বিনা তারা তা করতে পারে না এবং সেই অনুমতি পত্র পাওয়া সহজও নয়। উচ্চ শ্রেণীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের অভিজ্ঞতায় জেনেছে যে এই দ্বীপ থেকে যে নারী একবার নিচের ঐ জগতে গেছে তারা আর ফিরে আসতে চায় না। আমি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক কন্যার কথা শুনেছি যিনি প্রধান মন্ত্রীর পত্নী ও কয়েকটি সন্তানের জননী। রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ধনী মহিলা হিসেবে তিনি মনোরম একটি প্রাসাদে বাস করতেন। অতিশয় সুন্দরী এই মহিলা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের অজুহাতে একবার রাজধানী লাগাডো শহরে নেমে গিয়েছিলেন কিন্তু তিনি ফিরে আসেন নি। কোথায় যেন আত্মগোপন করেছিলেন। তাঁকে খুঁজে বার করবার জন্যে রাজামশাই সমন জারি করলেন। অনেক খোঁজের পর অবশেষে তাঁকে পাওয়া গেল অতি দীন অবস্থায় একটি সস্তা ভোজনালয়ে। দেহ মলিন, বেশবাস ছিন্নভিন্ন এবং তাও তাঁর নিজের নয়। এক বৃদ্ধ ও বিকলাঙ্গ খিদমতারকে তিনি প্রতিপালন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁরই পাল্লায় পড়ে ও তাকে খাওয়াবার জন্যে মহিলাকে নিজের সমস্ত দামী পোশাক বিক্রয় করতে হয়েছে। স্বামীকে খুব দয়াবান বলতে হবে কারণ তিনি পত্নীকে ফিরিয়ে নিলেন, ভর্ৎসনা করলেন না। কিন্তু সেই মহিলা এক কৌশল অবলম্বন করে তাঁর সমস্ত রত্নালংকার সমেত একদিন আবার সেই নিচেই পালিয়ে গেলেন। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

আমার পাঠকরা জানেন ইউরোপে বা ইংলণ্ডে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু এমন দূর দূরান্তরের দেশেও যে এমন কিছু ঘটে তা তাঁরা হয়ত চিন্তা করতেও পারেন না। কিন্তু ছলনাময়ী নারী সব দেশেই আছে, এটা কোনো দেশ বা জাতির বিশেষত্ব নয়, আবহাওয়ার ওপরও নির্ভরশীল নয়।

মাসখানেকের মধ্যে আমি দ্বীপের ভাষা মোটামুটি শিখে ফেললুম।

রাজামশাইয়ের প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতুম অবশ্য যখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু আমার দেশ বা যেসব দেশে আমি গিয়েছিলুম সেসব দেশের আইন, শাসনব্যবস্থা, ইতিহাস, ধর্ম বা রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না এবং সে বিষয়ে কখনো কোনো প্রশ্নই করতেন না বরঞ্চ তিনি গণিত সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমি উত্তর দিতুম, তবে কোনো গুরুত্ব সহকারে নয় হেলাফেলা করে জবাব দিতুম। এই প্রশ্নোত্তরের সময় রাজামশাইয়ের ফ্ল্যাপার বেশ কয়েকবার তাঁর কানে ও মুখে আঘাত করত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একটি প্রাকৃতিক ঘটনা, আধুনিক পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে যার ব্যাখ্যা ও সমাধান করা গেল। পরবর্তী বিজ্ঞানে লাপুটিয়ানদের ব্যুৎপত্তি। বিদ্রোহ দমনে রাজার কৌশল।

এই দ্বীপে কৌতূহল উদ্রেককারী-অনেক কিছু আছে অনুমান করে আমি দ্বীপটি দেখবার জন্যে রাজামশাইয়ের অনুমতি চাইলুম। তিনি সানন্দে অনুমতি দিলেন এবং আমার শিক্ষককে নির্দেশ দিলেন আমার সঙ্গে থাকতে। দ্বীপটা কি ভাবে চলে বেড়ায় সেইটে জানবার জন্যে আমার আগ্রহ। কি শক্তি বা কৌশল নিহিত আছে এর ভেতর সেটা জানা দরকার। কোন্ অদৃশ্য গতি ও শক্তি দ্বীপটিকে চালনা করছে? আমি যা জানতে পেরেছি তা আমি পাঠকদের জানাব।

এই উড়ন্ত বা ভাসমান দ্বীপটি নির্ভুলভাবে গোলাকার। এর ব্যাসের মাপ হল ৭৮৩৭ গজ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার মাইল, যার মোট জমির পরিমাণ দাঁড়ায় দশ হাজার একর। দ্বীপটি তিনশ গজ পুরু। বিপরীত অর্থৎ নিচের দিকটা, যাকে আমরা তলা বলি সেটা নিচ থেকে দেখলে একটা প্লেটের তলার মতো চ্যাপ্টা মনে হবে। দ্বীপে নানারকম খনিজ আছে আর আছে দশ বারো ফুট গভীর নরম জমি। দ্বীপের উপরিভাগ চ্যাপ্টা সমভুমি নয়, কিনারা থেকে কেন্দ্রের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে ফলে যে শিশির বা বৃষ্টি পড়ে তা ছোট ছোট কয়েকটা নদী বেয়ে মধ্যভাগে কতকগুলো জলা জায়গায় মিলেছে। এইরকম চারটে জলা আছে। জলা গুলো কেন্দ্র থেকে দুশো গজ দূরে এবং প্রতিটার পরিধি মোটামুটি আধ মাইল। দিনের বেলায় সূর্যকিরণ জলার জল শুষতে থাকে যার জন্যে জলা থেকে জল কখনও উপছে পড়ে না। রাজা মশাইও ইচ্ছেমতো দ্বীপটাকে মেঘ বা বাষ্পমণ্ডলের ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এবং তার দ্বারা দ্বীপে শিশিরপতন বা বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মেঘ কখনও দু' মাইলের ওপরে উঠতে পারে না। এদেশের বিজ্ঞানীরা তাই বলেন। অন্ততঃ এদেশে কখনও তার ওপরে ওঠেনি।

দ্বীপের মধ্যস্থলে একটা বেশ বড়সড় খাদ আছে যার ব্যাস পঞ্চাশ গজ। এই খাদে একটা গম্বুজ আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খাদে নেমে গম্বুজে প্রবেশ করে। গম্বুজটা একশ গজ নিচে। এটাকে ওরা বলে—ফ্ল্যানডোনা গ্যাগনোল অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গুহা। এই গুহায় কুড়িটা বাতি নিরন্তর জ্বলছে। বাতিগুলি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে চতুর্দিক আলোকিত করে। এই স্থানে জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় এমন নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি আছে যথা—কয়েক প্রকার সেক্সট্যান্ট, কোয়াড্রান্ট, টেলিস্কোপ, অ্যাস্ট্রোলেব ইত্যাদি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক হল মস্ত বড় একটি চুম্বক যার ওপর দ্বীপের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। চুম্বকটি দেখতে অনেকটা তাঁতে ব্যবহৃত মাকুর মতো। চুম্বকটি লম্বায় ছয় গজ ও এর সবচেয়ে পুরু জায়গাটা তিন গজেরও বেশি। চুম্বকটি একটি অতিশয় মজবুত দণ্ডের ওপর দৃঢ় ভাবে রক্ষিত। এই দণ্ডের ওপর একে সহজে ঘোরানো গেলেও স্থানচ্যুত করা প্রায় অসম্ভব। চুম্বকটি চারদিকে বেড়া দিয়ে উত্তমরূপে সুরক্ষিত। এই চুম্বকটির সাহায্যেই দ্বীপটিকে ওপর নিচে করা যায় কিংবা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। চুম্বকটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্বীপটিকেও ইচ্ছামতো যে কোনো দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। রাজামশাই তাঁর রাজত্ব পরিদর্শনের জন্যে চুম্বকের মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দ্বীপটিকে অভীষ্ট দেশে নিয়ে যেতেন।

রাজামশাইয়ের সাম্রাজ্য যে দেশগুলোর ওপর অবস্থিত চুম্বকটি সেই দেশগুলিকে তার এক মাথা দিয়ে আকর্ষণ করে আর এক মাথা দিয়ে বিকর্ষণ। যে মাথাটি আকর্ষণ করে তাকে নীচের দিকে রেখে চুম্বক পাথরটাকে তার দণ্ডের ওপর সোজাসুজি রাখলে দ্বীপটি একেবারে নীচে নেমে আসে। আবার বিকর্ষণের মাথাটিকে নীচের দিকে নামালে দ্বীপটি সোজা ওপরে উঠে যায় অর্থাৎ চুম্বকটিকে যদি নীচের দেশ গুলোর সমান্তরাল রাখা হয় তাহলে দ্বীপটিও সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। এইভাবে দ্বীপটিকে উড়িয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়।

কিভাবে দ্বীপটিকে পরিচালনা করা হয় তার একটা বিবরণ এখানে দিলুম।

A-B যদি বালনিবারবি সাম্রাজের মাঝখান দিয়ে কল্পিত একটি সরল রেখা হয় তাহলে d-c চুম্বক পাথর। d হল বিকর্ষণ ও c হল আকর্ষণের দিক। লাপুটা C কে বোঝাচ্ছে। এখন চুম্বক পাথরটি যদি d-c অবস্থানে থাকে অর্থাৎ বিকর্ষণের দিকটা তখন নীচে, তাহলে এই দ্বীপ আড়াআড়ি ভাবে Dর দিকে উঠে যাবে। সেখানে পৌঁছে আকর্ষণের দিকটাকে যদি Eর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দ্বীপটি আড়াআড়ি ভাবে Eতে পৌঁছুবে। এবার যদি চুম্বকটিকে ঘুরিয়ে EF এর দিকে রেখে তার বিকর্ষণের মাথাটিকে নীচের দিকে করা হয়, তাহলে দ্বীপটি আবার আড়াআড়ি ভাবে F এর দিক উড়ে যাবে।

এইভাবে আকর্ষণের মাথাটিকে G র দিকে ঘোরালে দ্বীপটি Gর দিকে চলতে থাকবে। তেমনি G থেকে H এর দিকে যেতে হলে চুম্বকটিকে ঘুরিয়ে তার বিকর্ষণের মাথাটিকে নীচের দিকে করতে হবে। এই হল দ্বীপটিকে ওড়ানোর কায়দা। অর্থাৎ

এই ভাবে প্রয়োজন মত চুম্বকের মাথার অবস্থা পরিবর্তন করে দ্বীপটিকে আড়াআড়ি ভাবে ওঠানো নামানো যায়। আর এই ভাবেই একবার কোনাকুনি বহু ওপরে উঠে
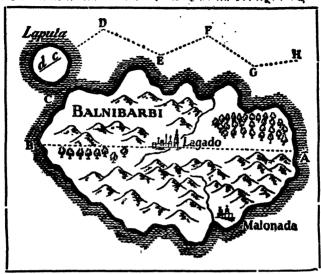
আবার কোনাকুনি নীচে নেমে সাম্রাজ্যের যে কোন জায়গায় উড়ে যাওয়া যায়। এই কোনাকুনি গতির জন্য হিসাবের কোন গোলমাল হয় না।

লক্ষণীয় যে রাজামশাইয়ের সর্বনিম্ন যে রাজত্ব ছিল তার নিচে বা ওপরের দিকে চার মাইলের বেশি দ্বীপটিকে নিয়ে যাওয়া যায় না। চুম্বক পাথরটির গুণাগুণ বিচার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দ্বীপের সীমাবদ্ধ গতিবিধির বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন। চুম্বক যত বড়ই হক তার আকর্ষণ শক্তি সীমাবদ্ধ এবং মাটির ভেতরে নিহিত খনিজ পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাই সীমার মধ্যে দ্বীপটিকে ইচ্ছামতো পরিচালনা করতে পারলেও সীমার বাইরে দ্বীপের ওপর রাজামশাইয়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। চুম্বকটিকে যখন দিকচক্রবালের সঙ্গে সমান্তরাল রাখা হয় দ্বীপটিও তখন সমান্তরাল ভাবেই শূন্যে ভাসতে থাকে।

কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী চুম্বকটির তদারক করেন এবং রাজার নির্দেশ অনুসারে তারা চুম্বকের মুখ ঘুরিয়ে দ্বীপটিকে পরিচালিত করেন। ঐসব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদি দেখে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এজন্যে তারা যে সব দূরবিন ব্যবহার করেন তা আমাদের দেশে ব্যবহৃত দূরবিন অপেক্ষা সেরা। তাদের সবচেয়ে বড় দূরবিনটি তিন ফুটের বেশি বড় নয়। কিন্তু কোনো গ্রহকে বর্ধিত আয়তনে দেখাবার ক্ষমতা এই তিন ফুট দূরবিনের যা আছে আমাদের একশতটি দূরবিন একত্রিত করলেও তা এর সমান হবে না। তাছাড়া এদের দূরবিনে নক্ষত্র আরও স্পষ্ট দেখা যায়। ইউরোপে আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশে যত দূরে পর্যন্ত গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কার করতে পেরেছেন এরা তার চেয়ে অনেক বেশি দূরে

এগিয়ে গেছেন। এরা দশ হাজার স্থির নক্ষত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। কিন্তু আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর এক তৃতীয়াংশ নক্ষত্রের তালিকা তৈরি করতে পারেন নি।

এরা দুটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্র বা উপগ্রহ আবিষ্কার করেছেন যারা মঙ্গল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। মঙ্গল গ্রহের যে ব্যাস তার তিন গুণ দূরত্বে থেকে ভেতরের উপগ্রহটি এবং বাইরের উপগ্রহটি পাঁচ গুণ দূরত্বে থেকে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করছে। প্রথমটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় দশ ঘন্টা এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বাইরের উপগ্রহটি সময় নেয় সাড়ে একুশ ঘন্টা। এই সময়ের বর্গমূল হিসাব করলে মহাকর্ষ শক্তি যে সর্বত্র নির্দিষ্ট তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরা তিরানব্বুইটি বিভিন্ন ধূমকেতু আবিষ্কার করেছেন এবং তাদের আবর্তন সময়ও সঠিকভাবে নির্ধারণ করেছেন। যদি সত্যি তাই হয় (ওরা অবশ্য দৃঢ়ভাবে তা স্বীকার করে) তাহলে এই সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থে প্রকাশ করা উচিত। কারণ ধূমকেতুর আনাগোনা সম্বন্ধে আমাদের হাতে যেসব তথ্য আছে তার ওপর সর্বদা নির্ভর করা যাচ্ছে না। অতএব এদের গণনা পেলে পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপকার হবে এবং একটা সামঞ্জস্য আনা যাবে।

রাজামশাই যদি তাঁর একান্ত অনুগত সর্বদলীয় একটি মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে পারেন তাহলে তিনি তাঁর সারা রাজ্যের একমাত্র অবিসংবাদিত রাজা বলে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু নিম্নে অবস্থিত কোনো কোনো দেশ মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে অনিচ্ছুক কারণ তারা জানে আজকের প্রিয় মন্ত্রী কাল বিতাড়িত হয়, মন্ত্রীত্বের কোনো স্থায়িত্ব নেই।

ঐসব দ্বীপের কোনো শহর যদি বিদ্রোহ করে বা রাজামশাইকে প্রাপ্য কর দিতে অস্বীকার করে তাহলে রাজামশাই দুটি প্রক্রিয়া দ্বারা তাদের দমন করেন। প্রথম এবং মৃদু প্রক্রিয়াটি হল তিনি তার নিজস্ব দ্বীপকে উড়িয়ে ঐ শহরের ওপর নিয়ে এসে তাদের ওপর রোদ বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। ফলে দেশে অজন্মা দেখা দেয়, মহামারীও হয়। এতেও যদি তারা বশ্যতা স্বীকার না করে তাহলে রাজামশাই ঐ শহরের ওপর বিশাল বিশাল পাথর নিক্ষেপ করবার আদেশ দেন। যার বিরুদ্ধে ওদের আত্মরক্ষা করার কোনো উপায় নেই। তারা তখন তাদের বাড়ির কিংবা মাটির নিচের ঘরে অথবা গুহায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু এভাবে আশ্রয় নিলে বা লুকোলে কি হবে, পাথর বৃষ্টির ফলে বাড়ির ছাদগুলি ভেঙে যায়।

এতেও যদি সেই শহর বাসীরা জব্দ না হয় তখন রাজামশাই নিজের দ্বীপটিকে নীচে নামিয়ে এনে সেই শহরের ওপর স্রেফ চেপে বসেন। ফলে বাড়ির মানুষ সবই চাপা পড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে যায়। সেই সঙ্গে মানুষও মরে দলে দলে। রাজামশাই এরকম শাস্তিবিধান সহজে বা একেবারেই করতে চান না কিন্তু যখন সব উপায় ব্যর্থ হয় তখন তিনি নিরুপায় হয়েই এই পথে অগ্রসর হন। মন্ত্রীরাও এমন পরামর্শ রাজামশাইকে দিতে সাহস করেন না। কারণ অনেক মন্ত্রী নিচের দেশ থেকে আসেন।

অতএব তাঁরা নিজের দেশে অপ্রিয় হতে বা নিজের দেশকে ধ্বংস করতে চান না। কিন্তু এ দেশের রাজারা কঠোর দন্ড বিধান দিতে নিজেদের সবসময় নিরত রাখেন। কেন, তারও একটা গুরুতর কারণ আছে। অবশ্য চরম অবস্থায় না এলে দন্ড দেবার প্রশ্নই ওঠে না। যদি সে অবস্থা আসে তখন ভাবতে হয় দন্ড দেওয়া হবে কি হবে না।

বিপদ অন্যত্র। যে শহরকে দন্ড দেওয়া হবে কিংবা যাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে সেই শহরের ওপর উড়ন্ত দ্বীপ নামিয়ে আনার আগে দেখতে হয় সেই শহরে খাড়া চূড়োওয়ালা কোনো পাহাড় আছে কি না। কিংবা ছুঁচলো গম্বুজওয়ালা কোনো উঁচু বাড়ি আছে কি না। থাকলে চরম বিপদ ঘটতে পারে। দ্বীপটা যদি তাড়াতাড়ি নেমে আসে তাহলে দ্বীপের তলদেশে আঘাত লেগে বিরাট ক্ষতি হতে পারে। যদিও দ্বীপটি দুশো গজ পুরু তবুও কোনো জায়গায় যদি ফাটল ধরে এবং সেই অবস্থায় সে যদি আরও নিচে নেমে এমন একটা বাড়িতে পড়ে যে বাড়ির উনুনে আগুন জ্বলছে তাহলে দ্বীপটি ফেটে যেতে পারে। ঠিক যেমন আমাদের দেশে লোহা ও পাথর নির্মিত চিমনি আগুনের তাপে ফেটে যায়। দ্বীপের এই দুর্বলতা সম্বন্ধে জনগণ ওয়াকিবহাল। তাহলেও তারা সতর্ক থাকে তাদের অপরাধ যেন সীমাহীন না হয়।
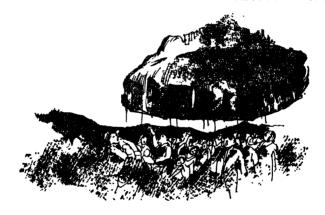
দ্বীপটিকে নামিয়ে এনে সেই শহরের ওপর স্রেফ চেপে বসেন

যাতে দ্বীপে নামিয়ে এনে তাদের ধনপ্রাণ যেন ধ্বংস করা না হয়। কারণ প্রত্যেক শহরে ত আর পাহাড় বা উঁচু বাড়ি নেই। ভয় দেখাবার জন্যে কোনো কোনো শহরের ওপর ধীরে ধীরে দ্বীপ নামিয়ে আনা হয়েছে। তবে কখনও শহরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। কারণ বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে দ্বীপে জোরে আঘাত লাগলে চুম্বক ভেঙে যেতে পারে। চুম্বক ভেঙে গেলে সমূহ সর্বনাশ। সমস্ত দ্বীপটাই ভেঙে পড়বে।

এই রাজ্যের মৌলিক আইন অনুসারে রাজামশাই এবং দুই জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দ্বীপ ত্যাগ করে কোথাও যেতে পারেন না এবং রাণী যতদিন পর্যন্ত সন্তানের জন্ম দেবার বয়স না পার হচ্ছেন ততদিন তিনিও দ্বীপের বাইরে যেতে পারবেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লেখক লাপুটা ত্যাগ করলেন। তাঁকে বালনিবারবি পেঁছে দেওয়া হল। সেখানকার বড় নগরে তিনি গেলেন। নগর এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বর্ণনা। একজন মহামান্য ব্যক্তি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। সেই মহামান্য ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন।

এই দ্বীপে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা না হলেও আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে আমার এমন মনে হয়েছে যে এরা আমাকে অবহেলা করে এবং সেই সঙ্গে কিছু ঘৃণা। এর কারণ হল এই যে এই দ্বীপবাসীদের কেবলমাত্র গণিত ও সংগীত ব্যতীত আর কোনো শাস্ত্রে উৎসাহ নেই এবং এই দুই শাস্ত্রেই আমার চেয়ে এদের জ্ঞান বেশি। তাই এরা আমাকে তুচ্ছ মনে করে।

অপর দিকে এই দ্বীপে দ্রষ্টব্য যা কিছু ছিল সব আমার দেখা হয়েছে, এবং এই দ্বীপের মানুষজনের সঙ্গ আর আমার ভাল লাগছে না। সেইজন্য আমি ঠিক করলুম দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব। আমি এদের তুল্য না হলেও এরা যে দুটি বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং যে জন্যে এরা আমার শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সেই দুটি বিষয়ে এদের প্রচণ্ড শুচিবায়ুগ্রস্ত দেখে আমার মনে বিরক্তি ধরে গেল। তখন এদের আর সহ্য করা যায় না। এজন্যে আমি এদের সঙ্গ এড়িয়ে কেবলমাত্র মহিলা, ব্যবসায়ী ও ফ্ল্যাপারদের সঙ্গে কথা বলতাম। এদের কোনো প্রশ্ন করলে তবু কিছু যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাওয়া যেত।

কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমি এদের ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি, ওদের কথা ও মনোভাব বুঝতে শিখেছি অতএব যে দেশে আমি অবহেলা ব্যতীত আর কিছু পাই নি সেই দ্বীপ আমি প্রথম সুযোগেই ত্যাগ করা স্থির করলুম।

রাজদরবারে একজন মহামান্য ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে আমি লর্ড বলে সম্বোধন করব। রাজার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আছে এবং সেই সূত্রে রাজসভায় তাঁর কিছু মর্যাদা ছিল। আত্মীয় বলেই ঐ মর্যাদা নচেৎ লর্ডকে ওরা নির্বোধ ও অজ্ঞ মনে করত।

অন্তত নিজেদের সমকক্ষ জ্ঞানি বলে মনে করত না। অথচ তিনি দেশ ও রাজা-মশাইয়ের জন্যে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন এবং তাঁর যথেষ্ট স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে। ব্যক্তিত্বও আছে তবে সংগীত তিনি ভাল বোঝেন না। সংগীরা বলে উনি গান বাজনার সময় একেবারে বেতালা। সংগীতের মতো গণিত বিদ্যাতেও তিনি দুর্বল। এই শাস্ত্রটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। শিক্ষকরা অনেক চেষ্টা করেও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। তথাপি তিনি বহু সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন এবং অনুগ্রহ করে তিনি সেসব আমার কাছে উল্লেখ করেছেন। অনুগ্রহ করে তিনি আমার বাসগৃহেও এসেছিলেন এবং তখন ইউরোপের আইন রীতিনীতি আচরণ ও শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাইলেন। ইউরোপ ব্যতীত আমি অন্য যেসব দেশে গেছি সে দেশগুলি সম্বন্ধেও তাঁর আগ্রহ কম নয়। আমার কথা তিনি অত্যন্ত মন দিয়ে শুনলেন। মাঝে মাঝে মন্তব্য ও প্রশ্নও করছিলেন। আমিও যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছিলুম। তাঁর জন্য রাজদরবার থেকে দু'জন ফ্ল্যাপার নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র রাজদরবার কিংবা বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া তিনি তাদের সাহায্য নিতেন না। আমি ও লর্ড যখন একা থাকতুম তখন তিনি ফ্ল্যাপারদের অন্যত্র সরিয়ে দিতেন।

আমি এই মহামান্য ব্যক্তিকে অনুরোধ করলুম যে তিনি যেন আমার রাজামশাইকে একটু বলেন যাতে আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারি। তিনি যেন দয়া করে তার ব্যবস্থা করে দেন। আমার জন্যে মনে মনে দুঃখ বোধ করলেও রাজামশাইকে তিনি বলেছিলেন। রাজামশাই অনুমতি দিলেন তবে খুব দুঃখের সংগে। তিনি বেশ কয়েকটি লোভনীয় শর্তে আমাকে দ্বীপে থাকতে বলেছিলেন কিন্তু আমি রাজি হই নি। আমার জন্যে তিনি যা কিছু করছেন সেজন্যে আমি তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলুম।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে আমি রাজামশাই ও তাঁর দরবারের কাছ থেকে বিদায় নিলুম। ব্রিটিশ মুদ্রার সমতুল্য দুই শত পাউন্ড অর্থ তিনি আমাকে দান করলেন। আমার সেই কল্যাণকামী লর্ডও আমাকে অনুরূপ অর্থ দিলেন এবং যে দেশে যাচ্ছি সে দেশের প্রধান নগর লাগাডোতে একজন বন্ধুর কাছে পরিচয় পত্র লিখে দিলেন। দ্বীপটি তখন লাগাডোর একটি পাহাড়ের মাত্র দুই মাইল ওপরে চক্কর দিচ্ছিল। আমি যেভাবে এই উড়ন্ত দ্বীপে প্রথম উঠেছিলুম আমাকে ঠিক সেইভাবে অন্য দেশে নামিয়ে দেওয়া হল। শুধু ওঠার পরিবর্তে নামা।

উড়ন্ত দ্বীপের রাজামশাইয়ের অধীনে এই দেশটি, অর্থাৎ যেখানে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হল তার প্রচলিত নাম বালনিবারবি এবং এর প্রধান নগরটির নাম লাগাডো যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সে দেশে অবতরণ করে আমি বিশেষ সন্তোষ লাভ করলুম। আমি শহরের রাস্তা দিয়ে ওদেশের নাগরিকের মতোই চলতে লাগলুম। আমার পরিধানের পোশাক ছিল ওদেশের মানুষের মতোই। তাই ওরা আমাকে আলাদা ভাবে চিনতে পারে নি। এদের ভাষাও এখন আমি মোটামুটি জানি। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল আমি যেন এদেশের মানুষের সংগে কথা বলি। যে

ব্যক্তির নামে লর্ড আমাকে পরিচয় পত্র লিখে দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হল না। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে সাদরে গ্রহণ করলেন। এই মহানুভব ব্যক্তির নাম মুনোডি, তিনি তাঁরই বাড়িতে আমার থাকবার জন্যে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ঐখানেই বাস করতে লাগলুম। মহানুভব মুনোডি আমার যত্নের কোনো ত্রুটি রাখেন নি।

পরদিন সকালে তিনি আমাকে তাঁর চ্যারিয়টে তুলে শহর দেখাতে নিয়ে চললেন। শহরটি লন্ডনের অর্ধেক। বাড়িগুলি অদ্ভুতভাবে নির্মিত। দেখলাম অধিকাংশ বাড়িই মেরামত করা প্রয়োজন। পথ দিয়ে, পথিকরা দ্রুত হেঁটে চলেছে, দেখে মনে হচ্ছে তারা বিভ্রান্ত, দৃষ্টি স্থির। কিন্তু অধিকাংশেরই পরিধেয় জীর্ণ। শহরের একটি তোরণ অতিক্রম করে আমরা দেশের তিন মাইল ভিতরে প্রবেশ করলুম। এখানে গ্রামাঞ্চলে দেখলুম বহু শ্রমিক কয়েক প্রকার যন্ত্র নিয়ে জমিতে কাজ করছে। কিন্তু কি কাজ করছে তা আমি বুঝতে পারলুম না এবং কোনো প্রকার শস্য বা ঘাস আমার নজরে পড়ল না। অথচ আমার ত মনে হল এ দেশের জমি বেশ উর্বর। শহরে ও গ্রামে সদা কর্মচঞ্চল মানুষদের দেখে আমি মনে মনে তাদের প্রশংসা করি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার সঙ্গী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারি না যে এতগুলি মাথা ও হাত এবং মুখ শহরে ও গ্রামে যে এত পরিশ্রম করছে, তারা কি উৎপাদন করছে বা কি ফল লাভ করছে? তা ত আমি দেখতে বা বুঝতে পারছি না। একটা ক্ষেতে আমি কোনো মানুষকে এভাবে নিষ্ফলা পরিশ্রম করতে দেখি নি। আর কোনো বাড়ি আমি এমন অবহেলায় নির্মিত হতেও দেখি নি এবং তাও যদি বা হল ত এগুলি মেরামত করা হয় নি কেন? তার ওপর মানুষগুলির এমন দৈন্য দশা কেন?

মুনোডি মহোদয় একজন উচ্চ কোটির মানুষ। তিনি কয়েক বছর লাগাড়ো শহরের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু কয়েকজন মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অযোগ্যতার অভিযোগে তাঁকে অপসারিত করা হয়। যাই হক রাজামশাই তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন, যদিও তিনি মনে করতেন মুনোডি মহোদয় সুবিবেচক নন।

আমি এই দেশ সম্বন্ধে আমার মনোভাব সোজাসুজি ব্যক্ত করলুম। তিনি আমার কৌতূহল নিবৃত্ত না করে বললেন যে আমি এদেশে সবেমাত্র এসেছি অতএব এত দ্রুত কিছু মন্তব্য করা ঠিক নয়। ভিন্ন জাতির সমাজ রীতিনীতি সবকিছু পৃথক হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা যখন তাঁর প্রাসাদে ফিরে এলুম তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন বাড়িগুলি আমার দৃষ্টিতে কি মনে হয়েছে। আমি কি কি ত্রুটি লক্ষ্য করেছি এবং তাঁর বাড়ির ভৃত্যদের ভাবে ভঙ্গিতে ও পোশাকে আমি কি বিসদৃশতা লক্ষ্য করেছি। এমন প্রশ্ন করার তাঁর অধিকার আছে, তিনি নিজে সর্ববিষয়ে মহানুভব উদার, ভদ্র ও নিয়ম নিষ্ঠ। আমি উত্তরে তাঁকে বললুম যে আপনি নিজে ধনী, উদার এবং বহু গুণে গুণান্বিত। এইজন্যে দেশ ও দেশবাসীর ত্রুটি, মূর্খতা ও দৈন্যতা আপনার চোখে পড়ে না।

তিনি বললেন আমি যদি তাঁর সঙ্গে কুড়ি মাইল দূরে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যাই তাহলে সেখানে ধীরে সুস্থে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। আমি মহাশয়কে বললুম আমি তাঁর সকল প্রস্তাবে রাজি এবং সেই অনুসারে আমরা পরদিন তাঁর গ্রামের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম।

যাত্রা পথে তিনি আমাকে তাঁদের কৃষকদের কয়েকটি কৃষি পদ্ধতি দেখালেন। কৃষকেরা কি ভাবে ক্ষেতে কাজ করে তাও বোঝালেন। কিন্তু এসব আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হল। কারণ মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত কোথাও আমি সামান্য শস্য
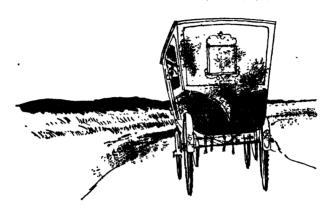
তবে তিন ঘণ্টা যাবার পর দৃশ্য বদলে গেল

বা তৃণ দেখতে পেলাম না। তবে তিন ঘণ্টা যাবার পর দৃশ্য বদলে গেল। আমরা সুন্দর একটা এলাকায় এলুম। এখানে কাছাকাছি কৃষকদের অনেক বাড়ি রয়েছে, সুন্দর ভাবে নির্মিত। সংলগ্ন ক্ষেত্রে আঙুরের চাষ। শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র এবং ঘাস ভর্তি মাঠ চোখ জুড়িয়ে দিল। এমন সুন্দর দৃশ্য এখানে আসার পর আমার চোখে এই প্রথম পড়ল। ভদ্রলোক আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন এইখান থেকেই তাঁর ক্ষেতখামার আরম্ভ হয়েছে এবং এই ক্ষেতখামার তার গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত।

মুনোডি বললেন তিনি নাকি চাষবাসের কিছু বোঝেন না এবং তিনি সবার কাছে বদ উদাহরণ স্থাপন করেছেন, এজন্যে তাঁকে অনেক বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়। অবশ্য দেশের মাত্র সামান্য কয়েকজন যারা আমার মতো মূর্খ বলে বিবেচিত কেবল তারাই আমার মতো চাষবাস করে।

অবশেষে আমরা তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলুম। সুন্দর বাড়ি। যদিও প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে সেটি নির্মিত। বাড়ির বাগান, বাগানের মাঝে মাঝে পথ, লতাকুঞ্জ, ফোয়ারা সব কিছুতে সুন্দর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আমি যা দেখলুম তারই প্রশংসা করলুম। কিন্তু ভদ্রলোক যেন আমার কথায় কান দিলেন না।

এ সবের কারণ জানতে পারলুম রাত্রে আহারের সময় যখন ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল

না। তিনি বিষাদ মাখা সুরে বললেন তাঁকে হয়ত তাঁর শহরের ও গ্রামের বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন পদ্ধতিতে ও আধুনিক ধাঁচে বাড়ি তৈরি করতে হবে এবং বর্তমানে প্রচলিত ধারায় চাষবাস করতে হবে। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রজারাও যাতে তাঁর পথ অনুসরণ করে তাদেরও সেভাবে নির্দেশ দিতে হবে। নচেৎ দেশবাসীর কাছে তাঁকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। এমন কি সম্রাটও তাঁর ওপর বিরক্ত হবেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন।

এর পরে তিনি আমাকে যা বললেন তাতে আমার এই সব প্রশংসা নিরর্থক মনে হল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সে রকম কোনো কথা আমি রাজদরবারে বা জনসাধারণের মধ্যেও শুনি নি। কারণ তারা নিজের ব্যাপার নিয়েই সব সময় ব্যস্ত থাকত। নিচে কোথায় কে কি করছে সেজন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

ভদ্রলোক আমাকে যা বললেন তার সারমর্ম হল নিম্নরূপ ঃ

প্রায় চল্লিশ বছর আগে কয়েকজন ব্যক্তি প্রমোদ বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে লাপুটায় গিয়েছিল। সেখানে পাঁচ মাস কাটিয়ে তারা ফিরে আসে। তারা গণিত সম্বন্ধে অল্পস্বল্প জ্ঞান অর্জন করেছিল। ফিরে এসে তারা এমন ভাব দেখাত যেন কত বিদ্যাই না শিখে এসেছে। এই লোকগুলি তখন এদেশের যা কিছু দেখে তাই তাদের দৃষ্টিতে নিরর্থক বলে মনে হয়। কি কলাবিদ্যা, কি চারুশিল্প, কি বিজ্ঞান, ভাষা, কারিগরীবিদ্যা সবকিছু তাদের কাছে নিরর্থক ও বাতিল মনে হল। তাদের মতে জগৎ কত এগিয়ে গেছে আর আমরা পেছিয়ে পড়ে আছি। তারা সবকিছু সংস্কার করতে চাইল এবং এই উদ্দেশ্যে রাজার অনুমতি নিয়ে লাগাডোতে তারা একটি 'যোজনা ভবন' স্থাপন করল এবং তারা প্রচার করল যে এমন যোজনা ভবন নাকি দেশের সব উল্লেখযোগ্য শহরেই আছে।

এই সকল যোজনা-ভবনের বিশেষজ্ঞরা বাড়ি তৈরির ও কৃষির নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে লাগল যার দ্বারা নাকি উন্নত ধরনের বাড়ি তৈরি করা যাবে, কৃষিক্ষেত্র থেকেও আরও বেশি ফসল তোলা যাবে। তাঁরা নতুন ধরনের যন্ত্রপাতিও তৈরি করতে লাগলেন এবং এমন যন্ত্রও তৈরি করলেন যা বুঝি একা দশজন লোকের কাজ করতে পারবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে এক সপ্তাহে একটা প্রাসাদ তৈরি করা যাবে। আর এর তৈরি বাড়িগুলির নতুন মালমশলা এতই মজবুত হবে যে বাড়িগুলি আর মেরামত করার দরকার হবে না। যে কোনো ফল যে কোনো ঋতুতে ফলানো যাবে এবং বর্তমানে যে পরিমাণ শস্য তোলা যায় নতুন পদ্ধতিতে চাষ করলে তার শতগুণ বেশি ফসল তোলা যাবে।

সবই ঠিক আছে। কিন্তু নতুন পরিকল্পনার একমাত্র ত্রুটি হল যে প্রকল্পগুলি বাঞ্ছিত মতো কাজ করতে পারল না। ফলে দেশে দুর্দশা দেখা দিল, নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত বাড়িগুলি ভেঙে পড়তে লাগল, যে ফসল উৎপন্ন হত তাও প্রায় বন্ধ। লোকের আহার জোটে না, বস্ত্রও জোটে না। তথাপি তারা নিরুৎসাহ না হয়ে নব উদ্যমে প্রকল্পগুলি ফলপ্রসূ করবার জন্যে পরিশ্রম করছে, আশা নিরাশার মধ্য দিয়ে। তিনি

নিজে উদ্যমী নন তাই তিনি পুরনো পদ্ধতিতেই বাড়ি তৈরি করতে লাগলেন ও চাষ করতে লাগলেন এবং তাঁর পূর্ব-পুরুষ যে বাড়ি তৈরি করে গেছেন সেই বাড়িতেই তিনি আজও বাস করছেন এবং তাঁরা যে পথ দেখিয়ে গেছেন সেই পথ ধরেই তিনি চলছেন। তাঁর মতো আর কিছু ব্যক্তি পুরানো পথ ছাড়তে পারেননি। এইজন্য তাঁরা অগ্রগতির শত্রু হিসেবে নিন্দিত ও ঘৃণিত। দেশ নাকি এগিয়ে যাচ্ছে অথচ তাঁরা ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, আমি যদি যোজনা ভবনটি দেখতে চাই তাহলে তিনি আমাকে নিষেধ করবেন না। বরঞ্চ তিনি চান যে আমি ভবনটি দেখে আসি। তিনি আমাকে বললেন তিন মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে একটি ভাঙাচোরা বাড়ি আছে। সেইটি হল যোজনা-ভবন। সেখানে কি করে পেঁছিতে হবে তিনি তার পথ বাৎলে দিলেন।

তিনি বললেন তাঁর বাড়ি থেকে আধমাইল দূরে একটা বড় নদীতে তাঁর একটা জলচাকী ছিল। নদীর স্রোতে সেই জলচাকী ঘুরত যার ফলে তিনি নিজের ও প্রজাদের ক্ষেতে জল নিয়ে আসতেন। যথেষ্ট জল পাওয়া যেত, কোনো অসুবিধা ছিল না। কিন্তু সাত বছর আগে যোজনা ভবন থেকে একজন এসে তাঁকে জলচাকীটি ভেঙে ফেলতে বললেন। সেই ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন পাহাড়ের একধারে নতুন জলচাকী বসাতে যেখানে একটা বাঁধ দেওয়া হবে। বাঁধে জল ধরে পাইপের সাহায্যে সেই জল সরবরাহ করা হবে। ওপরে বাতাস স্রোতের গতি বাড়িয়ে দেয় যেজন্য সহজে পাইপ দিয়ে জল সরবরাহ করা যাবে। তাছাড়া সমতলভূমি অপেক্ষা পাহাড়ের ঢালু গা দিয়ে যখন জল নামে তখন তার গতিও বেশি হয়।

ভদ্রলোক বললেন যে রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তখন ভাল চলছিল না। তাছাড়া তার অনেক বন্ধু চাপ দেওয়ার ফলে তিনি নতুন প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং অনেক লোক লাগিয়ে দুই বছরের মধ্যে পুরানো জলচাকী ভেঙে যোজনা-ভবনের পরামর্শমতো পাহাড়ের ধারে নতুন জলচাকী বসালেন। কিন্তু তা কার্যকরী হল না। অতএব আমার ঘাড়ে দোষ চাপানো হল। আমার মতো আরও যাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তারাও পরামর্শ মতো কাজ করে ব্যর্থ হল।

কয়েকদিন পরে আমরা শহরে ফিরে এলুম। কিন্তু এখানকার যোজনা-ভবন দর্শন করতে তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। কারণ রাজদরবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল চলছে না। তবে তিনি আমার সঙ্গে একজন বন্ধুকে দেবেন। তিনি একখানা চিঠি দিলেন সেই বন্ধুকে। চিঠিতে তিনি লিখলেন যে নতুন নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। অবশ্য সত্যি আমি নিজে যুবক বয়সে কয়েকটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাগাডো শহরে 'যোজনা-ভবন' লেখককে দেখবার অনুমতি দেওয়া হল। যোজনা-ভবনের বিশদ পরিচয়। ভবনের অধ্যাপকগণের নিজ নিজ কর্মের পরিচয়।

যোজনা-ভবনটি একটি সম্পূর্ণ বাড়ি নয়, রাস্তার উভয় পার্শ্বে কয়েকটি বাড়ির সমন্বয়। যে বাড়িগুলি খালি পড়ে ছিল, সেগুলি কিনে নিয়ে যোজনা-ভবন স্থাপন করা হয়। ভবনের তত্ত্বাবধায়ক আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং বেশ কয়েক দিন ধরে আমি ভবনটি পরিদর্শন করলুম। প্রতি ঘরে একজন করে পরিকল্পক আছেন এবং আমার মনে হচ্ছে আমি অন্ততঃ পাঁচ শতটি ঘর দেখেছি।

প্রথম যে লোকটিকে দেখলুম সে মাথায় খাটো, হাতে ও মুখে তার কালি বা ভুষো লেগে আছে। মাথার চুল ও দাড়ি দুইই লম্বা, দুটোই অনেক দিন ছাঁটা হয় নি। চুল ও দাড়িতে কখনও চিরুনি পড়ে না। জায়গায় জায়গায় জটা পড়েছে। আবার কয়েকটা জায়গা পুড়েও গেছে। তার জামা প্যান্ট ও গায়ের চামড়ার একই রং। ইনি যে পরিকল্পনা নিয়ে গবেষণা করছেন তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। শশা যেসব সূর্যকিরণ শুষে নিয়েছে তিনি সেই সব সূর্যকিরণ শশার ভেতর থেকে বার করে নিয়ে শিশিতে ভরে কষে ছিপি এঁটে রেখে দেবেন। যাতে আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে গেলে বাতাস গরম করবার জন্যে সেই বন্দী রৌদ্রকিরণ ব্যবহার করা যায়। তিনি গত আট বছর ধরে এই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। আর আট বছরের মধ্যেই তিনি নিশ্চিত সাফল্য লাভ করবেন। তখন তিনি ন্যায্য মূল্যে সরকারী বাগানের জন্যে টাটকা রৌদ্রকিরণ সরবরাহ করতে পারবেন। কিন্তু তিনি অভিযোগ করলেন যে তাঁর মজুত বেশি নেই। কারণ তখন শশার মরশুম নয়। তাই কাঁচামাল যোগাড় করতে তাকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্যে আমি যদি কিছু চাঁদা দিই ত খুব ভাল হয়। আমি কিছু চাঁদা দিলুম। মুনোডি মশাই আমার

সঙ্গে কিছু অর্থ দিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন এইসব গবেষকরা ভিক্ষা চাইতে অভ্যস্ত।

শিশিতে ভরে কষে ছিপি এঁটে রেখে দেবেন

পরের ঘরে প্রবেশ করে যেন একটা ধাক্কা খেলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলুম। ঘরে সে যে কি বিশ্রী, পচা তীব্র গন্ধ, সে কি বলব। নাক জ্বালা করতে লাগল। কিন্তু আমার সঙ্গী আমাকে আবার ঘরের ভেতরে ঠেলে দিয়ে আমার কানে ফিসফিস করে বললেন ঘরে না ঢুকলে এবং এভাবে বেরিয়ে এলে ওরা ক্ষুব্ধ হবে, অপমানিত বোধ করবে। অতএব আমাকে নাকে চাপা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হল। এই ঘরের গবেষক যোজনা-ভবন আরম্ভ হওয়ার শুরু থেকে আছেন। তিনি গবেষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁর মুখ ও দাড়ি হলদে এবং পরিধেয় বস্ত্র ও দুই হাত নোংরা। শরীরের নানা জায়গায় ময়লা লেগে রয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতেই তিনি আমাকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। ইচ্ছা করলে এ আলিঙ্গন আমি হয়ত এড়াতে পারতুম এবং আমার পক্ষে তাই করা উচিত ছিল।

তিনি যোজনা-ভবনে কি নিয়ে কাজ করছেন? মানুষের বিষ্ঠা নিয়ে তার গবেষণা। আমরা যেসব খাদ্য খাই এবং যা বিষ্ঠা হয়ে আমাদের দেহ থেকে নির্গত হয় তিনি সেই বিষ্ঠাকে পুনরায় মূল খাদ্যে পরিণত করবার চেষ্টা করছেন। পিত্তথলি থেকে যে জারক রস নির্গত হয়ে বিষ্ঠাকে দুর্গন্ধযুক্ত করে তিনি সেই পিত্ত-রসকে প্রথমে বিষ্ঠা থেকে অপসারিত করবেন। তাহলে বিষ্ঠায় আর কোনো গন্ধ থাকবে না। সেই সঙ্গে বিষ্ঠা থেকে মুখের লালারসও বার করে দেবেন। একটি প্রতিষ্ঠান মারফত প্রতি সপ্তাহে পিপে ভর্তি করে তাঁকে বিষ্ঠা যোগান দেওয়া হয়।

এ ঘর থেকে বেরিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে দেখলুম সে ঘরের গবেষক বরফ থেকে বারুদ

তৈরি করবার চেষ্টা করছেন। তিনি একটি গবেষণা পত্র রচনা করেছেন যার বিষয়-বস্তু হল আগুনকে কি ভাবে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করা যাবে। গবেষণা পত্রটি তিনি শীঘ্রই প্রকাশিত করবেন।

একজন স্থপতির দর্শন পাওয়া গেল। ইনি গৃহনির্মাণের এক মৌলিক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। প্রথমে বাড়ির ছাদটা তৈরি করে ফেলতে হবে তারপর গাঁথতে গাঁথতে ক্রমশঃ নিচে নামতে হবে এবং সবশেষে বাড়ির ভিত। পরিশ্রমী মৌমাছি ও মাকড়সা এই ভাবেই তাদের বাসা তৈরি করে।

তারপর যে গবেষককে দেখলুম তিনি আজন্ম অন্ধ। তিনি কয়েকজন শিক্ষানবিশি নিয়ে কাজ করছেন। এই গবেষকের কাজ হল শিল্পীদের জন্যে বিভিন্ন রং মিশিয়ে নতুন রং তৈরি করা। কি করে হাত দিয়ে অনুভব করে আর গন্ধ শুঁকে রং চিনতে হয় তা তিনি তাঁর ছাত্রদের শিখিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তারা কোনো রং চিনতে পারছে না। গবেষক নিজেই ভুল করেছেন। তা বললে কি হয়? এই শিল্প-গবেষককে যোজনা-ভবনের সকলেই শ্রদ্ধা করেন ও উৎসাহ দেন।

পরের গবেষকের কাণ্ডকারখানা শুনে আমি বেশ মজা অনুভব করলুম। তিনি বললেন শুয়োর দিয়ে জমি চাষ করা যায়। এবং এ জন্য লাঙ্গল, গরু, মোষ ও শ্রমিকের অনেক খরচ বেঁচে যাবে। পদ্ধতিটা অতি সহজ। এক একর জমিতে ছ ইঞ্চি অন্তর আট ইঞ্চি গভীর কিছু ওক ফসলের বীজ, খেজুর, বাদাম, ডাল, ভুট্টা বা সব্জি পুঁতে দিতে হবে। তারপর তুমি ঐ এক একর জমিতে ছ'শ বা তার বেশি শুয়োর ছেড়ে দাও। ঐ সব খাবার শুয়োরদের কাছে খুব প্রিয়। তারা ঐ খাবার খুঁজতে আরম্ভ করবে, মাটি খুঁড়বে, কয়েকদিনের মধ্যেই নিচের মাটি ওপরে তুলবে ফলে জমি চাষ হয়ে যাবে এবং এরপর বীজ ফেললেই হল। তবে এ কথা সত্যি যে পরীক্ষার সময় তাঁরা লক্ষ্য করেছেন খরচ কিছু বেশি পড়ে যাচ্ছে, পরিশ্রমও করতে হয়েছে প্রচুর। তবে তারা নিঃসন্দেহ যে এই আবিষ্কারের আরও উন্নতি সাধন করা যায়।

আর একটা ঘরে ঢুকলুম। ঘরের দেওয়াল ও ছাদ থেকে ঝুলছে অনেক মাকড়সার জাল, একেবারে ঘর ভর্তি। তবে ঘরের ভেতরে যাবার ও ঘর থেকে বেরোবার সরু একটা পথ আছে, ঘরে ঢোকবার মুখে গবেষক চিৎকার করে আমাকে সতর্ক করে দিলেন, মাকড়সার জাল যেন ছিঁড়ে না ফেলি। গবেষক দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে পৃথিবীর মানুষরা এতদিন রেশম গুটি পোকার সাহায্য নিয়ে বিরাট ভুল করেছে। অথচ আমাদের নিজেদের ঘরেই পোকা রয়েছে যারা গুটি পোকা অপেক্ষা সিলকের সুতো বুনতে অনেক বেশি ওস্তাদ। তারা সুতো কাটতেও পারে। বুনতেও পারে। তিনি আরও বললেন মাকড়সার সাহায্যে যেমন রেশম সুতো তৈরি হবে। তেমনি তাদের দ্বারাই রেশম সুতো রং করাও যাবে।

আমার কৌতুহল বাড়ল। তিনি আমাকে নানারকম সুন্দর রঙের অনেক কীট দেখালেন। মাকড়সা এই সব রঙীন কীট খায়। রঙীন কীট খেলে মাকড়সা রঙীন

জাল বুনতেও পারবে ও তখন লোকে ইচ্ছামতো রঙের সুতো পাবে। তবে মাকড়সা যাতে রঙীন পোকা খেয়ে রঙীন জাল তৈরি করতে পারে সেজন্যে পোকাগুলিকে এমন খাদ্য ও ওষুধ খাওয়াতে হবে যাতে মাকড়সা রঙীন ও মজবুত জাল তৈরি করতে পারে।

একজন জ্যোতির্বিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি টাউন হাউসের মাথায় রক্ষিত বিরাট ওয়েদার ককের ওপর একটা সান-ডায়াল বসিয়ে পৃথিবী ও সূর্যের বার্ষিক ও আহ্নিক গতি নিয়ন্ত্রণ করে ঝড়ের মোকাবিলা করবেন।

আমার সঙ্গীকে এবার আমি বললুম যে আমার পেট ব্যথা করছে। তাই নাকি? এই বলে তিনি আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে এক বিরাট ডাক্তার বসেন। যে রোগ হয় সেই রোগের বিপরীত ক্রিয়ার যন্ত্র প্রয়োগ করে তিনি রোগ আরোগ্য করতে পারেন। তাঁর খ্যাতি প্রচুর। কামারের হাপরের মতো তাঁর এক জোড়া বেশ বড় হাপর আছে এবং তাদের সঙ্গে হাতির দাঁতের নল লাগানো। নলটি বেশ লম্বা। সেই নল তিনি রোগীর বায়ু দেশ দিয়ে আট ইঞ্চি পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দেন এবং তারপর তার দেহের ভেতর থেকে সমস্ত বায়ু বার করে এনে পাকস্থলী ও ফুসফুস সমেত সব ফাঁপা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে চুপসে দেন। তাতেই নাকি রোগ সারবে। কিন্তু রোগ যখন কড়া হয়, কিছুতেই তাকে তাড়ানো যায় না তখন যেমন কুকুর তেমন মুগুর প্রয়োগ করতে হয়। তখন তিনি হাপর ও নলের সাহায্যে বায়ু দেশ দিয়ে বেশ করে বাতাস দেহের ভেতরে ঢুকিয়ে দেন এবং নিজের বুড়ো আঙুল দিয়ে ছিদ্রপথ চেপে ধরে থাকেন। তারপর আঙুল তুলে নিতেই সমস্ত বাতাস রোগকে নিয়ে সশব্দে বেরিয়ে আসে। পিচকারিতে জল ভরে বার করে দেওয়ার মতো আর কি। এতেই রোগী আরোগ্য লাভ করে।

আমার সামনে তিনি একটি কুকুরের ওপর এই উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন। প্রথম পরীক্ষার পর আমি কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলুম না। দ্বিতীয় পরীক্ষার পর কুকুরটি এত ফুলে গেল যে মনে হল এই বুঝি ফেটে যাবে। কিন্তু একটু পরেই সেই বাতাস তার দেহ থেকে সশব্দে বেরিয়ে এল। কুকুরটি অবশ্য বাঁচল না। একটু পরেই মরে গেল। ডাক্তার কুকুরকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলেন, ঐ একই দাওয়াই প্রয়োগ করে। আমরা সরে পড়লুম।

আরও কয়েকটি ঘর দেখলুম কিন্তু সেসব ঘরে যা দেখলুম তার উল্লেখ করে পাঠকদের আর বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না।

আমি এতক্ষণ যোজনা-ভবনের শুধু একটা দিকই দেখলুম কিন্তু ওর আরও একটা দিক আছে যেখানে আরও উচ্চকোটির গবেষকরা কাজ করছেন।

ওঁদের কথা বলার আগে একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলব যিনি বিশ্বজনীন শিল্পী রূপে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন গত তিরিশ বৎসর যাবত তিনি মানুষের জীবন উন্নত করার চেষ্টা করছেন। তাঁর দুটি ঘর আছে। ঘর দুটি নানারকম কৌতূহলোদ্দীপক সামগ্রীতে ভর্তি। তাঁর অধীনে পঞ্চাশজন লোক কাজ

করছে। কেউ হয়ত বাতাসকে অন্য কোনো বস্তুর মতো যাতে হাতে ধরে রাখা যেতে পারে সেজন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। তিনি বাতাস থেকে নাইটার বার করে নিয়ে বাষ্প অংশটাও বার করে দিচ্ছেন। কেউ বালিশ বা পিনকুশন বানাবার জন্যে মারবেল পাথর নরম করবার চেষ্টা করছেন, কেউ জীবন্ত ঘোড়ার খুরকে পাথরে রূপান্তরিত করবার জন্যে পরীক্ষা করছেন। তাহলে ঘোড়ার খুর আর ক্ষইবে না। সেই বিশ্বজনীন শিল্পী স্বয়ং তখন দুটো বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। প্রথম পরিকল্পনায় তিনি জমিতে ভুষি বুনবেন কারণ ভুষিতেই নাকি প্রজনন শক্তি নিহিত থাকে। এর দ্বারা কি ফললাভ হবে তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন বটে তবে আমার মাথায় ঢুকল না। আর দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হল তিনি দুটি মেষশাবককে গঁদ ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত এমন খাদ্য খাওয়াচ্ছেন যে তারা নির্লোম হয়ে পড়বে এবং তাদের লোমহীন বাচ্চা হবে।

রাস্তা পার হয়ে আমরা যোজনা-ভবনের অন্য একটা অংশে প্রবেশ করলুম। এই অংশেই কাজ করছেন আরও উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও গবেষকরা।

প্রথম যে অধ্যাপককে আমি দেখলুম তিনি একটি মস্ত বড় ঘরে কাজ করছেন। চল্লিশজন ছাত্র তাঁকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। অধ্যাপকের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময় হল। সেই ঘরের প্রায় একটা পুরো দেওয়াল ভর্তি বিরাট ফ্রেম টাঙানো। আমি সেটি নিরীক্ষণ করছিলুম তাই দেখে তিনি উৎসাহিত হয়ে বললেন উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞান প্রসারের জন্যে তিনি অনেক পরিশ্রম করছেন। যার ব্যবহারিক প্রয়োগ ভবিষ্যতে বহু কাজে লাগবে। অর্থাৎ পৃথিবীর উপকারে লাগবেই এমন একটা কাজে তিনি এখন ব্যস্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই কাজের পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত আর কারও মাথায় আসে নি।

সকলেই জানেন যে শিল্প বা বিজ্ঞানে জ্ঞান অর্জন করা বা পারদর্শীতা দেখানো কত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তিনি এমন একটা আজব কল আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে সামান্য কিছু মুদ্রার বিনিময়ে এবং অল্প কায়িক পরিশ্রম করেই অত্যন্ত মূর্খ লোকও পদ্য লিখতে পারবে। শুধু তাই নয় এর মাধ্যমে দর্শন, রাজনীতি, আইন, গণিত এবং থিওলজিরও বই যে কেউ লিখতে পারবে এবং এজন্য কোনো পণ্ডিতের সাহায্য নিতে হবে না বা পড়াশোনাও করতে হবে না। এরপর তিনি আমাকে ফ্রেমটির কাছে নিয়ে গেলেন যার কাছে তাঁর ছাত্ররা সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফ্রেমটি কুড়ি ফুট চৌকো, ঘরের মাঝখানে সেটি রক্ষিত। ফ্রেমটি ছোট বড় নানা আকারের কাঠ জুড়ে তৈরি। পুরো ফ্রেমটা চৌখুপিতে ভর্তি আর সেই সব চৌখুপিতে কাগজ সাঁটা রয়েছে। প্রত্যেক কাগজে তাদের ভাষার সব শব্দ যতরকম সম্ভব বিভিন্ন পদ প্রকরণে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু নিয়ম অনুসরণ করে শব্দগুলি সাজানো হয় নি।

অধ্যাপক বললেন তিনি এবার যন্ত্রটিকে চালাবেন, আমি যেন আমার নজর ঠিক রাখি। আমি ফ্রেমটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। ফ্রেমে চল্লিশটি

হাতল লাগানো ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকে বলা হল এক একটি হাতল ধরতে। ছাত্ররা হাতল ধরতেই তিনি তাদের বললেন চট করে হাতল ঘোরাও আর সংগে সংগে সমস্ত চৌখুপি নিজ নিজ স্থান বদল করে ফেলল। তারপর অধ্যাপক সেখানে উপস্থিত ছ'জন ও তিরিশজন ছাত্রকে এবার ফ্রেমের শব্দগুলি পড়তে বললেন। আর বাকি চারজন ছাত্র পাঠ শুনে লিখতে লাগল। ফ্রেমের চৌখুপিগুলি এইভাবে তিন চার বার ঘোরানো হল, প্রতিবারই চৌখুপিগুলি তাদের স্থান পরিবর্তন করল, ওপরেরগুলি নিচে নামে, নিচেরগুলি ওপরে কিংবা এ-পাশেরগুলি যায় ওপাশে, ওপাশেরগুলি আসে এপাশে। ছাত্ররা প্রতিদিন ছ ঘণ্টা কাজ করে। অধ্যাপক আমাকে শত শত কাগজ দেখালেন যাতে অনেক বাক্য লেখা রয়েছে। কিন্তু কোনো বাক্যের সংগে অন্য বাক্যের কোনো সম্পর্ক নেই। অধ্যাপক বললেন নানা শাস্ত্রের অনেক বই এইভাবে লেখা হয়ে গেছে। এখন শুধু বাক্যগুলি বেছে নিয়ে অন্য কাগজে লিখতে হবে তাহলেই কাজ শেষ। আর তখন কতই না জ্ঞান বিজ্ঞানের বইয়ে তাক ভর্তি হয়ে যাবে। তবে জনসাধারণ যদি যথেষ্ট চাঁদা তুলে দেয় তাহলে তিনি লাগাডো শহরে এমন পাঁচশ ফ্রেম বসিয়ে দেবেন। তখন এই কাজের আরও উন্নতি সাধন করা যাবে এবং দ্রুত প্রচুর বই লেখা হয়ে যাবে। তিনি আমাকে বেশ জোর দিয়েই বললেন যে যুবা বয়স থেকেই তিনি এই যন্ত্রটি আবিষ্কারের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর ভাণ্ডারে যত শব্দাবলী আছে সবই তিনি এই ফ্রেমে সন্নিবদ্ধ করেছেন এবং বই রচনায় যত রকমভাবে শব্দবিন্যাস ও ব্যাকরণ যথা বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া ইত্যাদির ব্যবহার হতে পারে সবই এর মধ্যে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আমি ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তির বিদ্যা সবিনয়ে স্বীকার করে নিয়ে বললুম আমি যদি কখনও দেশে ফিরতে পারি তাহলে আমি আপনার এই অসাধারণ আবিষ্কারের বিষয় আমার দেশের মানুষকে এমনভাবে জানাব যাতে আপনার প্রতি সুবিচার করা হয় এবং আপনিই যে এই অত্যাশ্চর্য মেসিনটি আবিষ্কার করেছেন তাও জানাব। আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে একখানি কাগজে সকল বর্ণসমেত মেসিনটির অর্থাৎ ফ্রেমটির নকশা এঁকে নিলুম। আমি তাঁকে বললুম ইউরোপে এরকম ঘটনা ঘটে যে একজনের আবিষ্কার আর একজন নিজের বলে চালিয়ে দেয় এবং কে যে মূল আবিষ্কারক তা নিয়ে পরে তর্ক ওঠে। তবে আপনার ক্ষেত্রে আমি এমন সতর্কতা অবলম্বন করব যাতে আপনার আবিষ্কার কেউ আত্মসাত করতে না পারে এবং একমাত্র আপনিই যে এর আবিষ্কারক সে স্বীকৃতি আপনি নিশ্চয়ই পান।

এর পর আমরা গেলুম ভাষা শীক্ষার বিদ্যালয়ে যেখানে তিনজন অধ্যাপক আলোচনায় মগ্ন। তাদের আলোচনার বিষয় কি করে দেশের ভাষার উন্নতি-সাধন করা যায়।

তাঁদের প্রথম প্রস্তাব হল যে বাক্যরচনায় সিল্যাবল ছোট করা হক এবং পার্টিসিপল ও ক্রিয়া পদ বাদ দেওয়া হক। কারণ বাস্তবিক ওগুলি নিষ্প্রয়োজন। আসলে

আমরা সব বাক্যই শুনে বা পড়ে মনের ভাবে অনুমান করে নিতে পারি। কারণ আসলে আমরা বলবার জন্যে ভাবি সবই বিশেষ্যপদে।

পরবর্তী প্রস্তাব হল যে সকল শব্দ সে যাই হক না কেন তুলে দেওয়া হক। এর স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি এই যে তা স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে এবং অতি সংক্ষেপে সব কিছু প্রকাশ করা গেলে সময় বাঁচবে। কারণ আমরা যত বেশি কথা বলি আমাদের ফুসফুসের ওপর তত বেশি জোর পড়ে। ফলে আমাদের আয়ু কমতে থাকে এবং এজন্যে যত কম কথা বলা যায় ততই ভাল। আমরা বলি একজন মানুষের নিজ নিজ পেশায় যেসব সামগ্রীর প্রয়োজন হয় তারা সেগুলি নিজেরাই বহন করে নিয়ে যাবে। অপরকে নিজের মনোভাব জানাতে কথা না বলে শুধু সামগ্রীগুলি দেখাবে ও ইঙ্গিতে কাজ সারবে। আমরা নিশ্চিত এর দ্বারা জনগণের অনেক সময় বাঁচবে। তারা আরাম বোধ করবে এবং তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।

মহিলারা বেশি কথা বলেন। দেশের অশিক্ষিত ও দুষ্ট লোকেরা তাদের যদি প্ররোচিত না করে তাহলে ফল ভাল হবে এবং মহিলাদের কর্তব্য হবে তাদের সহযোগিতা না করা। তাহলে তাঁরাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। বিজ্ঞানের উন্নতি করতে চাইলে যারা বাধা সৃষ্টি করে তারা জাতির শত্রু।

যাইহক অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই নতুন পদ্ধতিতে নিজ নিজ মনোভাব প্রকাশ করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু যাদের পেশা ব্যাপক তাদের এই পদ্ধতি অনুযায়ী অনেক প্রকার সামগ্রী সঙ্গে বহন করতে হয়। যেটা খুবই অসুবিধা জনক। অনেক রকম সামগ্রী বহন করার কারণ, এই সামগ্রীগুলির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করতে হয়। অতএব সেইসব সামগ্রী বহন করবার জন্যে সঙ্গে একজন বা দু'জন বলশালী ভৃত্যের প্রয়োজন। আমি রাস্তায় এমন দু' একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখেছি যাঁরা ফেরিওয়ালার মতো নানা সামগ্রী বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং অপর একজনের সঙ্গে নীরবে বাক্যালাপের জন্যে সেই সামগ্রী রাস্তায় সাজিয়ে ঘণ্টাখানেক বা তারও বেশি সময় ধরে নীরবে মনোভাব প্রকাশ করে চলেছেন। তারপর তাঁরা নিজ নিজ সামগ্রীগুলি গুছিয়ে তুলে নিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতেন। জিনিসগুলি গুছিয়ে তুলে নিতেও বেশ কিছু সময় লাগত।

তবে যেখানে অল্প কথার প্রয়োজন সেখানে সামগ্রীগুলি পকেটে করে অথবা বগলদাবা করে নিয়ে যাওয়া যেত। বাড়ির ভেতর এই ভাবে নীরব বাক্যালাপের জন্যে ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ছাড়াও আরও বহুরকম সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হত।

এই আবিষ্কারের একটি সুফল হিসেবে দাবি করা হল যে এই নীরব ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। কারণ সকল সভ্যদেশই প্রায় একই ধরনের সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন। সামান্য পার্থক্যে কিছু যায় আসে না। মনোভাব ঠিকই প্রকাশ করা যাবে ঐ সব সামগ্রীর মাধ্যমে। অতএব আমাদের রাষ্ট্র দূত যদি এমন দেশে যায় যে দেশের ভাষা আমরা জানি না তাহলেও আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না।

গণিত বিদ্যার বিদ্যালয়ে দেখলুম শিক্ষক যে পদ্ধতিতে অংক কষতে শেখাচ্ছেন সে পদ্ধতি ইউরোপের মানুষ কল্পনা করতেও পারে না। ছাত্রদের শিক্ষক যা শেখাতে চান তা রাসায়নিক কালি দ্বারা পাতলা কাগজে লিখে কাগজটি মুড়ে ছোট করে ছাত্রকে গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গেলবার আগের দিন ছাত্রকে উপবাস করে থাকতে হয় এবং গেলবার পর তিন দিন রুটি ও জল ব্যতীত ছাত্র কিছুই খেতে পারবে না। সেই কাগজ হজম হয়ে গেলেই যে রসায়নে অংক লেখা হয়েছে সেই অংক মগজে উঠে যাবে এবং সেই সংগে অংকটিও তার মাথায় ঢুকে যাবে। তবে এইভাবে অংক গিলিয়ে দেওয়ার ফল এখনও পাওয়া যায় নি। হয়ত অংক লিখতে ভুল হয় কিংবা ছাত্রর ধৈর্য কম। ছাত্ররাও এইভাবে অংক গিলতে চায় না, গেলবার আগে কাগজটি তারা লুকিয়ে ফেলে দেয় এবং যতদিন ধরে অংক গেলা প্রয়োজন ততদিন তারা অপেক্ষা করতে চায় না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অ্যাকাডেমির আরও পরিচয়। লেখক কিছু উন্নতির প্রস্তাব করেন এবং তা সম্মানের সঙ্গে গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যালয়ে আমাকে বিশেষ পাত্তা দেওয়া হয় নি। আমার মনে হয়েছিল অধ্যাপকদের মস্তিষ্কে কিছু গোলমাল আছে যা দেখে আমি প্রীত হতে পারি নি। এই সকল অসুস্থ মস্তিষ্কের অধ্যাপকেরা রাজাদের শেখাচ্ছেন কি ভাবে জ্ঞান, সামর্থ্য ও গুণাবলী বিচার করে প্রিয়পাত্র নির্বাচন করতে হবে। এবং কিভাবে জনসাধারণের মঙ্গল হতে পারে। এজন্যে মন্ত্রীদের কি শিক্ষা দেওয়া দরকার। মানুষের কাজ ও গুণ বিচার করে কি করে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। রাজকুমারদের কি শিক্ষা দেওয়া উচিত। ঠিক কাজের জন্যে ঠিক লোক কি করে বাছতে হবে এবং মানুষ যা কল্পনাও করতে পারে না সে বিদ্যাও কি করে শেখানো হবে। আমার ত মনে হল এরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে চাইছে। তথাপি অ্যাকাডেমির কাজকর্ম আমার মেনে নেওয়া ভাল। একথাও ঠিক যে অ্যাকাডেমির সব মানুষই কল্পনাবিলাসী নয়।

যেমন উদ্ভাবন শক্তিতে দক্ষ একজন অধ্যাপককে দেখলুম। সম্পূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার খুঁটিনাটি তাঁর করায়ত্ত। এই সুযোগ্য অধ্যাপক শাসন ব্যবস্থার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি, শৈথিল্য, ঘুষ নেওয়ার প্রবণতা ইত্যাদি কি করে বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মত ব্যক্ত করলেন এবং কি করে অলস ও অনিচ্ছুক কর্মীদের দ্বারা কাজ করানো যেতে পারে সে বিষয়েও তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করলেন। যথা: সকল লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি কখনও একমত হয়েছেন যে মানুষের সাধারণ অবয়ব এবং রাজনীতিক অবয়বে সামঞ্জস্য আছে? এবং এই উভয় অবয়বের ব্যাধি কি একই ওষুধে আরোগ্য করা যায়? কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা যাঁরা পরিচালনা করেন, যাঁদের হাতে রাষ্ট্রের প্রশাসন ন্যস্ত সেই সব সিনেট বা মন্ত্রণালয়ের সদস্যারা নানা

ব্যাধিতে ভুগে থাকেন। কারও মাথা ঘোরে, কারও বুক ধড়ফড় করে, কারও হাতে পায়ে খেঁচুনি লাগে। কেউ নারভাস হয়ে পড়েন, কারও দুই হাতের পেশীতে ব্যথা, কারও পেট ফাঁপে, মাথায় যন্ত্রণা, কেউ অনিদ্রায় ভোগে, কারও পেটে টিউমার, আবার কেউ অম্বলে ভোগে এবং আরও কতরকম না ব্যাধি আছে।

অতএব সিনেটের অধিবেশনে বসবার প্রথম তিন দিন একদল চিকিৎসক প্রত্যেক মন্ত্রী ও বিধায়কদের যথাযথভাবে পরীক্ষা করে প্রত্যেকের জন্যে যথাযথ ওষুধের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং চতুর্থ দিন থেকে প্রত্যেক মন্ত্রী ও বিধায়কদের ঔষধ সরবরাহ কারীরা ওষুধ-পত্র নিয়ে সভায় হাজির থাকবে। তারপর কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই যার যা ওষুধ দরকার যেমন শিরোঘূনন, মাথাধরা, মাথাব্যথা, অনিদ্রা, অম্বল, বদহজম, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, সর্দি, কাশি, গলার ব্যাথা, পেশীব্যাথা, হাতপা ঝিনঝিন করা, পেটে টিউমার, হাইতোলা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি যে কোনো রোগ হক না কেন সকলকে ঠিক সেই রোগের ওষুধটি খাইয়ে দেবে। শুধু তাই নয় ওষুধ বারবার খাওয়াবে। দরকার হলে বদলে একই রোগে একাধিক ওষুধ খাওয়াবে। কিন্তু কখনই ওষুধ বন্ধ করবে না। শুধু সুস্থ হলেই তবে ওষুধ বন্ধ করা যাবে।

এই পরিকল্পনার একটা সুবিধে আছে। জনসাধারণের ওপর আর্থিক চাপ পড়ে না এবং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি মতে যেসব দেশে প্রজাতান্ত্রিক সভা আছে, দেশ শাসনে জনসাধারণ যেখানে অংশ নেয় সেখানে এই ভাবে কাজকর্ম সহজভাবে চালানো যায়। কারণ চিকিৎসার এই পদ্ধতি অনুসারে তাদের স্বাস্থ্য সর্বদা ভাল রাখা যায়। আর স্বাস্থ্য ভাল থাকলেই অনেক অহেতুক ও অবাঞ্ছিত ঝামেলা এড়ানো যায়। আরও সুবিধে আছে, যাদের মুখ বন্ধ বা সহজে মুখ খোলে না তাদের মুখও খোলানো যায়। আর যারা অতিরিক্ত কথা বলে তাদের সংযত করা যায়, অধৈর্য যুবককে ধৈর্য-শীল করা যায় আর একগুঁয়ে বৃদ্ধদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, বোকাকে চালাক করা যায়।

একটা কথা প্রচলিত আছে যে রাজাদের প্রিয়পাত্রদের স্মরণশক্তি নাকি খুব কম। তাদের চিকিৎসার জন্যে ঐ ডাক্তার বলেন সেই রকম কোনো প্রিয়পাত্র যখন রাজার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন তাকে বলা হবে যে তুমি তোমার বক্তব্য সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বল। তার বক্তব্য শেষ করে যখন ফিরে যাবে তখন সেই মন্ত্রী অর্থাৎ প্রিয়পাত্রের নাক মুচড়ে দেবে বা পেটে একটা লাথি মারবে কিংবা তার যন্ত্রণাদায়ক পায়ের কড়া মাড়িয়ে দেবে অথবা তার দুই কান বেশ করে তিনবার মলে দেবে নয়ত তার প্যান্টে পিন ফুটিয়ে দেবে কিংবা তার বাহুতে এত জোরে চিমটি কাটবে যেন কালসিটে পড়ে যায় তাহলেই দেখবে সে দুরন্ত হয়ে যাবে, আর কখনো কিছু ভুলবে না। আর যে পর্যন্ত না তার সব বদ অভ্যাস দূর হয় সে পর্যন্ত তার এই চিকিৎসা চলতে থাকবে তবেই দেখা যাবে যে হয় সে ঠিক হয়ে গেছে নয়ত হয় নি।

সেই ডাক্তার আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে জাতির রাজ্যসভায় বা রাজ দরবারে কোনো সেনেটর যখনই তার মতামত ব্যক্ত করবেন এবং সেই বক্তব্যের সমর্থনে নিজস্ব

জোরালো যুক্তি পেশ করবেন তখনি তাকে তাঁর সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধে ভোট দিতে বাধ্য করতে হবে। তার ফলে জনসাধারণের মঙ্গলই হবে।

কোনো রাজ্যে কোনো দল যদি ক্ষেপে যায় তাহলে তাদের শান্ত করবার একটা কৌশলও ডাক্তার বলে দিলেন। কৌশলটা হল এই ঃ প্রতি বিদ্রোহ দলের একশ জন করে নেতাকে ধরে আনতে হবে। তারপর যাদের মাথার আকার প্রায় সমান এমন নেতাদের দুজন দুজন করে দু দলে ভাগ করে নিতে হবে। তারপর একই সংগে বিপরীত দলের এই দুজন করে ব্যক্তির মাথা কান বরাবর সমান ভাবে কেটে আধখানা করে একজনের মাথা অপরজনের মাথার সংগে জুড়ে দিতে হবে, মানে একদলের অর্ধেক মাথা অপর দলের মাথার সংগে বদলা বদলি করে দিতে হবে আর কি। কাজটা অবশ্যই নিখুঁতভাবে করতে হবে এবং ডাক্তার বললেন যদি ঠিকঠাক ভাবে একদলের মাথার অর্ধেক অপর দলের মাথার সংগে বেমালুম জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে সাফল্য অনিবার্য। কারণ এইভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় দুই বিপরীত মতের ব্যক্তির মাথা একটি মাথার মধ্যেই তখন তর্ক করতে থাকবে। কিন্তু মাথা যখন একটাই তখন একটা মীমাংসায় আসতেই হবে এবং তখনই একটা সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার উদ্ভব হতে বাধ্য। এইভাবে অচিরে সকলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি আর থাকবে না, তর্ক-বিতর্কেরও অবকাশ থাকবে না, এ বিষয়ে ডাক্তারের বিশ্বাস আছে।

প্রজাদের ওপর উৎপাত না করে কি করে সুষ্ঠুভাবে টাকা তোলা যায় এ নিয়ে আমি দুই অধ্যাপকের মধ্যে একটা জোর তর্ক বিতর্ক শুনেছিলুম। একজন অধ্যাপক বললেন যে মানুষের পাপ ও বোকামির ওপর কর ধার্য করা হক। সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় এমন হারে করের পরিমাণ তাদের প্রতিবেশীদের নিয়ে গঠিত একদল জুরি ধার্য করে দেবে।

দ্বিতীয় অধ্যাপক বললেন মানুষ যে দুটি বস্তুর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অর্থাৎ নিজের দেহ আর মন তার ওপর কর ধার্য করা হক। যে মানুষ নিজের দেহ ও মনকে যত বড় ভাবে সেই মানুষ সেইভাবে নিজের কর নিজেই স্থির করবে। এতে কোনো বিরোধের আশংকা থাকবে না। সর্বাপেক্ষা অধিক কর সেই পুরুষ দেবে যে পুরুষ নারীদের কাছ থেকে যত বেশি প্রশংসা অর্জন করেছে এবং করের পরিমাণ ঠিক করা হবে সে কতজন নারীর কত বিভিন্ন রকম ও কত বেশি অনুগ্রহ লাভ করেছে এবং এই বিচারটা সেই সব ব্যক্তিরা নিজেরাই করতে পারবে এবং নিজেরাই সেই অনুপাতে রাজকোষে কর জমা দেবে। কিন্তু যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সুবিচারক ও বিশেষ সম্মানিত তাদের কর দিতেই হবে না। কারণ এসব হল বিরল গুণ। যে গুণ তারা তাদের প্রতি-বেশীদের দিতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদের মধ্যে এসবের অস্তিত্ব জানে না।

নারীদের ওপরও কর বসাতে হবে, সে কর দিতে হবে তাদের রূপ ও নিজেকে সাজাবার দক্ষতার ওপর। এই করের হার তারা নিজেরাই স্থির করবে। তবে একনিষ্ঠতা, সতীত্ব, সুবুদ্ধি, শান্ত প্রকৃতির জন্যে কোনো কর দিতে হবে না। কারণ তাহলে নারীদের কাছ থেকে কোনো করই আদায় করা যাবে না।

সেনেটররা যাতে রাজার স্বার্থ দেখে সেজন্যে সেনেটরদের চাকরির জন্যে লটারিতে রাজি হতে হবে। তার আগে অবশ্য তাদের শপথ নিতে হবে যে হারুক আর জিতুক তাদের সর্বদা রাজাকেই ভোট দিতে হবে। কেউ হেরে গেলে আবার সে লটারিতে যোগ দিতে পারবে। জিতলে পরবর্তী শূন্যপদে ভর্তি হতে পারবে। এইভাবে তাদের আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে দেবার সুযোগ দেওয়া হবে। যাতে কেউ অবিচার বা হতাশার জন্যে অভিযোগ বা আফশোষ করতে না পারে। এসবই তাদের ভাগ্য বলে তারা মনে করবে। এইসব ভাগ্যবান প্রার্থীরা কাজ করতে পারবে কারণ মন্ত্রী-মণ্ডলীতে যারা আছে তাদের চেয়েও এদের শক্তি সামর্থ বেশি।

আর একজন অধ্যাপক আমাকে একখানি কাগজ দেখালেন। রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ধরবার এক পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছেন। কাগজে এ বিষয়েই

আরেকজন অধ্যাপক আমাকে একখানি কাগজ দেখালেন

তিনি লিখেছেন। পণ্ডিত রাজনীতিকদের তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের এইসব অভ্যাস ইত্যাদির ওপর নজর রাখতে হবে। যথা সে কখন, কি এবং কিভাবে খায়। বিছানায় সে কোন পাশে ফিরে শোয়, কোন হাত দিয়ে সে তার পশ্চাৎ দিক চুলকোয়। তারপর তাদের মলমূত্র পরীক্ষা করতে হবে। কেমন তার রং বা গন্ধ ; তা থেকেই জানা যাবে তার খাবার হজম হয় কি না, তার রুচি কি রকম। তারপর তার চিন্তাধারার ও মতলবেরও একটা সমীক্ষা করতে হবে। এই সবগুলির ওপর কড়া নজর রাখলে জানা যাবে সে ব্যক্তি রাজাকে হত্যা করার কোনো ষড়যন্ত্র করছে কিনা কিংবা রাজধানী পুড়িয়ে দেবার তার মতলব আছে কি না।

নানা দিক বিচার করে নানা তথ্য খুঁটিয়ে তত্ত্বটি লেখা হয়েছে যা রাজনীতিকদের

কাছে কৌতূহলকর ও প্রয়োজনীয় মনে হবে। কিন্তু আমার কাছে এটি অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল। তখন আমি সাহস করে অধ্যাপককে বললুম যে তিনি যদি অনুমতি দেন ত আমি কিছু তথ্য সরবরাহ করতে পারি। এই সকল পরিকল্পনাকারী অধ্যাপকের যা মনোভাব, ইনি তার ব্যতিক্রম। তাই তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বললেন আমি কিছু দিতে পারলে তিনি সন্তুষ্টই হবেন।

আমি তখন তাঁকে বললুম, আমি দীর্ঘদিন ট্রিবনিয়া রাজ্যে বাস করেছিলুম। সেখানকার অধিবাসীদের ল্যাডেন বলা হয়। অধিকাংশ মানুষ নানা পেশায় বিভক্ত। যথা—আবিষ্কারক, সাক্ষী, পর্যবেক্ষক, গুপ্তচর, অভিযোগকারী, অভিযোক্তা, শিকারী, মোক্তার ইত্যাদি। এবং তারা সবসময় কিছু সাধারণ অস্ত্রও বহন করে। এরা সকলেই মন্ত্রীদের অধীন ও তাদের বেতনভুক। সেই দেশে যারা রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে বা বিদ্রোহ করে তারা আসলে বড় বড় রাজনীতিক। তারা চায় ঘুণধরা শাসননীতির পরিবর্তন। আর চায় নিজের অর্থভাণ্ডার পূর্ণ করতে নিজের অনুকূলে জনমত গঠন করা। তখন পেশাদারী লোকদের সাহায্যে চক্রান্তকারীকে খুঁজে বার করা হয়। তাকে সার্চ করে আপত্তিজনক চিঠি ও কাগজপত্র আটক করে তাকে হাতকড়া পরানো হয়।

তারপর সেইসব আটক করা চিঠি ও কাগজপত্র অভিজ্ঞ লোককে পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। যারা খুঁটিয়ে দেখে সেই সব লেখার মধ্যে সাংকেতিক বা গোপন ভাষায় দেশের বিরুদ্ধে কিছু লেখা আছে কিনা। এ-জন্যে প্রতিটি অক্ষর, শব্দ ও চিহ্ন যাচাই করা হয়। যথা, চিঠিতে একটা চিহ্ন বা ছবির অন্যরকম অর্থ হতে পারে। যেমন, একটা টুল দ্বারা প্রিভি কাউনসিল বোঝাতে পারে। এক ঝাঁক হাঁস দ্বারা সিনেট বোঝাতে পারে। খোঁড়া কুকুরের অর্থ হয়ত একজন আক্রমণকারী। 'প্লেগ' লেখা থাকলে হয়ত স্থায়ী সৈন্যদল বোঝায়। বাজপাখি আঁকা থাকলে একজন মন্ত্রী বোঝাবে। 'গাউট' বা বাত লেখা থাকলে বুঝতে হবে ধর্ম যাজক। ফাঁসিমঞ্চ মানে সেক্রেটারি অফ স্টেট। চেম্বারপট হল অভিজাতদের কমিটি। চালুনি হল মহিলা। ঝাঁটা মানে বিপ্লব। ইঁদুর কল লেখা থাকলে বুঝতে হবে চাকরি। তলাশূন্য গর্ত মানে রাজকোষ। টুপি ও ঘণ্টা মানে প্রিয় পাত্র-পাত্রী। ভাঙা শরের অর্থ হল বিচারালয়। যদি একটা খালি ড্রাম আঁকা থাকে, তাহলে জানবেন একজন সেনাপতিকে বোঝাচ্ছে। আর 'ঘা' আঁকা বা লেখা থাকলে প্রশাসন বোঝাবে।

এই পদ্ধতি যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ওদের আরও দুটো পদ্ধতি আছে। ওদের মধ্যে শিক্ষিতেরা তার নাম দিয়েছে অ্যাক্রস্টিক এবং অ্যানাগ্রাম। এর সাহায্যে প্রথমে তারা শব্দ আরম্ভের প্রথম অক্ষরে নিহিত রাজনীতিক অর্থটি বার করে নেয়। যথা, 'এন' মানে রাজনীতিক চক্রান্ত 'বি' মানে একদল অশ্বারোহী, 'এল' মানে সমুদ্রে নৌবহর। দ্বিতীয় পদ্ধতির দ্বারা সন্দেহজনক কাগজের বাক্যের শব্দগুলি ওলট-পালট করে যদি কোনো চক্রান্ত থাকে তা তারা বার করে ফেলে। যেমন আমি যদি আমার কোনো বন্ধুকে চিঠিতে লিখি, "আমার বন্ধু টম এই মাত্র অর্শ রোগে আক্রান্ত

হয়েছে" তাহলে গোপন অর্থ খংজে বার করার যে বিশেষজ্ঞ সে শব্দগুলি ভাল করে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে বলে লাইনটির মধ্যে কি কি শব্দ লুকিয়ে আছে। যথা, "বাধা দাও - একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে—ভ্রমণ।" এই হল অ্যানাগ্রামাটিক মেথড। আমার কাছে এইসব তথ্য পেয়ে অধ্যাপক আমার ভূয়সী প্রশংসা করলেন এবং বললেন তাঁর তত্ত্বমূলক প্রবন্ধে আমার বিষয়ে উল্লেখ করবেন।

এদেশে আমি আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না, যেজন্যে আমি এখানে থাকতে পারি বা ওরা আমাকে রাখতে পারে। অতএব আমি ইংলন্ড ফেরার চিন্তা করতে লাগলুম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লেখক লাগাডো ত্যাগ করলেন, মালডনাডায় পেঁছিলেন। কোনো জাহাজ প্রস্তুত ছিল না। গ্লাবডাবড্রিব পর্যন্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত সমুদ্রযাত্রা। শাসনকর্তা কর্তৃক অভ্যর্থনা।

এই সাম্রাজ্যটি যে মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত, আমার বিশ্বাস সে মহাদেশ এর পূর্বদিকে সেই ভুখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত যার নাম অ্যামেরিকা। অর্থাৎ, ক্যালিফরনিয়ার পশ্চিমে এবং যার উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর। লাগাডো থেকে যার দূরত্ব একশ পঞ্চাশ মাইলের বেশি হবে না। লাগাডো একটি উত্তম বন্দর এবং বিশাল দ্বীপ। লাগনাগের সঙ্গে যার ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। লাগনাগ দ্বীপের অবস্থান হল উত্তর অক্ষাংশের ২৯ ডিগ্রি উত্তর-পশ্চিম এবং ১৪০ দ্রাঘিমা রেখায়। লাগনাগ দ্বীপটি জাপানের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় একশত লিগ দূরে। জাপানের সম্রাট এবং লাগনাগের রাজার সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ চুক্তি আছে যার দ্বারা এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। অতএব আমি এই পথেই যাওয়া স্থির করলুম, যাতে আমি ইউরোপ ফিরতে পারি।

আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে গাইড সমেত দুটি খচ্চর ভাড়া করলুম। জীব দুটি আমার মাল বয়ে নিয়ে যাবে। তারপর আমি আমার আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় নিলুম। আমার প্রতি তিনি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে অনেক উপহার দিলেন।

আমার এই যাত্রায় উল্লেখযোগ্য কোনো দুর্ঘটনা বা উত্তেজনাপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটে নি। আমি যখন মালডনাডা বন্দরে (বন্দরটি এই নামেই পরিচিত) উপস্থিত হলুম তখন দেখলুম লাগনাগ যাবার জন্যে কোনো জাহাজ নেই এবং শীঘ্র ছাড়বার কোনো আশা নেই। শহরটি পোর্টসমাথ শহরের মতো বড়। এখানে আমার পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হল এবং তাঁরা আমাকে সাদর অভ্যর্থনা

জানালেন। একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক আমাকে বললেন লাগনাগ যাবার জাহাজ মাসখানেকের মধ্যে ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। তবে এর মধ্যে আমি ছোট্ট দ্বীপ গ্লাবডাবড্রিব বেড়িয়ে আসতে পারি। ভালই লাগবে। দক্ষিণ পূর্বদিকে মাত্র পাঁচ লিগ দূরে। তিনি বললেন তিনি আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছেন। এবং একজন বন্ধুকেও তিনি সঙ্গে নেবেন। মাঝের সমুদ্রটুকু পার হবার জন্যে পালতোলা একটা ছোট নৌকোর ব্যবস্থাও তিনি করবেন।

গ্লাবডাবড্রিব শব্দটির অর্থ আমি যতদূর সম্ভব করতে পেরেছি। অর্থাৎ দ্বীপটি জাদুকরের দ্বীপ। দ্বীপটি ছোট, আইল অফ ওয়াইট-এর এক তৃতীয়াংশ এবং অত্যন্ত উর্বর। একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সর্দার দ্বীপটি শাসন করে। এই গোষ্ঠীর সকলেই জাদুকর। এই গোষ্ঠী বা উপজাতির নরনারী নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করে। সন্তানদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ কুমার বা শাসনকর্তার গদিতে বসে। শাসনকর্তার জন্য একটি উত্তম প্রাসাদ নির্দিষ্ট আছে। প্রাসাদ ঘেরা মস্ত বড় একটি উদ্যান আছে। উদ্যানটি তিন হাজার একর হবে এবং চারদিকে কুড়িফুট উঁচু পাথরের দেওয়াল ঘেরা। এই উদ্যানে কয়েকটি অংশ গবাদি পশু, শস্য চাষ ও ফল-ফুলের বাগানের জন্যে নির্দিষ্ট করা আছে।

শাসনকর্তা ও তাঁর পরিবারের পরিচর্যার জন্যে কয়েকটি অদ্ভুত গৃহ-ভৃত্যের সাহায্য নেওয়া হয়। শাসনকর্তা ভূতের রাজা এবং তিনি তাঁর এই ক্ষমতার দ্বারা মৃতদের মধ্যে পছন্দ মতো একজনকে আহ্বান করে (ভূত নামিয়ে) চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেন। কিন্তু তার বেশি নয়। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া তিনি একই ব্যক্তিকে (ভূতকে) তিন মাসের মধ্যে পুনরায় নামাতে পারেন না।

আমরা বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে দ্বীপে পৌঁছলুম। আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক শাসনকর্তার কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন যে দ্বীপে একজন বিদেশী এসেছেন, তিনি আপনার সাক্ষাৎ লাভ করলে নিজেকে ধন্য মনে করবেন। অতএব তাকে অনুমতি দেওয়া হক।

অনুমতি অবিলম্বে দেওয়া হল। আমরা তিনজনেই প্রাসাদের তোরণ অতিক্রম করলুম। দুধারে পাহারা দিচ্ছে সারবন্দী সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী। প্রাচীন ও এক বিচিত্র ধরনের পোশাক তাদের পরিধানে। কিন্তু তাদের মুখে এমন এক অদ্ভুত ভাব বা ভঙ্গি রয়েছে যা দেখে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল। কি রকম ভয় তা আমি প্রকাশ করতে পারব না। দরবারে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা কয়েকটি প্রকোষ্ঠ ও সারবন্দী রক্ষীবাহিনী অতিক্রম করলুম, মাঝে আমাদের দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা হল।

দরবারে প্রবেশ করার পর মহামান্য শাসনকর্তার সিংহাসনের বেদীর সর্ব নিম্ন ধাপের কাছে তিনটি টুলে আমাদের বসতে দেওয়া হল। এই দ্বীপের ভাষা ভিন্ন হলেও শাসনকর্তা 'বালনিবার্বি' ভাষা বোঝেন। তিনি আমার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের কাহিনী শুনতে চাইলেন এবং বললেন রাজদরবারের নিয়মকানুন আমি যথাযথ না মানলেও চলবে। তিনি আঙুল নেড়ে পার্শ্বচরদের চলে যেতে বললেন এবং দেখে অবাক হলুম

যে তারা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা যেন স্বপ্ন দেখছিলুম, হঠাৎ জেগে উঠলুম। আমার বিস্ময় কাটতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। শাসনকর্তা আমার দিকে

তিনি আঙুল নেড়ে পার্শ্বচরদের চলে যেতে বললেন

তাকিয়ে বললেন এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। আমিও যখন দেখলুম আমার সঙ্গী দু'জন বিচলিত হন নি কারণ তাঁরা এখানকার চালচলন ভাল করেই জানেন। তখন আমি আশ্বস্ত হলুম। আমার সাহস ফিরে এল তবুও কিছু ইতস্ততঃ করে আমি আমার কয়েকটি ভ্রমণের কাহিনী বললুম। মাঝে মাঝে পিছন দিকে চেয়ে দেখছি শাসনকর্তার সেই সকল পার্শ্বচররা গেল কোথায়? তারা কি ফিরে এসেছে?

শাসনকর্তা তাঁর সঙ্গে একত্রে আহার করতে বলে আমাকে সম্মানিত করলেন! একদল নতুন ভূত আমাদের আহার পরিবেশন করল। সকাল অপেক্ষা আমার ভয় এখন অনেক কেটে গেছে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রাসাদেই রইলুম, কিন্তু মহামান্য শাসনকর্তাকে সবিনয়ে বললুম আমাকে রাত্রে যেন প্রাসাদে থাকতে বলা না হয়। এই ক্ষুদ্র দ্বীপের রাজধানী শহরে একটি বেসরকারী বাড়িতে আমি ও আমার দুই বন্ধু রাত্রি কাটালুম এবং পরদিন সকালে শাসনকর্তার আদেশানুসারে আবার আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

আমরা এইভাবে দ্বীপে দশদিন কাটালুম, দিনের বেলায় বেশির ভাগ সময় শাসনকর্তার সঙ্গে কাটে আর রাত্রিটা আমাদের বাসস্থানে। ভূত দেখতে দেখতে আমি এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠলুম যে পরে ওদের দেখে আমার কোনো ভাবান্তর হত না। যদিও বা কিছু সংশয় দেখা দিত আমার কৌতূহল তা মিটিয়ে দিত। শাসনকর্তা আমাকে বললেন পৃথিবীর আদি থেকে আমি যে কোনো মৃত ব্যক্তি বা যতজন ইচ্ছে মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করতে পারি এবং তাদের প্রশ্নও করতে পারি। তবে আমার

প্রশ্নগুলি সেই মৃতব্যক্তি যে সময়ে জীবিত ছিল সেই সময়ের মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ থাকে। তিনি আরও বললেন যে আমি সত্য উত্তরই পাব, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত থাকতে পারি। কারণ ভূতদের জগতে মিথ্যার কোনো স্থান নেই।

মহামান্য শাসনকর্তার এই অনুগ্রহ আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করলুম। আমরা যে ঘরে ছিলুম সেখান থেকে রাজার উদ্যান বেশ ভাল দেখা যায়। আমার ইচ্ছে হল আমি জাঁকজমক আর আড়ম্বরপূর্ণ একটা দৃশ্য দেখি। তাই আমি চাইলুম আরবেলা যুদ্ধে জয়লাভ করে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট তাঁর সৈন্যবাহিনীর শীর্ষে ঘোড়ায় চেপে চলেছেন সেই দৃশ্য দেখতে। আশ্চর্য! শাসনকর্তা তাঁর আঙুল বিশেষভাবে নাড়তেই আমরা যে জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলুম ঠিক তার নিচে দেখলুম শির উন্নত করে উদ্যান দিয়ে সৈন্যবাহিনীর শীর্ষে ঘোড়ায় চেপে মহাবীর আলেকজাণ্ডার চলেছেন। আলেকজাণ্ডারকে ঘরে ডাকা হল। আমি ভাল গ্রীক ভাষা জানি না। তাই আলেকজাণ্ডারের প্রাচীন গ্রীক বুঝতে খুব অসুবিধা হল। তিনি আমাকে বললেন স্থির ভাবে জেনে রেখ আমাকে কেউ বিষ খাওয়ায়নি। অতিরিক্ত সুরাপানজনিত জ্বরে আমার মৃত্যু হয়েছে।

তারপর আমি দেখলুম হানিবলকে। আলপস্ পাহাড় পার হচ্ছেন। তিনি বললেন তাঁর তাঁবুতে এক ফোঁটাও ভিনিগার নেই। সিজার এবং পম্পেকে দেখলুম যুদ্ধ আরম্ভ করার ঠিক পূর্বে নিজ নিজ বাহিনীর শীর্ষে। শেষ যুদ্ধে জয়লাভের বিজয় গৌরবে দৃপ্ত সিজারকেও দেখলুম। তারপর দেখলুম একটি বড় সভাগৃহে রোমের সেনেটের অধিবেশন এবং একই সঙ্গে পাশেই বর্তমান কোনো একটি লোক-সভার অধিবেশন। প্রথম অধিবেশনটি দেখে মনে হল যেন বীর ও আধা দেবতাদের দেখছি। আর দ্বিতীয়টি দেখে মনে হল ফেরিওয়ালা, পকেটমার, দস্যু আর দালালের দল।

আমার অনুরোধে শাসনকর্তা সিজার ও ব্রুটাসকেও আমাদের কাছে আসতে বললেন। ব্রুটাসের মহিমাময় চেহারা দেখে আমি অভিভূত। চরিত্রবল, নির্ভীকতা, অটুট মনোবল, দেশপ্রেম ও জীবপ্রেম সব যেন তার মুখের খাঁজে খাজে ফুটে উঠেছে। সিজার ও ব্রুটাসের মধ্যে যে চমৎকার বোঝাপড়া ছিল তা লক্ষ্য করে আমি চমৎকৃত। সিজার আমার কাছে দ্বিধা-বিহীনভাবে স্বীকার করলেন যে তিনি অনেক বড় বড় কাজ করেছেন কিন্তু যেভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেটা তার চেয়েও বড় কিছু। ব্রুটাসের সঙ্গে আমার অনেক কথা হল। কি আমার ভাগ্য! ব্রুটাস বললেন তিনি তাঁর পূর্ববর্তী মহাপুরুষদের সঙ্গে যথা: জুনিয়াস, সক্রেটাস, এপামিনোণ্ডাস, কনিষ্ঠ ক্যাটো এবং সার টমাস মুরের সঙ্গে একত্রে সময় অতিবাহিত করেন। ওঁরা এমনই একটা 'ষড়মহর্ষি' তৈরি করেছেন যেখানে কোনো সপ্তম ব্যক্তির স্থান নেই।

এইভাবে পৃথিবীর অতীত যুগের কত না মহৎ ব্যক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখবার সৌভাগ্য হল। তার বিবরণী পাঠকদের একঘেয়ে লাগবে বলে আমি নিরত থাকলুম। তবে আমি কেবল তাদেরই দেখলুম যারা অত্যাচারীদের দমন করে ব্যক্তিসাধনাকে তুলে ধরেছেন, নিপীড়িত মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি যে পরম সন্তোষলাভ করলুম তা প্রকাশ করা আমার ভাষায় কুলোবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বের আরও কিছু বিবরণ। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সংশোধিত।

প্রাচীনকালে যাঁরা রসসাহিত্য অথবা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করতেন এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখবার উদ্দেশ্যে আমি একদিন শাসনকর্তাকে অনুরোধ করলুম। আমি প্রস্তাব করলুম যে এমন একটা সভায় হোমার ও অ্যারিস্টটলকে আনা হক যেখানে ওদের সমালোচকরাও উপস্থিত থাকবে। কিন্তু তারা যে সংখ্যায় এত বেশি তা আমার জানা ছিল না। কয়েক শত সমালোচক। সকলের ঘরে জায়গা হয় নি, ঘরের বাইরেও অনেকে ছিল। তথাপি ঐ ভিড়ের মধ্যে হোমারকে চিনতে আমার অসুবিধে হয় নি। দু'জনের মধ্যে তিনিই দীর্ঘ ও সুদর্শন। বয়সের অনুপাতে সোজা হয়েই হাঁটছিলেন, চোখ অতি উজ্জ্বল। এমন চোখ আমি পূর্বে কখনো দেখি নি।

অ্যারিস্টটল বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছেন। হাতে যষ্ঠি নিয়ে তাঁকে হাঁটতে হচ্ছে। তাঁর মুখ মনে ছাপ মারবার মতো নয়, মাথার চুল দীর্ঘ, অবিন্যস্ত ও পাতলা। কণ্ঠস্বরও দাগ কাটবার মতো নয়। অচিরেই বুঝতে পারলুম এখানে সমবেত সমস্ত সমালোচক তাঁদের অপরিচিত। সমালোচকরাও তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে চেনেন না। আরও জানতে পারলুম সকলেই সমালোচক নয়। অনেকেই এই দুই মহৎ ব্যক্তিব নামও শোনেন নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি প্রেত ফিসফিস করে আমাকে বলল যে এই সকল সমালোচক ঐ দুই মহৎ ব্যক্তির নিকটে আসতে চায় না। তারা দূরেই থাকতে চায়। কারণ তারা এক সময় ঐ দুই মহৎ ব্যক্তির অত্যন্ত হীনভাবে সমালোচনা করে তাঁদের দুর্নাম রটাতে তৎপর ছিল। এইজন্যে ওদের স্থানও হয়েছে প্রেতলোকের নিম্নস্তরে। ওরা এখন অপরাধবোধে ভুগছে এবং সবাই এখন লজ্জিত।

আমি হোমারের সঙ্গে ডিডাইমাস ও ইউস্টেথিয়াসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে অনুরোধ করলুম যে এরা আপনার কৃপার অযোগ্য তথাপি উনি যেন এদের

সংগে আরও ভাল ব্যবহার করেন। হোমার ওদের কাছ থেকে শুনলেন যে ওরা চায় কোনো প্রতিভার আত্মা কোনো কবির দেহে ভর করুক। এদিকে আমি যখন অ্যারিস্টটলের কাছে স্কোটাস এবং রেমাসকে উপস্থিত করে তাদের বিষয় কিছু বলতে লাগলুম তখন তিনি অধৈর্য হয়ে বললেন যে তোমাদের দলের সকলেই কি তোমাদের মতো আকাট মুর্খ।

তারপর আমি শাসনকর্তাকে অনুরোধ করলুম দেকার্তে এবং গ্যাসেন্দিকে হাজির করতে। তারা এলে আমি তাদের অনুরোধ করলুম তাদের বিশেষ সূত্র ব্যাখ্যা করে অ্যারিস্টটলকে বলতে। এই মহান দার্শনিক সোজাসুজি স্বীকার করলেন যে ভৌত বিদ্যায় তিনি কিছু ভুল করেছেন। কারণ তিনি কিছু বিষয়ে শুধু অনুমান করে লিখেছেন। তবে মানুষ মাত্রেই ভুল করে থাকে। গ্যাসেন্দির এপিকিউরাস মতবাদ তাঁর খুব ভাল লেগেছে। অনুরূপভাবে ভাল লেগেছে দেকার্তের ভার্টিসেস। 'অ্যাটরাকশন' সম্বন্ধেও তিনি সুখ্যাতি করে বললেন বর্তমানের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই তথ্য বাতিল করবে না। তিনি বললেন' নব নব প্রাকৃতিক তত্ত্ব নতুন রেওয়াজ ব্যতীত আর কিছু নয়। যুগে যুগে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং নব আবিষ্কৃত গাণিতিক তত্ত্ব কিছুকাল দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কিন্তু তারও সংশোধন অনিবার্য, কারণ নতুন তথ্য সর্বদাই আবিষ্কৃত হচ্ছে।

পাঁচ দিন ধরে আমি প্রাচীন পণ্ডিতদের সংস্পর্শে অতিবাহিত করলুম। অধিকাংশ রোমক সম্রাটদের দর্শন লাভ করলুম, সেই প্রথম যুগের। শাসনকর্তাকে অনুরোধ করলুম এলিওগেব্যালাসের পাচকদের হাজির করতে এবং আমাদের জন্যে ডিনার প্রস্তুত করে দিতে। কিন্তু কাঁচামালের অভাবে তারা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। স্পার্টার এগসিলাউসাসের একজন ক্রীতদাস এক ডিশ স্পার্টান সুরুয়া তৈরি করে দিল। কিন্তু সেই সুরুয়া আমি এক চামচের পর আর দ্বিতীয় চামচ মুখে তুলতে পারলুম না।

যে দু'জন ভদ্রলোকের সংগে আমি এই দ্বীপে এসেছিলুম তাঁদের কিছু ব্যক্তিগত কাজ আছে। আর তিন দিনের মধ্যে তাঁদের দেশে ফিরতে হবে। এই সময়ের মধ্যে আমি আধুনিক কালের কয়েকজন মৃত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলুম যারা ইংলণ্ড বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে গত দুই তিনশ বছরের মধ্যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কারণ আমি অতীতের এই সব ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করি।

আমি শাসনকর্তাকে-অনুরোধ করলুম যে আট-নয় পুরুষব্যাপী ও পূর্বপুরুষ সমেত এক বা দুই ডজন সম্রাটকে উপস্থিত করা হক। কিন্তু আমি অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয়ভাবে হতাশ হলুম। কারণ হীরকখচিত মুকুট শোভিত সম্রাটদের পরিবর্তে এল এক পরিবারের দুই বেহালাবাদক, তিনজন ফিটফাট সভাসদ এবং ইটালীয় ধর্মযাজক। আর এক দলে এল একজন মঠাধ্যক্ষ, দু'জন যাজক ও একজন পরামাণিক। সম্রাটদের জন্যে আমার যত বেশী ভক্তি শ্রদ্ধা আছে তত বেশি নেই কাউন্ট, মারকোয়েস, ডিউক, আর্ল বা অনুরূপ ব্যক্তিদের জন্য। যদিও আমি খুঁতখুঁতে নই।

কোনো পরিবারের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য কি, কিসের দ্বারা তাদের চেনা যায় এসব আমি এখন ভালভাবেই বুঝতে পারি। আমি এখন বলে দিতে পারি কে কোন পরিবারের এবং তারা তাদের সুন্দর চিবুক কার কাছ থেকে পেলেন। আবার কোনো বংশের দুই পুরুষ কেন জুয়াচোর হল বা আবার কোনো বংশের কয়েক পুরুষ বোকা হল কি করে। কোনো বংশের কোনো পুরুষ পাগল, আবার কোনো পুরুষ ঠগ হল কি করে এসব পারিবারিক বৈশিষ্ট্য আমি বিচার করে বলে দিতে পারি। নিষ্ঠুরতা, মিথ্যাচার এবং ভীরুতা কিভাবে কোনো পরিবারকে চিহ্নিত করে এবং তার কারণ কি ? তাও জানা গেল। সেই পরিবারের প্রতীক চিহ্ন বা কোট অফ আর্মস তাদের যেমন চিনিয়ে দেয় তেমনি চিনিয়ে দেয় এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি। বসন্ত ক্ষয়রোগের স্ফোটক বা অপর কোনো ব্যাধি কোনো বংশে পর পর চলতে থাকে। এ জন্যে দেখলাম কোনো কোনো পূর্বপুরুষ দায়ী। তিনিই রোগটি বংশে সঞ্চার করেছেন। এসব জেনে-শুনে বা দেখেও অবাক হই নি কিন্তু অবাক হলাম রাজামহারাজাদের পরিবর্তে তাদের বংশের ভৃত্য, পরিচারক, খানশামা, সহিস, কোচোয়ান, শিকারী, জুয়াড়ী এবং পকেটমারদের দেখে। অর্থাৎ এদের রক্ত মিশে গেছে রাজারাজড়াদের রক্তের সঙ্গে।

আধুনিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেও আমি হতাশ ও রীতিমতো বিরক্ত হয়েছি। ইতিহাসের বইগুলিতে যাদের নাম বড় অক্ষরে ও সর্বাগ্রে ছাপা আছে, আমি খতিয়ে দেখেছি যে বৃথাই তাদের ওপর গৌরবজনক কৃতিত্ব আরোপ করা হয়েছে। আসলে এজন্যে দায়ী ভাড়াটে লেখকরা। মূর্খদের বলা হয়েছে জ্ঞানী, নিষ্কর্মাদের বানানো হয়েছে কর্মঠ, বিশ্বাসঘাতকদের করা হয়েছে রোমান বীরদের সমতুল্য দেশপ্রেমের প্রতীক স্বরূপ। ধার্মিক করা হয়েছে নিরীশ্বরবাদীকে, অসৎদের বলা হয়েছে চরিত্রবান এবং মিথ্যাবাদীদের বলা হয়েছে সত্যবাদী। কত নিরীহ ও ভাল মানুষদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে বা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। এসব কাজ করেছে অসৎ বিচারক ও মন্ত্রীরা হিংসা ও লোভের বশবর্তী হয়ে। কত না শয়তানকে অত্যন্ত দায়ীত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছে এবং তারা যথেচ্ছ ভাবে ঐ উচ্চ পদের অপমান করেছে কারণ কোনো যোগ্যতাও তাদের নেই। আর এইসব অসৎ ব্যক্তিদের সহায়তা করেছে চোর, জুয়াচোর, বাটপাড়, গুণ্ডা, খুনী, ভাঁড়, দালাল ও কুচরিত্রা রমণীর দল। দেশের মান, সম্মান, জাতির কল্যাণ বা উন্নয়ন সবকিছু তুচ্ছ করা হয়েছে। কত উদ্যোগ, কত বিপ্লব এইসব শয়তানদের জন্যে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের গা বাঁচিয়ে অপরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে বীর বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিছু লেখক আছে যারা সত্য কাহিনী বা পশ্চাৎপটের গুপ্তকাহিনী বলে কত কি কাল্পনিক কাহিনীকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়। যারা সঙ্গে বিষপাত্র নিয়ে রাজাকে কবরে পাঠিয়েছে। কিংবা কোনো রাজা ও মন্ত্রীর গুপ্ত পরামর্শ অথবা কোনো রাষ্ট্রদূতের কোনো ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মুখরোচক কাহিনী ঐসব লেখক নাকি লিপিবদ্ধ করেছে। তারা নাকি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এইসব জানতে পেরেছে।

তাদের কথা আর কি বলব! তাবা ক্ষমার অযোগ্য অথচ এদের কথাই আমরা বিশ্বাস করি।

সংগে বিষপাত্র নিয়ে রাজাকে কবরে পাঠিয়েছে

অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ আমি আবিষ্কার করেছি যা হয়ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করেছে। কিন্তু আসলে তার মূলে যে আছে এক কুচরিত্রা রমণী যে মন্ত্রণা পরিষদ, মন্ত্রী এবং স্বয়ং সম্রাটকেও প্রভাবিত করে অঘটন ঘটিয়েছে। এ খবরও কেউ জানতে পারে না।

একজন সেনাপতি আমার কাছে স্বীকার করলেন যে তিনি অন্যায়ের প্রশ্রয় নিয়ে এবং শঠতার দ্বারা জয়লাভ করেছেন। আর একজন নৌ-সেনাপতি বললেন তিনি ত বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে জিতেছেন। তিনজন রাজা আমাকে বলেছেন যে সৎ, গুণী বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নি। এই সব অঘটন মন্ত্রীর কুপরামর্শ বা তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই ঘটে থাকে। তারা যদি আবার বেঁচে ফিরে আসেন তাহলে এমন কাজ আর কখনও করবেন না। এবং তাঁরা বেশ জোর দিয়েই বললেন যে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দিলে সিংহাসন রক্ষা করা যায় না। সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তিরা অনেক বাধা সৃষ্টি করে।

শাসনকর্তার সহায়তায় আমি এমন কয়েকজন রাজাকে আনালুম যারা বর্তমান কালের কিছু আগে গত হয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে আমার জানার উদ্দেশ্য ছিল এত সাধারণ ব্যক্তি কি করে এত উচ্চপদ ও উপাধি পেলেন বা তারা এত অল্প সময়ে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী কি করে হলেন? বর্তমান সময় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি কারণ জীবিত দেশী বা বিদেশী ব্যক্তিদের মনে আমি আঘাত করতে চাই না (পাঠকদের জানাতে চাই যে আমি আমার দেশকে এসব বিষয়ে জড়াতে চাই না)। এইরকম সুবিধাবাদী ব্যক্তিকেও পরপার থেকে আহ্বান করে আনা হল। রাজা ও ঐসব ব্যক্তিদের কাছ থেকে জানতে পারলুম যে জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যাচার, শঠতা

ইত্যাদিই তাদের উন্নতির মূলে আছে। কিন্তু বিস্মিত হলুম যখন তারা স্বীকার করলেন যে যেনতেন প্রকারেণ অপরকে দমিয়ে শীর্ষে ওঠবার জন্যে তারা অসৎ পথের আশ্রয় নিয়েছে। বিচারকদের ঘুষ দিয়েছে, নির্দোষকে সাজা দিয়েছে, অপরের কৃতিত্ব আত্মসাৎ করেছে। এমন কি নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে দিয়েও পাপ কাজ করিয়েছে। তখন আমি ভেবেছি হ্যাঁ, এরাই পারে, এরা নমস্য। কারণ সোজা পথ দিয়ে হেঁটে এদের সমকক্ষ হবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

আমি জানতাম কোনো কোনো ব্যক্তি তার দেশ ও রাজার জন্যে অনেক মহৎ কাজ করেছে। এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে আমার দেখার ইচ্ছে হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল তাদের নাম কোন ইতিহাসে বা অন্যত্র লেখা নেই। তবে নীচ ও হীন ব্যক্তি, বদমাইস, লুচ্চা ও বিশ্বাসঘাতকদের তালিকায় তেমন কিছু ব্যক্তির নাম আছে। এদের বিষয় ত আমি জানি না তবুও তাদের কয়েকজনকে আনা হল। তাদের দেখে বিষণ্ন মনে হল। তাদের পোশাক ছিন্নভিন্ন। তারা বলল অপমানে দগ্ধ হয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। অনেককে ফাঁসিমঞ্চে বা অন্যভাবে মরতে হয়েছে।

এদেরই মধ্যে একজনের কাহিনী একটু অদ্ভুত মনে হল। তার পাশে আঠার বৎসর বয়স্ক একটি যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটি বলল সে দীর্ঘদিন একটি জাহাজের কমাণ্ডার ছিল এবং অ্যাকটিয়াম সমুদ্র যুদ্ধে সে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ছিন্নভিন্ন করে শত্রুর তিনটি বড় যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়। আর একটি জাহাজকে সে বন্দী হতে বাধ্য করে যে জন্যে অ্যাণ্টনিকে পলায়ন করতে হয় এবং তখনই জয় সুনিশ্চিত হয়। তার পাশে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে তার একমাত্র পুত্র। এই সমুদ্র যুদ্ধে সে নিহত হয়েছে। যুদ্ধ জয় করে সে গর্বিত এবং রোমে ফিরে সে আগাস্টাসের দরবারে দাবি করল একটি বড় জাহাজের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হক। যে জাহাজের কমাণ্ডার নিহত হয়েছে। কিন্তু তার সব কৃতিত্ব অগ্রাহ্য করে দুশ্চরিত্র এক ব্যক্তির পুত্র যে নাকি সম্রাটের এক প্রিয়পাত্রীর আজ্ঞাবাহী এবং যে কখনও সমুদ্র দেখে নি তাকেই কমাণ্ডারের সেই পদ দেওয়া হল।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সে তার জাহাজে ফিরে এল। কিন্তু কাজে অবহেলার জন্যে তাকে কর্মচ্যুত করা হল ও তার জায়গায় ভাইস-অ্যাডমিরালের এক প্রিয় ভৃত্যকে দায়িত্ব দেওয়া হল। সে হতাশ হয়ে রোম থেকে দূরে তার রুগ্ন খামারে ফিরে এসে তার জীবনের বাকি দিনগুলি অতিবাহিত করল। এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করবার জন্যে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হল এবং আমি আগ্রিপ্পাকে আনাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলুম, তিনি ছিলেন সেই যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক অ্যাডমিরাল।

আগ্রিপ্পা এলেন এবং উক্ত কমাণ্ডার যা বলেছেন তা সমর্থন করলেন। আগ্রিপ্পা ক্যাপটেনের প্রশংসা করে বললেন সে নিজের অনেক কৃতিত্ব প্রকাশ করে নি।

সেই সাম্রাজ্যে চরম দুর্নীতির এমন ব্যাপক প্রসার দেখে আমি বিস্মিত হলুম। তবে কেনই বা বিস্মিত হব, সে দেশ বিলাসীতার স্রোতে তখন আকণ্ঠ ডুবে গেছে। পাপ পুণ্যের কোনো পার্থক্য সেখানে নেই, যে রক্ষক সেই তখন ভক্ষক।

এরপর যেসব ব্যক্তিকে আহ্বান করা হল তারা সকলেই অবিচারের শিকার হয়েছে, তাদের কৃতিত্ব ত কখনো স্বীকার করাই হয় নি উল্টে তাদের ঘাড়ে বদনাম চাপান হয়েছে। মাত্র কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই পৃথিবী কতদূর দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলুম। মানুষের এত দূর অবনতি আমাকে বিষণ্ণ করল।

আরও একটা ব্যাপার আমাকে বিষণ্ণ করল তা হল ব্যাপকহারে বসন্ত রোগ। এ রোগ মানুষের মুখের চেহারা খারাপ করে দিয়েছে। স্বাস্থ্য দুর্বল ও আকৃতি ছোট করে দিয়েছে। স্নায়ু, পেশী, দুর্বল করে দিয়েছে, দেহবর্ণ মলিন করে দিয়েছে। ফলে মানুষ হীনমন্যতায় ভুগছে।

যারা জমি চাষ করে কিন্তু প্রয়োজনে রাজার বা জমিদারের হয়ে ইংলণ্ডে যুদ্ধ করে এমন কিছু মানুষ দেখারও অভিলাষ হল। এরা এদের সারল্য, ব্যবহার ও সহবতের জন্যে সুনাম অর্জন করেছিল। এদের আহার, পোশাক, বিচারবুদ্ধি, দেশপ্রেম ও সাহস সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি। কিন্তু এইসব সরল ব্যক্তিদের সামান্য জমি ও কিঞ্চিৎ অর্থের লোভ দেখিয়ে কিভাবে তাদের শোষণ করা হয়েছে এবং তাদের লোভী, অসৎ চরিত্র ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে তা জানতে পেরে লজ্জায় আমি অধোবদন হলুম।

নবম পরিচ্ছেদ

মালডনাডায় লেখকের প্রত্যাবর্তন। নৌকায় লাগনাগে আগমন। লেখক বন্দী। তাঁকে আদালতে পাঠান হল। তাঁর প্রবেশের ধরন। প্রজাদের প্রতি রাজার করুণা।

আমার যাত্রার দিন আগত। গ্লাবডাবড্রিব দ্বীপের মহামান্য শাসনকর্তার কাছে আমি বিদায় গ্রহণ করলুম এবং আমার দু'জন সংগীসহ মালডনাডায় ফিরে এলুম।

এখানে এক পক্ষ অপেক্ষা করার পর একটা জাহাজ পাওয়া গেল। লাগনাগের উদ্দেশ্যে জাহাজ এবার ছাড়বে। আমার সংগী ভদ্রলোক দু'জন এবং আরও কয়েকজন অনুগ্রহ করে আমার সংগে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আমাকে জাহাজে তুলে দিলেন।

এক মাস ধরে জাহাজ চলল। পথে একবার প্রচণ্ড ঝড় উঠল, আমাদের জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে ট্রেড উইণ্ড ধরবার জন্যে পশ্চিম দিকে প্রায় ষাট লিগ বয়ে চলল।

১৭০৮ সালের ২১ এপ্রিল তারিখে আমরা একটি নদীতে প্রবেশ করে ক্লুমেগিং-এ প্রবেশ করলুম। লাগনাগের দক্ষিণ-পূব দিকে এটি সমুদ্র তীরের একটি বন্দর। শহরের এক লিগের মধ্যে আমরা নোঙর ফেললুম এবং পাইলট পাঠাবার জন্যে সংকেত করলুম। দু'জন পাইলট আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের জাহাজে এসে উঠল। পথে জলের নিচে অনেক জায়গায় চড়া ও পাহাড় আছে যেগুলি খুব বিপজ্জনক। পাইলটরা আমাদের জাহাজটিকে নিরাপদে শহরের কাছে নিয়ে গেল। এখানে জল গভীর ও বিস্তৃত, একটা সম্পূর্ণ নৌবহর বেশ সহজেই আড্ডা গাড়তে পারে।

আমাদের জাহাজের কয়েকজন নাবিক অনিচ্ছাকৃতভাবে হক অথবা বিশ্বাসঘাতকতা করেই হক পাইলটদের জানিয়ে দিল যে আমি একজন বিদেশী, অনেক দেশ ঘুরেছি। পাইলট দু'জন সে কথা কাস্টম-হাউস অফিসারদের জানিয়ে দিল। আমি জাহাজ থেকে অবতরণ করার সংগে সংগে ওরা আমাকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করল। কাস্টমস অফিসার আমার সংগে বালনিবারবি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন, ব্যবসা বাণিজ্যের

খাতিরে এই ভাষাটাই এই শহরে প্রচলিত। বিশেষ করে নাবিক লশকররা এই ভাষাটা ভাল করে বোঝে। কাস্টমসের লোকেরা ত বোঝেই।

তাদের প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার বিষয়ে কিছু বিবরণী পেশ করলুম এবং ওদের যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয় সেজন্যে সরলভাবেই ওদের সংগে কথা বললুম। কিন্তু আমি ভেবে দেখলুম আমি কোন দেশের অধিবাসী সেটা এদের না বলাই ভাল। তাই আমি হল্যান্ডবাসী বলে নিজের পরিচয় দিলুম। কারণ আমার উদ্দেশ্য জাপান যাওয়া এবং ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র ওলন্দাজদেরই জাপানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। সেইজন্যে আমি অফিসারকে বললুম বালনিবারবির উপকূলে আমাদের জাহাজডুবি হয়, আমি কোনরকমে তীরে উঠি এবং সেই উড়ন্ত দ্বীপ লাপুটায় পেঁছই (ওরা এই দ্বীপের কথা অনেকবার শুনেছে)। এখন আমি জাপান যাবার চেষ্টা করছি, সেখান থেকে আমি আমার দেশে ফেরবার সুযোগ পেতে পারি।

অফিসার বলল, আদালত থেকে আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাকে এখানে আটক থাকতে হবে। এজন্যে অফিসার অবশ্য অবিলম্বে চিঠি লিখবে এবং পনেরো দিনের মধ্যে তার উত্তর আশা করা যায়।

আমাকে তারপর একটা ভাল বাসগৃহেই নিয়ে যাওয়া হল। তবে সেখানে দরজায় পাহারা রাখা হল। সুবিধের মধ্যে শুধু বাগানে আমি বেড়াতে পারব। যাই হক আমার সংগে ভাল ব্যবহারই করা হল এবং আমাকে রাজ-অতিথি রূপেই সেখানে তারা রাখল। কৌতূহল বশে আমাকে কয়েকজন ব্যক্তি এই সময় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। কারণ তাঁরা শুনেছেন যে আমি এমন সব দূর দূর দেশ ভ্রমণ করে আসছি যার নাম পর্যন্ত তারা শোনে নি।

লাগনাগের বাসিন্দা ও মালডনাডায় কয়েক বছর বাস করেছে এবং আমার সঙ্গে একই জাহাজে এসেছে এমন একটি যুবককে আমি দোভাষী নিযুক্ত করলুম। সে উভয় ভাষাতেই দক্ষ। আমার সংগে যাঁরা দেখা করতে আসতেন আমি এই যুবকের সহায়তার তাঁদের সংগে কথা বলতুম। তবে তাঁদের সংগে বাক্যালাপ শুধু প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

আমরা যে সময়ে আশা করছিলুম সেই সময়ের মধ্যেই আদালতের আদেশ এল। একটা সনন জারি করে বলা হয়েছে যে আমাকে ও আমার অনুচরদের দশটি ঘোড়াসহ একটি দল এসে ট্রালড্রাগডাভ বা ট্রিলড্রগড্রিব-এ (আমার যতদূর মনে পড়েছে দু'ভাবেই উচ্চারণ করা যায়) নিয়ে যাবে। আমার অনুচর বলতে ত বেচারা সেই দোভাষী যাকে আমি নিযুক্ত করেছি। আমার বিনীত নিবেদনে আমাদের দু'জনকে দু'টি খচ্চরে চাপতে দেওয়া হল।

আমাদের যাত্রার অর্ধেক দিন আগে একজন দূত পাঠান হল, আমরা যে যাচ্ছি সে খবর রাজাকে দেওয়ার জন্যে। যাতে রাজা অনুগ্রহ করে এমন একটা দিন ও সময় ঠিক করে রাখতে পারেন যখন আমি তাঁর সম্মুখে হাজির হয়ে তাঁর পা রাখবার চৌকির সামনে ঝুঁকে তার ওপরের ধুলো ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করতে পারি। এটা অবশ্য সাধারণ সৌজন্যমূলক রীতি।

দু'দিন পরে আমি রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে লক্ষ্য করলুম যে আমি বিদেশী বলে দরবারের মেঝে এমন চমৎকারভাবে সাফ করে রাখা হয়েছে যে ধুলো একেবারেই নেই। আমাকে উপুড় হয়ে বুকে হেঁটে রাজার সামনে যেতে হবে। এইভাবে রাজার কাছে যাওয়া বিশেষ একটি সম্মান, কেবল মাত্র অতি উচ্চ সম্মানধারী ব্যক্তিগণকে এই সম্মান দেওয়া হয় যখন তাঁরা রাজদর্শন ইচ্ছা করেন। তবে দর্শন প্রার্থী ব্যক্তির যদি রাজদরবারে কোনো ক্ষমতাশালী শত্রু থাকে, তখন আমি দেখেছি সেই দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তির মুখ ধুলোয় এত ভর্তি হয়ে গেছে যে সে রাজার সম্মুখে হাজির হয়ে কথা বলতে পারছে না অথচ রাজার সামনে থুতু ফেলা বা মুখ মোছা চরম দন্ডনীয় অপরাধ। অতএব এর কোনো প্রতিকার নেই।

আরও একটি প্রথা আছে যা আমি সমর্থন করতে পারি না। রাজা মহাশয়ের যদি ইচ্ছা হয় তাঁর কোনো সভাসদকে অল্প কষ্টসহ মৃত্যুদণ্ড দিতে। তাহলে তিনি আদেশ দেন মেঝেতে একটি বাদামী চূর্ণ ছড়িয়ে দিতে। যেটি বিষাক্ত এবং তা ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করার চব্বিশ ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যু অবধারিত। বিবেচনা করে দেখতে গেলে এই মহানুভব রাজা অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং তিনি তাঁর প্রজাদের জীবনরক্ষা করতে অত্যন্ত সজাগ (আমি মনে করি রাজার এই উদাহরণ অনুকরণযোগ্য)। কারণ এই মহামান্য রাজার অনুকূলে যে সব কথা বলা যায় তার মধ্যে একটি হল যে প্রতিটি দণ্ড সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার সংগে সংগে তিনি আদেশ দেন বিষধুলি ছড়ানো মেঝে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলতে। কেউ এ নিয়ে অবহেলা করলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই কাজ সমাধা করবার জন্যে আমি নিজে রাজাকে আদেশ দিতে শুনেছি।

একবার একজন পরিচারককে মেঝে সাফ করবার নির্দেশ দিতে ইচ্ছে করেই সে ভুল করায় সম্ভাবনাপূর্ণ অভিজাত বংশের এক যুবকের মৃত্যু হয়। অথচ সেই যুবকের মৃত্যু রাজার মোটেই অভিপ্সীত ছিল না। এজন্য রাজা উক্ত পরিচারককে চাবুক মারার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজা অত্যন্ত ক্ষমাশীল। সেই পরিচারক রাজার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিল এবং বলছিল যে বিশেষ আদেশ ব্যতীত সে আর এমন কাজ করবে না। তখন তাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এবার আমি নিজের কথায় ফিরে আসি। আমি যথারীতি বুকে হেঁটে সিংহাসনের চার গজের মধ্যে পেঁাছে ধীরে ধীরে উঠে হাঁটু গেড়ে বসলুম। তারপর জমিতে সাতবার মাথা ঠুকলুম এবং মাথা ঠুকে আমাকে গতরাত্রে শেখানো নিম্নোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করলুম।

"ইকপ্লিং গ্লফথ্রব স্কুটসেরাম ব্লিয়প ম্লাশনাল্ট জুইন নোবাকগাফ স্টিওফাড গার্ডলাভ অ্যাশট।" এই অভিবাদন সূচক বাক্যটি দেশের রীতি অনুসারে লিখিত হয়েছে এবং রাজার দর্শনপ্রার্থী সকল ব্যক্তিকে বাক্যটি রাজার সমক্ষে নিবেদন করতে হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ করলে এর অর্থ এইরকম দাঁড়াবে, "ভগবানের আশীর্বাদ প্রাপ্ত ঈশ্বরতুল্য হে রাজাধিরাজ আপনি সূর্য এবং এগারোটি ও অর্ধাংশ চন্দ্র অপেক্ষা অধিক দিবস জীবিত থাকুন।"

উত্তরে রাজা কিছু বললেন এবং আমি তা বুঝতে না পারলেও নিম্নোক্ত রূপে শেখানো বাক্যটি প্রত্যুত্তরে বললুম, “ফ্লাফট ড্রিন ইয়ালোরিক উউলড্রাম প্রাস্ট্রাড মিরপ্লাশ” যার

[illegible]

অর্থ “আমার জিহ্বা আমার বন্ধুর মুখে” অর্থাৎ আমি যা বলতে চাই তা আমার দোভাষীর মারফতই বলব। সেই যুবককে অবশ্যই ইতিমধ্যে হাজির করা হয়েছিল। এবং তারই মাধ্যমে আমি রাজার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলুম যা রাজা এক ঘণ্টার অধিক সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি উত্তর দিচ্ছিলুম বালনিবারবিয়ান ভাষায় আর আমার দোভাষী আমার কথাগুলি লাগনাগ ভাষায় অনুবাদ করে দিচ্ছিল।

রাজা আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হলেন এবং তিনি তাঁর ব্লিফমারক্লাবকে অর্থাৎ হাই চেম্বারলেনকে আদেশ দিলেন প্রাসাদের মধ্যে আমার ও আমার দোভাষীর জন্যে বাসস্থান ঠিক করে দিতে এবং সেই সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন আহারের ব্যবস্থা করে দিতে। শুধু তাই নয় আমাদের ব্যয়নির্বাহের জন্যে এক বড় থলি স্বর্ণমুদ্রা দিতেও আদেশ দিলেন তিনি।

আমি রাজার সাহচর্যে এবং তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে এদেশে তিন মাস অতিবাহিত করলুম। রাজা আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন এবং এই সময়ে আমার কাছে কয়েকটি সম্মানজনক প্রস্তাবও তিনি করেছিলেন। কিন্তু আমি যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে দেখলুম যে আমার জীবনের বাকি দিন গুলি আমার পক্ষে আমার স্ত্রী ও পরিবারের সঙ্গে অতিবাহিত করাই ভাল।

দশম পরিচ্ছেদ

জনপ্রিয় লাগনাগিয়ান জাতি। স্ট্রলডব্রাগ সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য এবং এ বিষয়ে লেখকের সঙ্গে কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির আলোচনা।

লাগনাগিয়ানরা খুব ভদ্র এবং উদারহৃদয়। তবে প্রাচ্যবাসীদের মতো তারাও নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সজাগ। তথাপি বিদেশীদের কাছে তারা সুশীল ও বিনয়ী। বিশেষ করে যারা রাজানুগ্রহ লাভ করেছে তাদের প্রতি এরা খুব সৌজন্য দেখায়। এদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আমার দোভাষী মারফত তাদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি তাদের কথাবার্তা বেশ উপাদেয়।

একদিন যখন আমি কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছিলুম তখন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বললেন আমি তাদের স্ট্রলডব্রাগদের অর্থাৎ অমর মানুষদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছি কি না। আমি স্বীকার করলুম আমি শুনি নি। তিনি তখন বললেন এদের বিষয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলবেন। তাদের দেশের অমর মানুষদের এই নামে পরিচয় দেওয়া হয়। তারপর তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, যদিও বিরল তবু মাঝে মাঝে কোনো কোনো পরিবারে এমন শিশু জন্মায় যার কপালে ঠিক ডান দিকের ভুরুর ওপরে একটি বৃত্তাকার ছাপ দেখা যায়। এই ছাপ কখনই মুছে যায় না। তিনি বললেন এই ছাপের আকার তিন পেন্স মাপের রৌপ্যমুদ্রার চেয়ে বড় হবে না। কিন্তু সময়ের গতির সঙ্গে এই ছাপও বড় হতে থাকে এবং এর রংও পরিবর্তিত হয়। জাতকের বয়স যখন বারো বছর তখন তার রং হয় সবুজ। এই রং থাকবে পঁচিশ বছর পর্যন্ত। তখন সবুজ রং বদলে হয় ঘোর নীল। তারপর যখন তার বয়স হয় পঁয়তাল্লিশ তখন রং হয় কয়লার মতো কালো। ইতিমধ্যে এই ছাপ আকারে বড় হয়ে বিলিতি শিলিং-এর মতো হয়ে যায়। তবে এরপর আর পরিবর্তন হয় না।

তিনি বললেন যে এইরকম জন্ম এতই বিরল যে তাঁর বিশ্বাস সারা রাজ্যে নরনারী মিলিয়ে স্ট্রুলড্‌ব্রাগের সংখ্যা এগারো শতের বেশি হবে না এবং এর মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন আছে রাজধানীতে এবং এদের মধ্যে তিন বছর আগে একটি বালিকার জন্ম হয়েছে। এমন জন্ম যে কোনো পরিবারে হতে পারে তবে তা নিয়ম বাঁধা নয়, হঠাৎই এমন হয়। স্ট্রুলড্‌ব্রাগদের সন্তানরাও তাদের বাবা মায়ের মতো অমর।

আমি এই বিচিত্র কাহিনী শুনে যারপর নেই পুলকিত হলুম। আমি বালনিবারবিয়ান ভাষা উত্তমরূপে বুঝি ও এই ভাষায় কথা বলতে পারি। যিনি বলছিলেন তিনিও এই ভাষা বোঝেন। তাই পরমানন্দ প্রকাশ না করে আমি থাকতে পারলুম না, হয়ত একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলুম। পুলকিত হয়ে বেশ জোরেই আমি বললুম কি আনন্দ! কি আনন্দ! কি সুখী জাতি! জন্মের পর কোনো না কোনো শিশুর অমর হওয়া ভাগ্যে জোটে! এ জাতি ভাগ্যবান। কারণ এদের মধ্যে অতীতের গুণাবলী ও মহৎ কার্যাবলী জানাবার জন্যে কিছু জীবন্ত সাক্ষী রয়েছে। বর্তমান বংশকে অতীতের সব জ্ঞান গরিমা জানাবার জন্যেও এদের প্রয়োজন। কি সুখী এরা! এদের অমর ইতিহাস ও সেই সঙ্গে বিগত দিনের সমস্ত জ্ঞান প্রদান করবার মত গুরুও এখানে সশরীরে উপস্থিত।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুখী হল সেই সব স্ট্রুলড্‌ব্রাগরা যারা অমরত্ব নিয়ে জন্মেছে। কারণ তাদের সর্বদা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে কাল কাটাতে হয় না। কিন্তু আমার মনে হল রাজদরবারে ত এ ধরনের কপালে কালো ছাপ দেওয়া একটাও মানুষ আমার নজরে পড়েনি। অথচ ঐ চিহ্নটি এতই স্পষ্ট যে নজর এড়াবার কোনো উপায় নেই। তাহলে এই দেশের রাজা যাঁকে আমি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে মনে করি তিনি এমন বহুদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পরামর্শ নিচ্ছেন না কেন? সম্ভবতঃ ঐ সকল অমর জ্ঞানী ব্যক্তি যে সকল নিয়মাবলী আরোপ করতে চান সেগুলি দুর্নীতি পরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে অথবা রাজদরবারের ঢিলেঢালা নিয়মের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর হতে পারে। আমরা অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে যুবক যুবতীরা বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপদেশ মেনে নিতে সর্বদা ইচ্ছুক নয়। যাইহোক রাজা যখন অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর দরবারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ দিয়েছেন তখন আমি আমার দোভাষীর মারফত এ বিষয়ে আমার বক্তব্য খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ করব। তবে রাজা আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন আর নাই করুন আমি অন্তত একটা বিষয়ে এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। মহামান্য রাজা আমাকে এখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি যতদিন এখানে থাকব ততদিন ঐ সকল স্ট্রুলড্‌ব্রাগ মহামানবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে সময় অতিবাহিত করব। অবশ্য তাঁরা যদি আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হন।

সেই ভদ্রমহোদয়ের কাছে আমি আমার এই বক্তব্য পেশ করলুম। তিনি বালনিবারবি ভাষায় একটু হেসে আমাকে বললেন—তাঁর হাসিটি আমি লক্ষ্য করলুম—অবোধ ব্যক্তির কথায় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন হাসেন সেই রকম আর কি—তিনি এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত এবং এখন যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন তিনি

তাঁদের কাছে আমার এই বক্তব্য রাখার অনুমতি চাইলেন। বলা বাহুল্য সে অনুমতি আমি অবশ্যই দিলুম।

তিনি তখন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন যার এক বর্ণও আমি বুঝলুম না। তাঁদের মুখ বা হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি দেখেও আমি আন্দাজ করতে পারলুম না যে তাঁরা কি আলোচনা করছেন।

আলোচনা শেষ করে কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি আমাকে বললেন যে তাঁর বন্ধুগণ (তিনি আমাকে এই বোঝালেন যে তাঁর বন্ধুরা আমারও বন্ধু) অমরজীবনের সুখ ও সুবিধা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য শুনে খুবই প্রীত হয়েছেন তবে তারা জানতে চান যে দৈবক্রমে আমি নিজে যদি একজন স্ট্রুলড্‌ব্রাগ হয়ে অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারি তাহলে আমি কি করে আমার জীবন যাপন করব।

আমি বললুম এমন একটি চমৎকার ও ব্যাপক বিষয় নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়। বিশেষ করে আমার পক্ষে বলার অনেক আছেও। কারণ আমি কত সময় বসে ও শুয়ে চিন্তা করেছি, আমি যদি রাজা হই বা সেনাপতি হই কিংবা বড় একজন জমিদারই হই তাহলে আমি কি করব। অমরত্ব লাভ করলে আমি নিজেকে কি ভাবে নিযুক্ত রাখব, কি কি কাজ করব এবং কিভাবে অবসর যাপন করব, সে নিয়েও আমি ভেবেছি।

আমার যদি এমন সৌভাগ্য হয় যে আমি এই দেশে স্ট্রুলড্‌ব্রাগ হয়ে জন্ম নিলুম তখন নিশ্চয়ই আমি জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য বুঝতে শিখব। এবং তখন আমি চেষ্টা করব কোন্‌ কৌশল বা পদ্ধতি দ্বারা প্রচুর অর্থ রোজগার করা যায়। সেই অর্থ যখন আসতে থাকবে তখন মিতব্যয়িতা ও কেবলমাত্র প্রয়োজন স্থলে অর্থ ব্যয় করে আশা করি মোটামুটি দু'শো বছরের মধ্যে আমি রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি হয়ে যাব। তাছাড়া আমি কিশোর বয়স থেকে কলা ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করব এবং এমন একটা সময়ে পেঁছিব যখন আমি পড়াশোনায় সকলকে ছাড়িয়ে যাব। তারপর আমি নিরপেক্ষ ভাবে জনজীবনের ঘটনাসমূহ রাজাদের বংশানুক্রমের ঘটনাবলী এবং আমার দেখা দৃষ্টিতে মন্ত্রীদের চরিত্র চিত্রণ সব লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করব। উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনাই বাদ দোব না। এই কাজ সম্পন্ন হলে আমি তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি রত্ন ভাণ্ডারে পরিণত হব এবং অবশ্যই জাতির একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হতে পারব।

আমি কখনই বিবাহ করব না। আমার ষাট বৎসর বয়স পূর্তির পরে তো নয়ই। আমি অর্থ সঞ্চয় করে যাব। তবে তার সঙ্গে অতিথি বৎসলও হব। আমি অবশ্যই উন্নতিশীল যুবকদের আমার স্মৃতি ও জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সৎপরামর্শ দোব। ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য যা প্রয়োজন তা আমি আমার অভিজ্ঞতালব্ধ জীবন থেকে সংগৃহীত উদাহরণ দিয়ে তাদের সামনে তুলে ধরব। আমি আমার অমর বন্ধুদের মধ্যেই থাকব এবং তাদের মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও আমার কালের বারোজনকে বেছে নোব যারা হবে আমার নিত্যসঙ্গী। এদের মধ্যে যদি কেউ আমার

সহায়তা চায় তাহলে আমি তাদের আমার জমিদারীর মধ্যে বাস করবার ব্যবস্থা করে দোব এবং আহারের সময় তাদের একজন না একজন আমার সংগে থাকবেই।

আপনাদের মত মরণশীল ব্যক্তিদের সংগে অবশ্যই মেলামেশা করব। তবে তাদের যখন মৃত্যু হবে তখন হয়ত আমার দুঃখ হবে আবার নাও হতে পারে। তখন আমি ফুলের বাগানের কথা ভাবব। কারণ এ বছরে টিউলিপ ফুল ঝরে গেলে আমরা কখনো আফশোষ করি না বরং আগামী বছরের ফুলের আশায় বসে থাকি।

সময় বসে থাকবে না চলতেই থাকবে। আমরাও নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকব না। আমরা যে অভিজ্ঞতা যুগ যুগ ধরে সঞ্চয় করেছি তার সুফল যাতে মানুষ ভোগ করতে পারে সেজন্যে তাদের আমরা উপদেশ দোব, শিক্ষিত করব, সতর্ক করে দোব। এটাই হবে আমার ও অন্যান্য স্ট্রুলডব্রাগদের কাজ এবং আমার বিশ্বাস এভাবেই যুগ যুগ ধরে মানুষ কল্যাণ ব্যতীত যে সব অন্যায় করে আসছে তা থেকে ক্রমশঃ বিরত হতে থাকবে এবং তাদের পতন রোধ করা সম্ভব হবে।

এই অনন্তজীবনের একটি উপভোগ্য পরিচ্ছেদও আছে। ইতিহাসের বহু ঘটনা আমরা দেখতে পাই না বলে আফশোষ করি। কিন্তু তখন আর তা করতে হবে না। কেন না আমরা কত যুদ্ধ, কত শান্তি, কত বন্যা, কত প্লাবন, সাম্রাজ্যের উত্থানপতন, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার দেখতে পাব। তারপর দেখব কত না প্রাকৃতিক পরিবর্তন। আজ যে নদী গর্ব ভরে দুই কূল ছাপিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কাল সে শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনিতে পরিণত হবে। সমুদ্র এ কূল ত্যাগ করে ও কূল ভাঙবে, হয়ত নতুন দেশও আবিষ্কৃত হবে, যার অস্তিত্ব আমরা জানি না। বর্বরজাতি সভ্যজাতিকে ধ্বংস করবে এবং আরও হয়ত সভ্য হয়ে যাবে। আমি দেখব কত নব নব আবিষ্কার, কত না ভেষজ বা কত না যন্ত্র এবং আজ যার ত্রুটি আছে কাল তা সংশোধিত হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আমরা কত না নব নব আবিষ্কার করতে পারব। আজ আমরা যাকে সত্য বলে জানি কাল তা মিথ্যা হয়ে যেতে পারে, আজ যার অস্তিত্ব জানিনা কাল তা হয়ত আবিস্কৃত হবে। ধূমকেতুরা কতবার ফিরে ফিরে আসবে আমি তা দেখব। সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র ও নক্ষত্রদের আবর্তনের গতির হয়ত কত পরিবর্তন হবে তাও জানতে পারব।

অখণ্ডজীবন বা আয়ু পেলে কত কি যে করতে পারব তাই কল্পনা করতে লাগলুম এবং আমি যে সুখী জীবন যাপন করতে পারব সে বিষয়েও আশাবাদী হলুম। আমি আমার কথা শেষ করলুম। আমার বক্তব্য ওরা সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনে নিজেদের মধ্যে ওদের ভাষায় আলোচনা করতে লাগলেন। আমার কল্পনা নিয়েই ওদের আলোচনা। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁরা হাসাহাসি করতে লাগলেন।

অবশেষে সেই ভদ্রলোক যিনি ওদের মধ্যে আমার দোভাষীর কাজ করছিলেন তিনি বললেন যে আমি আমার অনুমানে কিছু ভুল করেছি। সেগুলি আমাকে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। অবশ্য অর্বাচীনতার জন্যই মানুষ এমন ভুল করে থাকে।

তিনি বললেন এই অমর স্ট্রুলডব্রাগ সম্প্রদায় এই লাগনাগ দ্বীপেরই বিশেষত্ব।

বালনিবারবি বা জাপানে এমন অমর মানবের অস্তিত্ব নেই। তিনি নিজে একদা এ দেশের মহামান্য সম্রাটের রাষ্ট্রদূতরূপে প্রেরিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। বালনিবারবিতে ত দেখেছেনই এমন কি জাপানের মানুষরাও বিশ্বাস করে নি যে মানুষ অমর হতে পারে। তারা এদের কথা শুনে অবাক হয়েছিল। অবশ্য উক্ত দেশে থাকবার সময় তিনি লক্ষ্য করেছেন যে মানুষ দীর্ঘ জীবনের অভিলাষী। এমন কি যার এক পা কবরের দিকে চলে গেছে সেও ভাবে অপর পায়ের জোরে সে মরণকে জয় করতে পারবে। বৃদ্ধতম ব্যক্তিও আরও বাঁচতে চায় এবং মনে করে মৃত্যু অপেক্ষা নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। প্রকৃতি তাকে পৃথিবীর সুখ সম্পদ ভোগ করতে দেয় না। কেবলমাত্র এই লাগনাগ দ্বীপেই স্ট্রাল্ডব্রাগদের মতো অমরত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের বেঁচে থাকতে অনীচ্ছা এবং তাদের দেখে আমাদের দ্বীপবাসীরাও অমরত্বের জন্যে মোটেই আগ্রহী নয়।

আমি যে অমর জীবন কল্পনা করছি তা অবাস্তব। কারণ আমি হয়ত ভাবছি যে আমি চিরজীবন চিরযৌবন, অটুট স্বাস্থ্য এবং সীমাহীন শক্তি ভোগ করব। কিন্তু মানুষের কল্পনা যতই সুদূরে প্রসারী হক না কেন মানুষ মূর্খ না হলে এমন চিন্তা করতে পারে না। অতএব প্রশ্ন হল মানুষ যত দীর্ঘদিন বাঁচবে ততদিনই কি সে চিরযৌবন ভোগ করবে এবং সুস্থ জীবনের অধিকারী হয়ে থাকবে? এমন চিন্তা ন্যায় সংগত নয় বরং মানুষকে দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে হলে বয়স বাড়ার সংগে সংগে তাকে জরাগ্রস্ত হতেই হবে। তখন যে সব অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা সে হাসিমুখে সহ্য করবে।

আমরা অন্ততঃ দীর্ঘজীবন চাই না কারণ বৃদ্ধত্ব দীর্ঘ হওয়ার সংগে সংগে আমাদের সব শক্তি কমিয়ে দেয় তখন কষ্ট আরো বাড়ে। তথাপি দেখেছি বালনিবারবি এবং জাপানে অনেকে মৃত্যুকে থামিয়ে রাখতে চায়। মানুষ ইচ্ছামৃত্যু চায় একমাত্র তখনই যখন সে শোক বা রোগ আর সহ্য করতে পারে না। তিনি মনে করেন যে আমি বহু দেশ ভ্রমণ করলেও সেই সব দেশে এবং এমন কি আমার দেশেও বোধহয় অনন্তজীবনকামী মানুষ দেখি নি।

প্রাথমিক কিছু তথ্য সরবরাহ করে তিনি স্ট্রাল্ডব্রাগদের জীবনধারা সম্বন্ধে তারপর বিশেষভাবে কিছু বললেন। তিরিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তারা অন্যান্য মরণশীল মানুষদের মতোই জীবন কাটায় এবং তারপর থেকে তারা ক্রমশঃ বিষণ্ণ ও মনমরা হয়ে পড়ে এবং এইভাবে তারা আশি বৎসর বয়সে পেঁছয়। তার সম্প্রদায়ের সকলেই এই মানসিক বিষাদে ক্লিষ্ট, হয়ত দু একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে। আশি বৎসর বয়সে পেঁছলে, যা এই দেশের মরণশীল মানুষের গড় আয়ু, তারা ভবিষ্যত দিনগুলির কষ্ট ভেবে আরও হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ তারা জানে দিন বাড়ার সংগে সংগে তাদেরও কষ্ট বাড়বে। তাদের কোনো মুক্তি নেই কারণ তারা অমর। ক্রমশঃ তারা খিটখিটে, লোভী, বিষণ্ণ, উদ্দেশ্যহীন ও বাচাল হয়ে পড়ে। লোকজনের সংগে সহজভাবে মিশতে পারে না, শেষপর্যন্ত স্নেহমমতাও হারায়। বড়জোর ছেলের

ছেলে পর্যন্ত কিছু স্নেহ থাকে তারপর সকলকে এড়াতে পারলে যেন বেঁচে যায়। তারা হিংশুটে হয় এবং বৃথাই আকাশকুসুম রচনা করে। তবে তারা বেশি হিংসে করে যুবকদের এবং যে সব মানুষ বৃদ্ধ হয়ে মারা যায় তাদের। যুবকদের দেখে তারা আফশোষ করে এবং এটাই স্বাভাবিক। কোনো মৃত মানুষকেও দেখে তারা আফশোষ করে, তখন ভাবে যাক মানুষটা বেঁচে গেল, এবার চিরবিশ্রাম লাভ করবে যে বিশ্রাম তারা কোনোদিনই লাভ করতে পারবে না। যুবক বয়সে অথবা তার পরে প্রবীণ বয়সে তারা যা কিছু শিখেছে তা তারা আর মনে রাখতে পারে না। এজন্যে তখন তাদের পরামর্শ বা উপদেশ চাওয়া অর্থহীন। এবিষয়ে বর্তমান বা আধুনিক কালের ব্যক্তিরা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তবুও এদের মধ্যে যারা অতীত সম্পূর্ণ ভুলে গেছে এবং একটু ন্যাকা বোকা হয়েছে তারা বরঞ্চ কিছুটা ভাল আছে। কারণ তারা অপরের দয়া দাক্ষিণ্য আকর্ষণ করতে পারে যেহেতু ভাল-মন্দ বোঝার তখন আর তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। এবং এজন্যই তারা অপরের সহানুভূতি সহজে লাভ করে।

স্ট্রলড্‌ব্রাগরা নিজেদের মধ্যেই বিবাহ করে কিন্তু রাজ্যের নিয়ম অনুসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কনিষ্ঠ তার বয়স আশি বৎসর হলেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কারণ তারা মনে করে যে বৃদ্ধ স্বামীও ক্রমশঃ অথর্ব হয়ে পড়ছে এবং সে এখন চিরকাল এ অবস্থায় বেঁচে থাকবে। অতএব এর পক্ষে বৃদ্ধ ও অথর্ব পত্নীর ভার বহন করা সম্ভব নয়।

এদের বয়স আশি বছর হয়ে গেলে আইনের চোখে এরা মৃত। তখন তাদের সম্পত্তি তাদের উত্তরাধিকারীকে দিয়ে দেওয়া হয়। তাদের ভরণপোষণের জন্যে সামান্য কিছু অর্থ নির্দিষ্ট থাকে। আর যারা দরিদ্র তারা সরকারী সাহায্য পায়। আশি বছরের পর তাদের কোনো ক্ষমতা বা অধিকার থাকে না, তারা জমি বেচতে পারে না, লিজ নিতে পারে না। কোনো মামলা মকদ্দমায় সাক্ষী হতে পারে না, সে দেওয়ানী হক বা ফৌজদারি। এবং কোনো দলিলে টিপছাপ বা স্বাক্ষর দিতে পারে না। কি করে দেবে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে তারা ত তখন মৃত।

নব্বই বছর বয়সে তাদের সব দাঁত পড়ে যায়, মাথার চুল উঠে যায়, মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। তখন যা দেওয়া হয় তাই খায়। খেতে হয় তাই খায়, ক্ষুধা বা তৃপ্তি মেটাবার জন্যে নয়। কোনো রোগ হলে তা বাড়েও না কমেও না। কথা বলার সময় তারা জিনিসের নাম ভুলে যায়, মানুষেরও নাম ভুলে যায়। এমনকি কাছের মানুষদেরও নাম মনে করতে পারে না। তারা বই পড়তেও পারে না কারণ স্মৃতিশক্তি এতই কমে যায় যে একটা বাক্যের শেষ অংশ পড়বার আগেই প্রথম অংশ ভুলে যায়। অতএব নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করার এই একমাত্র আনন্দ থেকেও তারা তখন বঞ্চিত।

এই দ্বীপের ভাষা সর্বদা পরিবর্তনশীল এজন্যে এক যুগের স্ট্রলড্‌ব্রাগ অপর যুগের স্ট্রলড্‌ব্রাগের ভাষা বুঝতে পারে না। যার বয়স দুশো বছর হয়েছে সে

বর্তমানকালের একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। কেবল মাত্র প্রচলিত অতি সাধারণ কয়েকটি শব্দ ছাড়া সে কিছুই তখন বুঝতে পারে না। অতএব তারা নিজ বাসভূমে পরবাসীর মতো বাস করে।

নব্বই বছর বয়সে সব দাঁত পড়ে যায়, মাথার চুল উঠে যায়

আমার যতদূর মনে পড়ছে, একজন স্ট্রুলড্‌ব্রাগের পরিচয় এই ভাবেই আমাকে দেওয়া হয়েছিল। এরপর আমি বিভিন্ন বয়স বা যুগের পাঁচ ছ' জন এমন ব্যক্তিকে দেখেছিলুম, তাদের মধ্যে সব চেয়ে কমবয়সী হল প্রায় দুশো বছরের। আমার বন্ধুরা এদের কারও সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দেখা করিয়ে দিতেন। তাদের বলা হ'ত আমি বহু দেশ ভ্রমণ করেছি আমার অভিজ্ঞতা প্রচুর। কিন্তু তাঁদের কণামাত্র আগ্রহ দেখা দিত না, তারা আমাকে কোনো প্রশ্নও করত না। কেবল বলত আমি যেন তাদের কিছু স্লামসকুডাসক দিই অর্থাৎ স্মরণযোগ্য কোনো উপহার। এটা হল কিছু ভিক্ষা চাওয়ারই নামান্তর। কারণ এদেশে ভিক্ষা চাওয়া আইনতঃ নিষিদ্ধ। ভিক্ষা চাইবে কেন ? যদিও যৎসামান্য তবুও সরকার ত তাদের সাহায্য করেন।

অতএব সকল শ্রেণীর মানুষ এই স্ট্রুলড্‌ব্রাগদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে। কোনো পরিবারে স্ট্রুলড্‌ব্রাগ জন্মগ্রহণ করলে তা অশুভ বলে বিবেচিত হয় এবং সেই জন্ম ওদের খাতায় বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। যাতে পরে খাতা দেখে তাদের বয়স নির্ধারণ করা যায়। তবে এই খাতা হাজার বছরের পর আর রক্ষা করা হয় না। অথবা এগুলো কালের প্রভাবে নষ্ট বা বিবর্ণ হয়ে যায়। কিংবা দেশে কোনো গোলমাল হলে সেগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তবে সাধারণতঃ তাদের বয়স ঠিক করা হয় কোন্ কোন্ রাজা বা বিখ্যাত ব্যক্তিকে তারা মনে করতে পারে তার ওপর ভিত্তি করে। তখন ইতিহাস খুলে তাদের বিবৃতি যাচাই করা হয়। তবে তারা তাদের আশি বছর বয়সের পর শেষ রাজার নাম নির্ভুল ভাবে বলতে পারে না।

তাদের দেখে অত্যন্ত কষ্ট হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীদের চেহারা আরও করুণ, বলতে কি বীভৎস। অতি বৃদ্ধ হওয়ার ফলে ত চেহারা ভেঙেচুরে পিণ্ডকায়। কার যে বয়স কত তা বোঝা যায় না, কাদের মধ্যে কত শতাব্দী বয়সের ব্যবধান তাও ধরা শক্ত। এরা মানুষ বলেই মনে হয় না, মনে হয় অদ্ভুত এক জীব।

পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে এরপর অমর হবার আকাংক্ষা আমার মন থেকে একেবারেই মুছে গেছে। যা শুনলুম ও দেখলুম তারপর আমি লজ্জিত। সত্যি এই নিয়ে এত আনন্দ এত কল্পনা করেছিলুম! এমন অসহায় ভাবে ও এত যন্ত্রণা ভোগ করে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে আমি বলব অমরত্বে আমার আর আসক্তি নেই। এর চেয়ে কোনো অত্যাচারী রাজা আমাকে কোনো উপায়ে মেরে ফেলুক তাও বরং কাম্য। কিন্তু এ জীবন নয়। স্ট্রলডব্রাগদের নিয়ে এদের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছিল তা রাজা মশাইয়ের কানে উঠেছিল। তখন তিনি কৌতুকভরে আমাকে বলেছিলেন, জনা দুই স্ট্রলডব্রাগকে তোমার দেশে নিয়ে যাও। তোমার দেশবাসীদের দেখাও জরাগ্রস্ত ব্যক্তির পরিণতি কি এবং আমার মনে হয় তখন এদের দেখে ওরা কেউ দীর্ঘদিন বাঁচতে চাইবে না? আমি হয়ত খরচ ও কষ্ট করে এমন জনা দুই অথর্ব মানুষকে নিয়ে যেতুম কিন্তু এ দেশের আইনে অতি বৃদ্ধকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

স্ট্রলডব্রাগদের জন্যে রচিত এদেশের সব আইনের যথার্থ আমি উপলব্ধি করলুম। এগুলোর যুক্তিও আমি মেনে নিলুম এবং আমি অনুধাবন করলুম যে অপর দেশেও এই রকম আইন চালু করলে ভাল হয়। কারণ বৃদ্ধরা লোভী হয় এবং অতিলোভের বশবর্তী হয়ে তারা যদি কখনো দেশের শাসনক্ষমতা দখল করে সব ক্ষমতা করায়ত্ত করে তাহলে যে কি কাণ্ড ঘটাবে কে জানে। এরা তখন শাসন ত করতেই পারবে না উপরন্তু বিপর্যয় ঘটাবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

লেখক লাগনাগ ত্যাগ করে জাপান যাত্রা করলেন। জাপান থেকে তিনি একটি ওলন্দাজ জাহাজে আমস্টারডামে এলেন এবং সেখান থেকে ইংলণ্ড।

আমি মনে করি স্ট্রলডব্রাগদের এই কাহিনী পাঠকদের কাছে খুবই উপভোগ্য হবে। কারণ এধরনের কাহিনী কোথাও শোনা যায় না। এমন অমর মানুষের অস্তিত্ব আর কোথাও আছে বলেও জানা যায় নি। আমি এত দেশ ঘুরেছি কিন্তু অন্য কোনোও দেশে এরকম দেখি নি এবং আমি ভ্রমণের অনেক বইও পড়েছি কিন্তু কোথাও এমন অমর মানুষদের উল্লেখ নেই। যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে এমন হতে পারে যে সেই লেখক হয়ত এই দেশে এসেছিলেন। অনেকে আবার অপরের বই পড়ে ভ্রমণ কাহিনী লেখেন কিন্তু কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করেন না।

এই রাজ্যের সঙ্গে মহান জাপান সাম্রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা বাণিজ্য চলে আসছে। অতএব এমনও হতে পারে যে কোনো জাপানী লেখক তাঁর কোনো বইয়ে স্ট্রলডব্রাগদের বিষযে লিখেছেন। তবে আমি খুব অল্পদিন জাপানে ছিলুম এবং যেহেতু আমি জাপানী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ সেজন্য এ বিষয়ে জাপানে কোনো খোঁজখবর করি নি। তবে আমি মনে করি ওলন্দাজরা এ বিষয়ে ভাল করে অনুসন্ধান করে আরও বেশি তথ্য সরবরাহ করতে পারবে।

লাগনাগ দ্বীপের মহামান্য রাজাবাহাদুর আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর দরবারে চাকরি নিতে। কিন্তু যখন তিনি বুঝলেন যে আমি দেশে ফিরতে দৃঢ়-সংকল্প তখন তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। শুধু তাই নয় জাপান সম্রাটের নামে আমার জন্যে নিজের হাতে একখানি পরিচয়পত্র লিখে দিয়ে তিনি আমাকে সম্মানিত করলেন। তিনি এই সঙ্গে আমাকে চারশ চুয়াল্লিশটি (এ জাতি জোড় সংখ্যার অনুরাগী) বড় আকারের স্বর্ণমুদ্রা এবং একটি লাল হিরে উপহার দিলেন। হিরেখানি আমি ইংলণ্ডে এগারশত পাউণ্ডে বিক্রি করেছিলুম।

১৭০৯ সালের ৬ মে তারিখে আমি রাজবাহাদুর ও বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলুম। রাজবাহাদুর অনুগ্রহ করে এই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত রাজকীয় বন্দর গ্লানগুয়েনস্টালড পর্যন্ত আমার সঙ্গে একদল রক্ষী দিলেন। ছ'দিনের মধ্যে আমাকে জাপান নিয়ে যাবার জন্যে একটি জাহাজ প্রস্তুত হল। সমুদ্রে আমি পনেরো দিন অতিবাহিত করলুম। জাপানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত জামোসি নামে ছোট একটি বন্দর শহরে আমরা অবতরণ করলুম। শহরটি পশ্চিম দিকে অবস্থিত, একটি খাল উত্তর দিক বরাবর গিয়ে সমুদ্রের একটি খাঁড়ির সঙ্গে মিশেছে। আর এরই উত্তর-পশ্চিম দিকে ইয়েদো নগর অবস্থিত।

জাহাজ থেকে নেমে আমি কাস্টম-অফিসারদের জাপ সম্রাটকে লাগনাগের রাজাবাদুরকে লিখিত আমার চিঠিখানি দেখালুম। লাগনাগের রাজাবাহাদুরের সীলমোহর জাপানীরা উত্তমরূপে চিনত। সীলটি আকারে আমার হাতের চেটোর সমান। সীলমোহরে, রাজা মাটি থেকে একজন ভিখারিকে তুলে ধরছেন, এমন একটা ছবি আঁকা আছে। শহরের শাসকেরা আমার চিঠির বিষয় জানতে পেরে আমাকে একজন মন্ত্রীর সমান মর্যাদা দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁরা সম্মানের সঙ্গে পরিচারকসহ আমাকে আমার মালপত্র সমেত একটি গাড়িতে তুলে ইয়েদো নগরে পাঠিয়ে দিলেন।

সেখানে পেঁছিবার পর আমাকে রাজদরবারে নিয়ে যাওয়া হল। আমি আমার পরিচয় পত্রটি সম্রাটের সামনে পেশ করলুম। আনুষ্ঠানিকভাবে ও সাড়ম্বরে সেটি খোলা হল। তারপর দোভাষীর মারফত আমাকে বলা হল যে আমার কি অভিলাষ তা যেন সম্রাটকে জানান হয়। তাহলে তিনি ভ্রাতৃস্বরূপ লাগনাগের রাজবাহাদুরের খাতিরে আমার অভিলাষ পূর্ণ করবেন।

এই দোভাষীর কাজ হল হল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যাপারে সম্রাটের নির্দেশমতো জাপানের হয়ে কথাবার্তা চালানো। সে আমার মুখ দেখে অনুমান করল আমি ইউরোপবাসী এজন্য সে সম্রাটের কথাগুলি আমাকে ডাচ ভাষাতেই বোঝাচ্ছিল। ভাষাটা সে ভালই বলে। আমিও বললুম আমি একজন ডাচ (যা আমি আগেই বলব স্থির করে রেখেছিলুম) বণিক, জাহাজ ডুবি হওয়ার ফলে এক দূরদেশে কোনোরকমে পেঁছিছিলুম। সেখান থেকে আমি সমুদ্রপথে লাগনাগে পেঁছেছিলুম। এখন সেখান থেকেই জাপানে এসেছি। আমি জানি আমার দেশবাসীরা বাণিজ্য করতে জাপানে আসে, আমি এদেরই সঙ্গে এদের কোনো জাহাজে দেশে ফিরতে চাই। অতএব মহামান্য সম্রাটের কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে আমাকে যেন নিরাপদে নাগাসাক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সঙ্গে আমি আর একটি আর্জি পেশ করলুম যে আমার পৃষ্ঠপোষক লাগনাগের রাজাবাহাদুরের খাতিরে জাপানে আমার দেশবাসীর ওপর আরোপিত পবিত্র ক্রুশকে পদদলিত করার নিয়ম থেকে আমাকে যেন দয়া করে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কারণ ভাগ্য বিড়ম্বনার জন্যে আমি এদেশে এসে পড়েছি। এখানে ব্যবসা করার আমার অভিসন্ধি নেই।

সম্রাটকে আমার এই আবেদনের কথা দোভাষী বলল। তখন সম্রাট বিস্মিত হলেন এবং বললেন আমার দেশবাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম এই ক্রুশ সম্বন্ধে প্রার্থনা করলুম এবং তাঁর সন্দেহ আমি সত্যই একজন হল্যাণ্ডবাসী কি না। তিনি আমাকে একজন খ্রীশ্চান বলে মনে করলেন। যাইহক আমি যা বলেছি, লাগনাগের রাজার খাতিরে এবং আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশেষভাবে তার ওপর বিবেচনা করে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করলেন। এবং ক্রুশ পদদলিত করা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিলেন। তবে ব্যাপারটা কৌশলে মোকাবিলা করতে হবে, তার লোকেরা এমন ভাব দেখাবে যেন তারা কাজটা ভুলক্রমে করে ফেলেছে। কারণটা তিনি বললেন, আমার দেশবাসীরা অর্থাৎ ডাচরা যদি রহস্যটা জানতে পারে তাহলে যাবার সময় জাহাজে তারা আমার গলা কেটে ফেলবে। এরকম বিশেষ একটি অনুগ্রহের জন্যে আমি দোভাষী মারফত রাজাবাহাদুরকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানালুম। সেই সময়ে একদল সৈন্য নাগাসাক যাচ্ছিল, তাদের সেনাপতিকে আদেশ দেওয়া হল আমাকে যেন নিরাপদে সেখানে পেঁছে দেওয়া হয়। ক্রুশের ব্যাপারটা চেপে যাওয়ার জন্যে তাকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হল।

দীর্ঘ এবং কষ্টকর ভ্রমণের শেষে ১৭০৯ সালের জুন মাসের ৯ তারিখে আমি নাগাসাক পেঁছলুম। অচিরেই আমি অ্যামস্টারডামের ৪৫০ টনের মজবুত জাহাজ 'আমবয়না'-এর নাবিকদের সঙ্গে ভিড়ে গেলুম। লাইডেনে পড়াশোনা করবার সময় আমি হল্যাণ্ডে অনেকদিন কাটিয়েছি, সেজন্যে আমি ডাচ ভাষাটা উত্তমরূপে বলতে পারি। আমি শেষবার কোথা থেকে আসছি তা নাবিকরা শীঘ্রই জানতে পারল। তারা আমার সমুদ্র যাত্রা এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে লাগল। আমি তাদের সংক্ষেপে কিছু বললুম, কিছু সত্য, কিছু মিথ্যা। কিন্তু অধিকাংশই গোপন রাখলুম।

হল্যাণ্ডের অনেক মানুষকে আমি চিনি। বাবা মায়ের নাম বানিয়ে বললুম। বললুম তাঁরা গুয়েলডারল্যাণ্ডে বাস করেন। সাধারণ মানুষ, জেলায় একরকম অপরিচিত। হল্যাণ্ড পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া বাবদ ক্যাপটেন (জনৈক থিওডোরাস ভ্যানগ্রুল্ট) কিছু দাবি করলেন। কিন্তু যখন শুনলেন যে আমি একজন সার্জন তখন তিনি আমাকে প্রচলিত হারের অর্ধেক ভাড়ায় নিয়ে যেতে রাজি হলেন। কিন্তু এই শর্তে যে যাত্রাপথে আমি সার্জন হিসেবে কাজ করব।

জাহাজে ওঠবার আগে কোনো লশকর আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি সেই অনুষ্ঠানটি পালন করেছি কি না। আমি উত্তরটা এড়িয়ে যেতুম, বলতুম সম্রাটও তাঁর দরবারকে আমি সর্ববিষয়ে সন্তুষ্ট করেছি। কিন্তু একটা হিংশুটে ও পাজী লশকর তার অফিসারকে বলল আমি নাকি ক্রুশ পদদলিত করি নি। কিন্তু যাদের ওপর আমাকে নিরাপদে পেঁছে দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তারা অযথা নাক গলানর জন্যে ওকে ধরে ওর পিঠে বাঁশের বাড়ির দশ ঘা লাগাল। এরপর আমাকে এই প্রশ্ন নিয়ে কেউ বিরক্ত করে নি।

এ যাত্রায় উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি। অনুকূল বাতাস পেয়ে আমরা নিরাপদে কেপ অফ গুড হোপ পেঁছিলুম। পানীয় জল নেবার জন্যে আমরা সেখানে কিছুকাল থাকলুম। ১৬ এপ্রিল তারিখে আমরা আমস্টারডাম পেঁছিলুম কিন্তু যাত্রাপথে রোগে তিনজন মারা গিয়েছিল, আর একজন গিনি উপকূলের কাছে মাস্তুল থেকে জলে পড়ে ডুবে গিয়েছিল। আমস্টারডাম থেকে আমি ঐ শহরেরই একটি ছোট জাহাজে ইংলণ্ডে পেঁছিলুম।

বাড়ি পেঁছে স্ত্রী ও সন্তানদের সুস্থ দেখে নিশ্চিন্ত হলুম

তারপর ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল তারিখে পৌছলুম ডাউনসে। পরদিন সকালে পুরো পাঁচ বছর ছ মাস পরে আমি আমার জন্মভূমিতে পদার্পণ করলুম। আমি সোজা রেডরিফ যাত্রা করলুম এবং সেই দিনই বিকেল দুটোয় বাড়ি পেঁছে স্ত্রী ও সন্তানদের সুস্থ দেখে নিশ্চিন্ত হলুম।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ ভাগ

হুঁইনহঁমদের দেশে

গ্যালিভার—১৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

লেখক বেরোলেন সমুদ্র যাত্রায় এক জাহাজের কাপ্তেন রূপে—তাঁর অধীনস্থ নাবিকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তাঁকে দীর্ঘদিন নিজের কেবিনে আটকে রাখার পর, নামিয়ে দিল এক অজানা দেশের সমুদ্র সৈকতে। —লেখক যাত্রা করলেন সে দেশের অভ্যন্তরে, ইয়াহু নামে এক অদ্ভুত প্রাণীর মুখোমুখি হলেন—তারপর দেখা পেলেন দুজন হুঁইনহ্মের।

প্রায় মাস পাঁচেক আমার দিব্যি আরামে কাটল স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু সত্যি কখন ভাল আছি, সে বোঝার মতো শিক্ষালাভ তো হয়নি আমার। ফলে, আমার স্ত্রীকে অন্তঃস্বত্তা অবস্থাতেই রেখে 'অ্যাডভেঞ্চার' নামে একটা ৩৫০ টন বাণিজ্য জাহাজের কাপ্তেন হয়ে সমুদ্রযাত্রার সুযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ ফের ঘর ছাড়লাম। জাহাজ পরিচালনার ব্যাপারটা আমি ভালই বুঝতাম ; তাছাড়া সমুদ্রের বুকে শুধুই ডাক্তারি করতে আর ইচ্ছে করল না। বরং দরকার পড়লে তবেই চিকিৎসা করা যাবে, এই মনোভাব নিয়ে রবার্ট পিয়োরফয় নামে এক নিপুণ শল্য চিকিৎসককে আমার জাহাজে চাকরি দিলাম।

পোর্টস্‌মাথ থেকে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর আমাদের যাত্রা শুরু হ'ল ; ১৪ই দেখা হ'ল 'ব্রিস্টল' জাহাজের কাপ্তেন পোককের সঙ্গে টেনারিফে, তাঁর জাহাজ চলেছে কামপীচি উপসাগরে, গাছ কেটে গুঁড়ি বয়ে নিয়ে আসার জন্য। ১৬ তারিখে এক ঝড়ের দাপটে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। ফিরে আসার পরে শুনেছি যে তাঁর জাহাজ দুর্ঘটনায় পড়ে ডুবে গিয়েছিল, এবং মাত্র একজন কেবিন বয় ছাড়া কেউই বাঁচেনি। সে একটি অত্যন্ত সৎ লোক, এবং ভাল নাবিকও বটে ; কিন্তু নিজের মতামতের বিষয়ে সে একটু বেশি রকম স্পষ্টবক্তা ছিল, এবং অন্যান্য অনেকের মতো সেটাই হ'ল পরে তার মৃত্যুর কারণ। সে যদি আমার উপদেশ মেনে চলত, তাহ'লে আজ তার পরিবার ও আমার সঙ্গে সে বাড়িতে নিরাপদেই থাকতে পারত।

রোগে অসুস্থ হয়ে আমার জাহাজে বেশ কিছু নাবিক মারা গেল। ফলে বারবাডোজ ও লীওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ থেকে কিছু নতুন লোক আমাকে বাধ্য হয়েই নিয়োগ করতে হ'ল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই টের পেলাম যে এই নতুন নাবিকেরা প্রত্যেকেই ভুতপূর্ব জলদস্যু। জাহাজে মোট নাবিক ছিল পঞ্চাশ জন। আমার ওপর নির্দেশ ছিল দক্ষিণ সাগরে রেড ইণ্ডিয়ানদের সংগে বাণিজ্য করা ; সেই সংগে নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করা। কিন্তু নতুন আসা এই বদমায়েসগুলো অন্য নাবিকদের মন আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলে ষড়যন্ত্র করল যে আমাকে বন্দী করে জাহাজ দখল করে নেবে।

পরিকল্পনা মাফিক একদিন সকালে সবাই একসংগে আমার কেবিনে ঢুকে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলল ; ভয় দেখাল যে, যদি বেশি নড়াচড়া করি, তো ওই অবস্থায় আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে সমুদ্রের জলে। আমি নিরুপায় হয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। আমার শপথে তাদের বিশ্বাস হ'ল, কারণ আমার বাঁধন খুলে দিয়ে শুধুমাত্র একটা পা শেকল দিয়ে খাটের পায়ার সংগে আটকে রেখে তারা চলে গেল। অবশ্য কেবিনের দরজায় গুলিভরা পিস্তল হাতে একজন সান্ত্রী দাঁড় করিয়ে রাখল ; তাকে বলে গেল, আমি যদি পালাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করি, তাহলে সে যেন সংগে সংগে আমাকে গুলি করে। আমার খাদ্য-পানীয় নিয়মিত পাঠানো হ'ত, কিন্তু কেবিনের মধ্যে থেকে বাইরে কিছু দেখার কোন উপায় আমার ছিল না। জাহাজের কর্তৃত্ব পুরোই নাবিকদের হাতে। তাদের পরিকল্পনা জলদস্যু বৃত্তি করে স্প্যানিশ জাহাজের ওপর হামলা চালানো। কিন্তু সেজন্য আরও লোকবল দরকার। তাই তারা রেড ইণ্ডিয়ানদের সংগে ব্যবসা করে প্রথমে জাহাজের মালগুলো বেচে, সেই টাকা নিয়ে নতুন লোক সংগ্রহের জন্য মাদাগাস্কার যাবে ঠিক করল।

এই ফন্দী অনুযায়ী সপ্তাহের পর সপ্তাহ জাহাজ ভেসে চলল। তার রাস্তা জানার কোন উপায়ই আমার নেই, কারণ ততদিনে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে, ওরা আমাকে মাঝে মাঝেই খুন করে ফেলবার যে হুমকি দেয়, তা শেষ পর্যন্ত কাজে পরিণত করবেই।

১৭১১ সালের ৯ই মে জেমস্ ওয়েলশ্ নামে একটা লোক এসে ঢুকল আমার কেবিনে। সে আমাকে জানাল যে তার ওপর কাপ্তেনের হুকুম আছে আমাকে ডাঙায় নামিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি তাকে বহু কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু সবই বৃথা। এমন কি নতুন কাপ্তেনটি কে, তা পর্যন্ত সে আমাকে কিছুতেই বলল না। শেষ অবধি আমার সবচেয়ে ভাল জামা-কাপড় পরে আমি তাদের কয়েকজনের সংগে একটি নৌকায় বাধ্য হয়েই চড়ে বসলাম। সংগে জিনিষ বলতে কিছু অন্তর্বাস এবং শুধু-মাত্র আমার ছোট তলোয়ারটি। এছাড়া আরও কিছু টুকিটাকি দরকারী জিনিষ অবশ্য সংগে নিতে দিল। আর শেষ একটা ভদ্রতা করল এই যে, আমার পকেটে কেউ হাত ঢোকাল না। আমার যাবতীয় টাকা-পয়সা সবই আমি সংগে নিয়েছিলাম, সেগুলো কেড়ে নিলে কিছুই করার থাকত না।

প্রায় এক লীগ নৌকো বেয়ে যাওয়ার পরে আমাকে একটি বেলাভূমিতে নামিয়ে দিল ওরা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কোন দেশ, এর নাম কি? দেখা গেল, ওরা কেউই তা জানে না। শুধু বলল যে, কাপ্তেন বহুদিন আগে থেকেই ঠিক করে

একসঙ্গে আমার কেবিনে ঢুকে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলল

রেখেছিল, সব মাল বেচা হয়ে গেলেই যে স্থলভাগ নজরে আসবে সেখানেই আমাকে নামিয়ে দেওয়া হবে। জোয়ার আসার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা কিছুক্ষণ পরেই আমাকে বিদায় জানিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল।

সেই জনহীন বেলাভূমি ছেড়ে কিছুটা এগোবার পর একটা উঁচু জমি পাওয়া গেল। সেখানে বসে আমি চিন্তা করতে লাগলাম এবার কি করা যায়। কিছুক্ষণ পরে একটু তাজা বোধ করতেই আমি উঠে এগিয়ে চললাম আরও ভেতর দিকে। অন্ততঃ দু' একটা বর্বর জাতির লোকের দেখা তো পাবই। আমার সঙ্গে কিছু ঝুটো গয়না, কাঁচের আংটি এবং অন্যান্য এই ধরণের খেলনাপাতি ছিল; এগুলির বিনিময়ে আমার প্রাণরক্ষা করা যাবে নিশ্চয়ই। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে ওঠা দীর্ঘ গাছের সারি দিয়ে জমিগুলো সব বিভক্ত। মাঠে প্রচুর ঘাস; এবং বেশ কিছু ওটের ক্ষেত এপাশে ওপাশে। আমি খুব সন্তর্পণে হাঁটছিলাম; বলা তো যায় না, কোথা থেকে হয়তো একটা তীর এসে দেহে বিঁধে গেল!

কিছু দূর যাবার পর দেখলাম একটা পায়ে-চলা পথ। সেই পথে কিছু মানুষের পায়ের ও গরুর খুরের ছাপ, কিন্তু অধিকাংশ ছাপই ঘোড়ার খুরের। সেই পথ ধরে অনেকটা এগোবার পর হঠাৎ সামনে একটা ক্ষেতের মধ্যে কয়েকটা অদ্ভুত জীবকে

দেখতে পেলাম। কয়েকটা আবার গাছেও বসেছিল। তাদের বিকৃত, কিম্ভুত চেহরা দেখে আমি বেশ দ'মে গেলাম। আমার দিকেই তাদের কয়েকটা এগিয়ে আসছে দেখে আমি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লাম, যাতে তাদের ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়।

দেখলাম প্রাণীগুলোর মাথা ও বুক চুলে ঢাকা ; কারো চুল কোঁকড়ানো, কারোর বা শিথিল, সোজা। চিবুকে ছাগলের মতো দাড়ি, আর পিঠের মাঝখান ও পায়ের সামনের দিকে লম্বা লোমের রেখা। কিন্তু তাদের বাকি শরীর একেবারে লোমবিহীন ; চামড়ার রঙ বাদামী। লেজ নেই, পশ্চাদ্দেশেও লোম নেই, কিন্তু ঠিক মলদ্বারের চারপাশে একগোছা লোম। প্রকৃতি দেবী বোধহয় ওটি তাদের অংগটি রক্ষণের জন্যই দিয়েছেন, কেননা আমি দেখলাম তারা মানুষের মতো মাটিতে বসে এবং পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েও থাকে। তাদের পায়ের ডগায় ঈগলের মতো বক্র নখর, তার সাহায্যে তারা কাঠবিড়ালীর মতো দ্রুত গাছে চড়তেও পারে। মাঝে মাঝে দুর্দান্ত ক্ষিপ্র গতিতে লাফিয়ে বা দৌড়ে তারা এদিক ওদিক যাওয়া আসা করছিল। মাদী জন্তুগুলো আকারে পুরুষগুলোর চেয়ে ছোট। তাদের মাথায় লম্বা শিথিল চুল, আর বাকি শরীর ছোট লোমে আবৃত কেবল মলদ্বার ছাড়া। তাদের বুক সামনের দুপায়ের মাঝখানে ঝুলে থাকে ; হাঁটার সময় অনেকের বুক প্রায় মাটিতে ঠেকে যায়। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই চুলের রঙ নানারকম—বাদামী, লাল, কালো ও হলুদ।

আমি এতো দেশে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু কোথাও এমন কুৎসিৎ জীব দেখতে পাইনি, বা কোন জীবকে দেখামাত্রই আমার মনে কখনো এরকম বিতৃষ্ণা জাগেনি। আমি ঘৃণাভরে উঠে ফের পথ ধরে চলতে শুরু করলাম, কারণ পথ যখন আছে, তখন সভ্য মানুষের বসতি থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুদূরে যেতেই ওই কুৎসিৎ প্রাণীগুলোর একটা সোজা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে গোল গোল চোখে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমার মতো মানুষ সে ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। তারপর নানারকম বিকৃত মুখভংগী করতে করতে সামনের ডান পাটা ওপরে তুলল— আমাকে মারবার জন্য, নাকি নেহাত কৌতূহলের বশে কে জানে—কিন্তু আমি একটুও দ্বিধা না ক'রে আমার ছোট তলোয়ারটার চ্যাপটা পাশের দিক দিয়ে তাকে জোরে একঘা লাগিয়ে দিলাম। ইচ্ছে করলেই তার মুণ্ডুটাও আমি কেটে ফেলতে পারতাম, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের বিরাগভাজন হবার ভয়ে সে কাজ করতে সাহস হ'ল না। ঘা খেয়ে জন্তুটা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে প্রবল কণ্ঠে এতো জোরে ডেকে উঠল যে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই প্রায় চল্লিশটা জন্তু এসে আমার চারপাশে ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করে দিল, আর সেই বিকট মুখভঙ্গী করতে লাগল। আমি দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সাঁই সাঁই করে তলোয়ার ঘোরাতে লাগলাম। কাছে ঘেঁষতে না পেরে কতকগুলো জন্তু লাফিয়ে গাছের ডালে উঠে আমার মাথার ওপরে একযোগে মলত্যাগ করতে শুরু করে দিল। নেহাত আমি একেবারে গুঁড়ির গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

ছিলাম বলে ওই মল আমার গায়ে মাথায় খুব একটা পড়ল না, কিন্তু তার তীব্র, কটু দুর্গন্ধে আমার দমবন্ধ হবার দাখিল হ'ল।

এই দূরকথার মধ্যে হঠাৎ দেখলাম সবকটা জন্তু যতো জোরে পারে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাকে দেখে যে তারা পালাল, তা দেখতে পেলাম না। আমি ফের পথে নেমে কয়েক পা এগোনোর পরই বাঁদিকে তাকিয়ে দেখলাম ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একটা ঘোড়া আস্তে হেঁটে আসছে। এই ঘোড়াটাকে দেখেই জন্তুগুলো পালিয়েছে। আমার কাছাকাছি এসে আমাকে দেখে ঘোড়াটা প্রথমে চমকে গেল। পরমুহূর্তেই সামলে উঠে সে অবাক বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে লাগল। আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে আমার হাত-পা ভাল করে নিরীক্ষণ করল। আমি হয়তো আমার রাস্তায় এগিয়ে যেতাম, কিন্তু ঘোড়াটা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে, যদিও তার ব্যবহারে কোনরকম হিংস্রতার চিহ্ন নেই মোটেই।

আমরা দুজনে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে আমি একটু সাহসে ভর করে জকিদের ভঙ্গীতে তার ঘাড়ে হাত বোলাতে গেলাম। কিন্তু আমার এই ভদ্রতায় জন্তুটা খুশি হওয়ার বদলে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য সহকারে তার সামনের বাঁ পা-টা তুলে আমার হাতটা সরিয়ে দিল। তারপর সে কয়েকবার চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ করে হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। কিন্তু তার হ্রেষাধ্বনিতে এমন একটা বিশেষ সুর ও তালের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলাম, যে মনে হ'ল জন্তুটা কোন একটা নিজস্ব ভাষায় কথা বলছে!

এমন সময়ে আর একটা ঘোড়া এসে হাজির হ'ল। দুটোতে পরস্পরের সামনে অত্যন্ত শিষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে প্রথমে নিজেদের সামনের ডান পায়ের খুর দুটো ঠোকাঠুকি করল, তারপর পালা করে কয়েকবার নানা স্বরে এমন ভাবে হ্রেষারব করল, যাতে আমার মনে হ'ল তারা পরস্পরের সঙ্গে নিশ্চয় কথা বলছে। তারপর দুজনে কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে পাশাপাশি সামনে পেছনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল, যেন খুব একটা জরুরী বিষয়ে আলোচনা করছে। মাঝে মাঝে আবার ঘুরে দুজনেই আমার দিকে লক্ষ্য রাখছিল, পাছে আমি পালিয়ে না যাই।

নির্বোধ জন্তুদের এরকম ব্যবহার দেখে আমি একেবারে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। এই দেশের অধিবাসীরা যদি এদের এরকম বিচারবুদ্ধি দিয়ে থাকে, তাহ'লে তারা নিশ্চয়ই জগতের সবচেয়ে জ্ঞানী জাতি। একথা ভেবে আমি মনে মনে বেশ স্বস্তিবোধ করলাম। ভাবলাম যে ঘোড়া দুটো নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকুক, আমি এগিয়ে যাই; কোন বাড়ি বা গ্রাম দেখতে পাবোই, নয়তো অধিবাসীদের কারোর দেখাও পাবো নিঃসন্দেহে। কিন্তু যেই না আমি যেতে পা বাড়িয়েছি, অমনি ছিটছিট ধূসর রঙের ঘোড়াটা, যে প্রথমে এসেছিল, জোরে ডেকে উঠল। তার ডাকের মধ্যে এমন একটা অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল যে আমার মনে হ'ল তার অর্থ আমি বুঝতে পারছি। আমি ফিরে দাঁড়িয়ে সে আর কোনো নির্দেশ দেয় কিনা তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার মনের মধ্যে উঠে আসা একটা অজানা ভয়কে আমি

কোনমতে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করছিলাম। কেননা, এবারের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার শেষ যে কি হবে, তা মোটেই আমার বোধগম্য হচ্ছিল না।

ঘোড়া দুটি এবারে আমার সামনে এসে আমার মুখ ও হাত দুটো মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করল কিছুক্ষণ। ধূসর ঘোড়াটা তার সামনের ডানপায়ের খুর দিয়ে আমার টুপিটাকে এমন ঠেলাঠেলি শুরু করল যে, শেষ পর্যন্ত আমি বাধ্য হয়ে টুপিটাকে খুলে আবার ভাল করে মাথায় বসিয়ে নিলাম। তা দেখে সে ও তার বাদামী রঙের সঙ্গীটি প্রচণ্ড আশ্চর্য হয়ে গেল।

দ্বিতীয় জন আমার ঢিলে কোটের তলার দিকটা নেড়েচেড়ে দেখে প্রথম ঘোড়াটির সঙ্গে আবার বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। আমার ডান হাতের ওপরে পায়ের খুর বুলিয়ে সে বেশ অবাক হয়ে গেল হাতটা নরম দেখে। হঠাৎ সে হাতটার ওপর এমন জোরে চাপ দিল যে আমি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলাম। তারপর থেকে তারা দুজনেই বেশ আলতো ভাবে আমার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করে দেখতে লাগল। আমার জুতো-মোজা তাদের বেশ চিন্তায় ফেলেছে বোঝা গেল। বার বার জুতোজোড়া ছুঁয়ে দেখে তারা বিভিন্ন সুরে হ্রেষারব করে পা-মাথা নেড়ে নানা ভঙ্গী করতে লাগল—ঠিক যেন দুই দার্শনিক কোন একটা অজ্ঞাত, অভুতপূর্ব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সেটার সমাধান করার চেষ্টা করছে।

সব মিলিয়ে এই দুই জন্তুর ব্যবহার এতো সুশৃঙ্খল ও বুদ্ধিদীপ্ত লাগল যে আমার বিশ্বাস জন্মাল, নিশ্চয়ই এরা দুজন জাদুকর, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজেদের চেহারা পালটে এখন আমাকে নিয়ে মজা করছে। আর নয়তো, ওই দেশে যে মানুষেরা থাকে, তাদের থেকে আমার চেহারা এতোই আলাদা, যে তারা সত্যিই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এই ভেবে আমি তাদের সম্বোধন করে বললাম: হে ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বিশ্বাস আপনারা উভয়েই জাদুকর এবং যে কোন ভাষাই তাহ'লে আপনাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব। সুতরাং আমি আপনাদের বিনীত ভাবে জানাচ্ছি যে, আমি এক হতভাগ্য ইংরেজ, দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশে এসে পড়েছি। আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনাদের যে কেউ সত্যিকারের ঘোড়ার মতো আমাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে কোন বাড়িতে বা গ্রামে পেঁছে দিন, যাতে আমার দুরবস্থার অবসান হয়। আমার এই উপকারের প্রতিদান স্বরূপ আমি আপনাদের একটি ছুরি ও একটি বালা উপহার দেব। কথা বলতে বলতে ছুরি ও বালাটি আমি পকেট থেকে বার করে সামনে বাড়িয়ে ধরলাম।

আমি যতক্ষণ কথা বলছিলাম, ঘোড়া দুটো চুপ করে দাঁড়িয়ে প্রতিটি শব্দ গভীর মনোযোগ সহকারে শুনল। আমি থামবার পর তারা পরস্পরের মধ্যে হ্রেষারবে ফের কথাবার্তা আরম্ভ করল। আমি এবার খুব সহজেই বুঝতে পারলাম তাদের ভাষায় তারা সমস্ত রকম মনের ভাব বেশ স্পষ্ট প্রকাশ করছে, এবং এই অশ্বভাষার শব্দগুলিকে বর্ণমালায় রূপ দেওয়া খুব শক্ত নয়। অন্ততঃ চীনে ভাষা এর চেয়ে অনেক বেশি দুর্বোধ্য। তাদের কথার মধ্যে 'ইয়াহু' শব্দটা বেশ কয়েকবার শুনতে

পেলাম। শব্দটার মানে যদিও মোটেই বুঝলাম না, তবু আমি মনে মনে শব্দটার উচ্চারণ কয়েকবার অভ্যেস করে নিলাম।

একটু পরে তারা কথা থামাতেই আমি যথাসম্ভব ঘোড়ার চিঁহিঁহিঁ ডাকের অনুকরণে বেশ জোরে 'ইয়াহু' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। এতে দুজনেই বেশ চমকে গেল। ধূসর ঘোড়াটি দুবার জোর 'ইয়াহু' বলে উঠল, ঠিক যেন আমাকে সঠিক উচ্চারণটা শেখাচ্ছে। আমিও তাকে নকল করে দুবার শব্দটা উচ্চারণ করলাম। প্রত্যেক বারই আমার উচ্চারণ আগের বারের থেকে ভাল হ'ল, যদিও নিখুঁত মোটেই নয়। তখন বাদামী ঘোড়াটি আরেকটি শব্দ বলে উঠল। এটা উচ্চারণ করা অনেক দুরূহ; আমাদের ভাষায় মোটামুটি এইভাবে লেখা যেতে পারে—হুইঁনহঁম'। দু' তিন বার চেষ্টা করার পর উচ্চারণটা আমার কিছুটা রপ্ত হ'ল। আমার ক্ষমতা দেখে দুটি ঘোড়াই বিস্মিত হয়ে গেল।

খুব সম্ভব আমারই সম্বন্ধে আরও কিছু কথা বলার পর দুজনে পরস্পরের সামনের ডান পায়ের খুর ঠোকাঠুকি করে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। তারপর ধূসর ঘোড়াটি ইঙ্গিতে আমাকে আগে আগে চলতে বলল। উপায়ান্তর না দেখে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। তার মতো দ্রুত হাঁটতে না পেরে চলার গতি যেই একটু শ্লথ করেছি, অমনি সে মাথা নাড়িয়ে বলে উঠল, 'হুঁউঁন, হুঁউঁন!' তার এই নির্দেশের অর্থ অনুমান করে আমি আকারে-ইঙ্গিতে তাকে বোঝালাম যে আমি ক্লান্ত, অতো তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছি না। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাকে বিশ্রামের সুযোগ করে দিতে লাগল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লেখককে এক হুঁইনহম নিয়ে গেল তার বাড়িতে—বাড়ির বর্ণনা—লেখকের অভ্যর্থনা—হুঁইনহমদের খাদ্য—মাংসের অভাবে লেখকের কষ্ট ও পরে স্বস্তি—সেই দেশে লেখকের খাদ্যাভ্যাস।

প্রায় তিন মাইল চলার পর আমরা একটা লম্বা ধরণের বাড়িতে এসে পেঁছলাম। বাড়িটা কাঠের তৈরী, চারপাশের খুঁটিগুলো মাটিতে পোঁতা। আর এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত কঞ্চির বেড়া দেওয়া। বাড়ির ছাদটা নীচু, খড়ে ছাওয়া। এইবারে আমি একটু স্বস্তি পেয়ে পকেট থেকে কতকগুলো খেলনা বার করলাম—যেমন সব খেলনা আমেরিকার বর্বর রেড ইণ্ডিয়ানদের খুশি করতে পর্যটকেরা দেয়—আমার আশা হ'ল যে এগুলো দেখলে বাড়ির অধিবাসীরা আমাকে নিশ্চয় সাদর অভ্যর্থনা জানাবে।

ধূসর ঘোড়াটির ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকে দেখলাম একটা বিশাল ঘর, তার মেঝেটি মসৃণ কাদামাটির, এবং একদিকের পুরো দেওয়াল জুড়ে একটি ঘাস-খড় রাখার তাক ও তার নীচে একটি লম্বা, বিরাট জাবপাত্র। ঘরে তিনটি টাট্টু ও দুটি মাদী ঘোড়া ছিল। তারা কিন্তু খাচ্ছিল না। টাট্টু তিনটে পা ছড়িয়ে বসেছিল, আর ঘুড়ী দুটো গৃহস্থালির কাজ করছিল। আমি দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যে জাতি সাধারণ পশুকে শিক্ষা দিয়ে এমন উন্নত স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে, তারা যে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জাতি, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই রইল না। এর পরমুহূর্তেই ধূসর ঘোড়াটি ঢুকে কর্তৃত্বপূর্ণ স্বরে দু' তিনবার ডেকে উঠল, অন্য ঘোড়াগুলি তাকে উত্তর দিল।

এই ঘরের ওপাশে তিনটি ঘর, এক সরলরেখায় অবস্থিত। ঘরগুলোর দরজা সব একটার ঠিক বিপরীতে আর একটা। আমি ধূসর ঘোড়াটির ইশারায় তার পেছনে দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে আমার উপঢৌকনগুলি বার করে গৃহকর্তা ও

কর্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার হাতে ছিল দুটো ছুরি তিনটে ঝুটো মুক্তোর বালা, একটা ছোট আয়না ও একটা পুঁতির মালা। ঘোড়াটা আরো দু' তিনবার হ্রেষা ধ্বনি করে উঠল। আমি কান পেতে রইলাম যে উত্তরে কোন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পাব। কিন্তু বিভিন্ন কয়েকটা হ্রেষাধ্বনি ছাড়া আর কিছুই কানে এল না। আমার মনে হ'ল যে বাড়িটা নিশ্চয় কোন এক বিখ্যাত বা বিত্তশালী অধিবাসীর—না হলে ঢোকার আগে এতো ঝামেলা পোহাতে হ'ত না। কিন্তু এরকম একজন ক্ষমতাবান লোকের কর্মচারীরা সবাই ঘোড়া কেন, তা বুঝলাম না। আমার ভয় হ'তে লাগল যে হয়তো দীর্ঘদিন বন্দীদশা ও কষ্টভোগের ফলে আমার মাথা বিগড়ে গেছে।

আমি গা ঝাড়া দিয়ে সজাগ হয়ে ঘরটার চারদিকে দৃষ্টিপাত করলাম। এই ঘরটারও জিনিষপত্র প্রথমটারই মতো, শুধু চাকচিক্য একটু বেশি। আমি কয়েকবার দু' চোখ রগড়ালাম, কিন্তু তাকিয়ে প্রত্যেকবার সেই একই জিনিষ দেখতে পেলাম। হয়তো স্বপ্ন দেখছি, এই মনে করে আমি নিজের হাতে, কোমরে কয়েকবার চিমটি কাটলাম। কিন্তু নাঃ, জেগেই তো আছি! এইবার আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে চারপাশে যা কিছু দেখছি, কিছুই আসল নয়, সবই ইন্দ্রজাল বা পিশাচবিদ্যার প্রভাব। কিন্তু বেশিক্ষণ এসব কথা ভাবার আগেই অন্য ঘরের দরজায় ধূসর ঘোড়াটি এসে
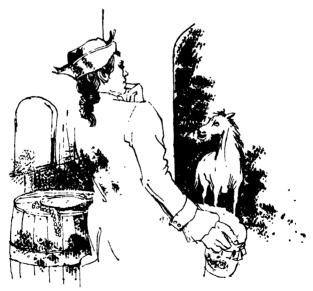
ধূসর ঘোড়াটি এসে আমায় ডাকল

আমাকে ডাকল। তৃতীয় ঘরটিতে ঢুকে দেখলাম নিখুঁত ভাবে বোনা একটি পরিষ্কার ঝকঝকে খড়ের মাদুরের ওপর বসে রয়েছে একটি শান্তদর্শন মাদী ঘোড়া, সঙ্গে একটি বাচ্চা ঘোড়া ও একটি ছোট মাদী ঘোড়া।

আমি ঢোকার পরেই মাদী ঘোড়াটি উঠে আমার কাছে এসে ভালভাবে আমাকে দেখে একটা অত্যন্ত ঘৃণাভরা দৃষ্টি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ধূসর ঘোড়াটির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। আমার প্রথম শেখা শব্দ 'ইয়াহু' বেশ কয়েকবার উচ্চারিত হতে শুনলাম। তখনো পর্যন্ত আমি শব্দটার মানে জানি না, যদিও শীঘ্রই এই শব্দটি আমার চিরস্থায়ী মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কারণ ধূসর ঘোড়াটি 'হুঁউঁন, হুঁউঁন' বরে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা উঠোনে। তার ওপারে একটু দূরে আর একটা বাড়ি।

এই বাড়িটায় ঘোড়াটির সঙ্গে ঢুকে আমি ফের তিনটে সেই প্রথমে দেখা ঘৃণ্য জীবকে দেখলাম, গাছের কন্দ মূল আর কোন জন্তুর মাংস খাচ্ছে। পরে জানলাম যে মাংসটা গাধা আর কুকুরের, বা কখনো রোগে বা দুর্ঘটনায় মৃত গরুর। জীবগুলো সব কটাই গলায় শক্ত লতার দড়ি দিয়ে খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। তারা মাংসের টুকরোগুলো বাঁকা নখে ধরে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল।

মনিব ঘোড়াটি একটা টাট্টু ভৃত্যকে হুকুম করল ওই জীবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টাকে মুক্ত করে বাইরে উঠোনে নিয়ে আসবার জন্য। সেখানে তার পাশে আমাকে দাঁড় করিয়ে প্রভু-ভৃত্য দুজনে আমাদের মুখ খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ ও তুলনা করে বারংবার 'ইয়াহু, ইয়াহু' বলে হ্রেষাধ্বনি করতে লাগল।

আমি এক সীমাহীন আতঙ্ক মিশ্রিত বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে গেলাম, কারণ দেখলাম যে ওই চরম ঘৃণ্য জীবটা আসলে একটি মানুষ। অবশ্য তার মুখটা চওড়া ও চ্যাপ্টা, নাকটা খ্যাঁদা, ঠোঁট দুটো পুরু এবং মুখগহ্বর প্রশস্ত। কিন্তু সমস্ত বর্বর জাতির দধ্যেই তো চেহারার এই বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায় ; কারণ ওইসব বর্বরদের শিশুরা হয় মাটিতে গড়াগড়ি দেয় বা বুকে হাঁটে, নয়তো তাদের পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় মায়েদের কাঁধে মুখ ঘষে—এর ফলে তাদের নাক মুখ চ্যাপ্টা হয়ে যায়। ইয়াহুটার সামনের পায়ের সঙ্গে আমার হাতের গঠনে কোন তফাৎ নেই ; শুধু ওর নখগুলো অনেক লম্বা, তালু দুটো অত্যন্ত কর্কশ ও বাদামী রঙের এবং পিছন দিকটা ঘন লোমে ঢাকা। আমাদের পায়েও ওই একই সাদৃশ্য ও পার্থক্য, যদিও ঘোড়াগুলো তা জানত না, কারণ আমি জুতো-মোজা পরে ছিলাম। এক কথায়, আমাদের পুরো শরীরটাতেও ওই ঘন লোম আর রঙ ছাড়া সবই এক।

ঘোড়াগুলোর সবচেয়ে মুশকিল হ'ল মুখ ও হাত বাদে ইয়াহুর সঙ্গে আমার বাকি শরীরের অমিল দেখে। আসলে আমি পোশাক পরে ছিলাম, এবং পোশাক সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। টাট্টু ভৃত্যটি আমার দিকে একটা কন্দমূল বাড়িয়ে ধরল ; আমি সেটা হাতে নিয়ে শুঁকে, আবার যথাসম্ভব ভদ্রভাবে ফেরত দিয়ে দিলাম। তখন সে ইয়াহুদের কাছ থেকে এক টুকরো গাধার মাংস এনে আমার সামনে ধরল। সেটায় এমন দুর্গন্ধ যে ঘৃণায় মুখ কুঁচকে আমি সরে দাঁড়ালাম। ইয়াহুটাকে দিতেই সে গোগ্রাসে লোভীর মতো খেয়ে নিল। তারপর টাট্টুটি আমাকে এক গোছা খড় দেখাল, তারপরে একটি পাত্র ভর্তি ওট। আমি মাথা নাড়িয়ে জানালাম যে কোনটাই

আমার খাদ্য নয়। আমি এবার বুঝতে পারলাম যে আমার মতো মানুষদের দেখা যদি না পাই, তবে আমাকে পুরো উপোস করে মরতে হবে। ইয়াহুগুলো দেখতেই মানুষের মতো, কিন্তু ওগুলোর মতো সবদিক দিয়ে ন্যক্কারজনক, ঘৃণ্য জীব আমি কখনো আগে দেখিনি। যতোদিন আমি ওই দেশে ছিলাম, ইয়াহুদের প্রতি আমার ঘৃণা ততোই দিন দিন বেড়েছিল।

ইয়াহুদের প্রতি আমার এই বিতৃষ্ণার প্রকাশ দেখে মনিব ঘোড়া ইয়াহুটাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। তারপর সামনের ডান পাটা তার মুখের কাছে তুলে ধরে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল আমি কি খেতে চাই। তার এইভাবে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে পা তোলা দেখে আমার ভীষণ অবাক লাগল। যাই হোক, তাকে আমার খাদ্য সম্পর্কে কি করে ঠিক বোঝাব, এ ভেবে আমি মহা দুশ্চিন্তায় পড়লাম। হঠাৎ দেখলাম একটা গরু যাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে গরুটাকে দেখিয়ে দুধ দোওয়ার ভঙ্গী করলাম। এইবার কাজ হ'ল। আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘোড়াটি একটি ঘুড়ীকে আদেশ দিল একটা ঘর খুলে দিতে। ঘরের মধ্যে দেখি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে মাটির ও কাঠের পাত্রে দুধ সাজানো রয়েছে। দাসীটি আমাকে এক পাত্র দুধ দিতে আমি তা এক নিঃশ্বাসে পান করে ফেললাম। এইবার নিজেকে অনেক তাজা বোধ হ'ল।

দুপুরবেলা দেখি একটা গাড়িকে চারটে ইয়াহু টেনে নিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। গাড়িতে বসে আছে একটি সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী চেহারার বৃদ্ধ ঘোড়া। বোধ হয় কোন দুর্ঘটনায় তার সামনের বাঁ পাটি জখম হয়েছিল, সেইজন্য সে পেছনের পায়ে ভর করে গাড়ি থেকে নামল। আমাদের ধূসর ঘোড়ার বাড়িতে তার দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। তাকে সাদরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধূসর ঘোড়া ও তার পরিবারের সকলে বৃদ্ধ ঘোড়াটির সঙ্গে বাড়ির শ্রেষ্ঠ ঘরটিতে খেতে বসল। তাদের খাবারের দ্বিতীয় পদ দেখলাম দুধে ঘোটানো ওট। শুধু বৃদ্ধটি সেটা গরম অবস্থায় খেল, অন্য সকলে ঠাণ্ডা। তাদের জাবপাত্রগুলি ঘরের মাঝখানে গোল করে সাজানো, প্রত্যেকটি অন্যটির থেকে কাঠের ছোট পাটাতন দিয়ে আলাদা করা। এর চারপাশে ঘিরে খড়ের গদীর ওপর ঠিক মানুষের মতো ঘোড়ারা বসে খেতে লাগল। মাঝখানে ছিল একটা খড় ভর্তি বড় তাক, তার থেকে প্রতিটি জাবপাত্রে একটি করে তক্তা নেমে গেছে। ফলে প্রত্যেকে তার নিজের মতো ঘাস বা খড় টেনে নিয়ে নিজের জাবপাত্রে সহজেই মিশিয়ে নিতে পারে।

পুরো ভোজনের মধ্যে আমি একটা সুন্দর ভব্যতা ও নিয়মমাফিক শিষ্টতা লক্ষ্য করে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। বিশেষ করে বাচ্চা ঘোড়া ও ঘুড়ীটির ব্যবহার তো খুবই নম্র। প্রভু ও প্রভুপত্নী তাদের অতিথির প্রতি অত্যন্ত প্রফুল্ল অথচ বিনীত ভাব দেখাচ্ছিল। ধূসর ঘোড়া আমাকে তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল। আমাকে নিয়ে তাদের মধ্যে অনেক কথা হচ্ছিল বুঝতে পারলাম—কারণ আগন্তুক বৃদ্ধ থেকে থেকেই আমাকে দেখছিল এবং তিনজনেই বারবার 'ইয়াহু' শব্দটি বলছিল।

আমি এই সময় হাতে দস্তানা পরেছিলাম। তা দেখে ধূসর ঘোড়াটি হতবুদ্ধি

হয়ে গেল। তার সামনের পা তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে বিস্মিত হওয়ার ভঙ্গী করে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল যে আমি যেন হাত দুটোকে তাদের আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে দস্তানা দুটোকে খুলে পকেটে ভরে রাখলাম। এই দেখে সকলে আবার কথা বলতে লাগল। আমি দেখলাম সকলে আমার ব্যবহারে বেশ সন্তুষ্ট। এর ফলও কিছুক্ষণের মধ্যেই পেলাম। প্রথমে আমি যে ক'টি তাদের ভাষার শব্দ শিখেছি, সেগুলি আমাকে বলতে বলা হ'ল। তারপর খেতে খেতে মনিব ঘোড়া আমাকে ওট, দুধ, আগুন, জল ইত্যাদির নাম শেখাতে লাগল। ছোটবেলা থেকেই নতুন ভাষা দ্রুত শেখার একটা ক্ষমতা আমার মধ্যে আছে ; ফলে আমি সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলি সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে লাগলাম।

ভোজন শেষ হওয়ার পর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে মনিব ঘোড়া বোঝাল যে আমি কিছু না খাওয়ায় সে বেশ ভাবিত। তাদের ভাষায় ওটকে বলা হয় 'হ্লুনু'। আমি দু তিনবার এই শব্দটা উচ্চারণ করলাম। কারণ যদিও প্রথমে আমি ওট খেতে রাজি হইনি, কিন্তু ফের বিবেচনা করে দেখলাম যে ওট থেকে কোনভাবে রুটি জাতীয় কিছু একটা তৈরী করে সেটা দুধ দিয়ে খেয়ে কোনক্রমে প্রাণধারণ করা যেতে পারে, অন্ততঃ যতদিন না এখান থেকে পালিয়ে অন্য কোন দেশে আমার মতো মানুষদের কাছে যেতে পারছি।

ঘোড়াটির আদেশে তৎক্ষণাৎ আমার সামনে একটি কাঠের ট্রে ভর্তি ওট এসে গেল। আমি ওটগুলোকে বেশ করে আগুনে সেঁকে, ঘষে ঘষে তুষগুলো ছাড়িয়ে ফেললাম ; তারপর সেগুলোকে দুটো পাথরের মাঝখানে ঠুকে গুঁড়ো জল দিয়ে মেখে একটা ময়দার তালের মতো করলাম। এই জিনিষটাকে আগুনে সেঁকে গরম দুধের সঙ্গে খাওয়া গেল।

গোড়ার দিকে এই খাবার আমায় অত্যন্ত বিস্বাদ লাগত, খাওয়ার পর অবশ্য বহু জায়গায় লোকে এ জিনিষ খায়। ক্রমে কিছুদিন খাওয়ার পর অবশ্য আমার সয়ে গিয়েছিল। জীবনে এর আগেও এতবার বিপাকে পড়েছি যে, আমার অভিজ্ঞতা ছিল কেমন সহজে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট করা যায়। এই সঙ্গে এই কথাও বলতে হয় যে, যতদিন ওই দ্বীপে ছিলাম, আমার কখনো বিন্দুমাত্র অসুখ করেনি। অবশ্য মাঝে মাঝে ইয়াহুদের চুল দিয়ে তৈরী জালের ফাঁদ পেতে আমি পাখী বা খরগোশ ধরতাম ; প্রায়ই খাওয়ার উপযোগী শাক বা গুল্ম খুঁজে এনে সেদ্ধ করে রুটির সঙ্গে স্যালাড হিসেবে খেতাম ; কখনো বা দুধ থেকে একটু মাখন তৈরী করে অবশিষ্ট জলীয় অংশটা পান করতাম।

প্রথমে নুনের অভাবটা খুব বোধ করতাম, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিনা নুনে খেতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমাদের মধ্যে নুনের ব্যবহার আসলে একটা বিলাস ছাড়া কিছু নয়, এবং প্রথম নুন খাওয়া শুরু হয়েছিল মদ্যপানের সঙ্গী উদ্দীপক বস্তু হিসেবে। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় মাংস অবিকৃত রাখা ছাড়া নুনের আর কোন দরকার বস্তুতঃ নেই। কারণ মানুষ ছাড়া অন্য কোন

জীবই নুন খেতে ভালবাসে না। হুইনহ্‌মদের দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত কোন খাবারে আমি নুনের স্বাদ সহ্য করতে পারতাম না।

আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনেক কথা বললাম। অন্য ভ্রমণকারীরা হয়তো এ বিষয়ে একটা পুরো বইকেই ভরিয়ে ফেলবে, যেন তাদের খাওয়ার ভালমন্দের ব্যাপারে পাঠকেরা ব্যক্তিগত ভাবে জড়িত। আমার এটুকুও বলার উদ্দেশ্য একটাই ঃ লোকেদের বোঝানো যে তিন বছর ওই দেশে ওই রকম অধিবাসীদের মধ্যেও আমার বেঁচে থাকার মতো খাবার যোগাড়ে অসুবিধে হয়নি।

সন্ধ্যের দিকে মনিব ঘোড়া বাড়ি থেকে ছয় গজ দূরে ইয়াহুদের আস্তাবলের থেকে আলাদা একটা ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিল। সেখানে খড়ের শয্যার ওপর আমার নিজের পোশাকগুলোই মুড়ি দিয়ে আমি নিশ্চিত আরামে নিদ্রা গেলাম। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার এর চেয়ে অনেক ভাল থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লেখক দেশীয় ভাষা শিখতে সচেষ্ট হলেন—তাঁর প্রভু হুঁইঁনহ্‌ঁম তাঁকে শিক্ষায় সাহায্য করতে লাগলেন—ভাষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা—ক্ষমতাশালী বেশ কয়েকজন হুঁইনহ্‌ঁম কৌতুহলের বশে দেখতে এল লেখককে—লেখক কর্তৃক তাঁর প্রভুর কাছে নিজ সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দান।

এইবার আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম এই দেশের ভাষা শেখার জন্য। আমার প্রভু (অর্থাৎ ধূসর ঘোড়াটি; আমি এখন থেকে তাঁকে এই নামেই অভিহিত করব), তাঁর ছেলেমেয়ে এবং দাসদাসী প্রত্যেকেই আমাকে তাদের ভাষা শেখাতে অত্যন্ত উৎসুক ছিল। কারণ তাদের চোখে একটা পশুর এরকম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যবহার প্রায় অলৌকিক বলে মনে হ'ত। আমি প্রতিটি বস্তুর দিকে আঙুল দেখিয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করতাম, তারপর একা বসে আমার দিনপঞ্জীতে সেগুলি লিখে রাখতাম এবং পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করে করে আমার ভুল উচ্চারণকে শুদ্ধ করে নিতাম। এই ব্যাপারে একটি টাট্টু ভৃত্য আমাকে খুবই সাহায্য করত।

কথা বলার সময়ে তারা নাক ও গলার মাধ্যমে শব্দ উচ্চারণ করে। এদিক দিয়ে আমার জানা ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে 'হাই ডাচ' ও 'জার্মান' এদের ভাষার সমগোত্রীয়, যদিও এই ভাষা অনেক বেশি লাবণ্যময় ও তাৎপর্যপূর্ণ। রাজা পঞ্চম চার্লস প্রায় একই কথা বলেছিলেন যে, যদি কখনো তিনি তাঁর ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে তা হবে 'হাই ডাচ' ভাষায়।

আমার প্রভুর কৌতুহল যেমন বেশি, ধৈর্য তেমনি কম। তিনি নিজেই প্রত্যেকদিন বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আমাকে শেখাতে লাগলেন। আমি যে একটা ইয়াহু, সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন, যদিও আমার শেখার প্রবণতা, ভদ্রতা ও পরিচ্ছন্নতা তাঁকে অবাক করত। কারণ ওই পশুগুলো ছিল সর্বদিক থেকেই ঠিক এর বিপরীত।

তাঁর সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কারণ ছিল আমার পরনের পোশাকগুলো, এবং

তিনি প্রায়ই নানাভাবে বোঝার চেষ্টা করতেন এগুলো আমার শরীরের অঙ্গীভূত কিনা। কারণ পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে না পড়লে আমি কখনো পোশাক খুলতাম

ঘুমিয়ে না পড়লে আমি কখনো পোশাক খুলতাম না

না, আবার ওরা ওঠার আগেই পরে নিতাম। আমি কোথা থেকে এসেছি, কি করে যুক্তি বুদ্ধি অর্জন করেছি ইত্যাদি জানার জন্য আমার প্রভুর খুব আগ্রহ ছিল। ওঁদের শব্দ থেকে আমার দ্রুত বাক্য গঠনের ক্ষমতা দেখে তিনি আশান্বিত হলেন যে আমার কাহিনী আমার মুখ থেকেই শুনতে পাবেন। আমার স্মৃতিকে সাহায্য করতে আমি সব শব্দগুলি ইংরেজী অক্ষরে লিখে রাখতাম এবং বাক্যগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে রাখতাম। কিছুদিন পরে প্রভুর সামনেই আমি একাজ করতে শুরু করলাম। আমি কি করছি তা বোঝাতে আমার বেশ ঝামেলা হয়েছিল, কারণ বই বা সাহিত্য সম্বন্ধে হুঁইঁনহ্‌মদের কোন ধারণাই ছিল না।

প্রায় দশ সপ্তাহ পরে আমি তাঁর অধিকাংশ বুঝতে শুরু করলাম; এবং তিন মাসের পর থেকে মোটামুটি উত্তরও দিতে সক্ষম হলাম। আমি দেশের কোন অংশ থেকে এসেছি একথা জানতে তিনি খুব উৎসুক ছিলেন। একথাও বারবার জিজ্ঞেস করতেন যে বিচার-বুদ্ধিশীল জীবদের অনুকরণ করতে আমাকে কারা এবং কেমন করে শিখিয়েছে; কারণ ইয়াহুগুলো (যাদের সঙ্গে আমার মাথা, মুখ ও হাতের অবিকল সাদৃশ্য তিনি দেখতে পেতেন) অত্যন্ত ধূর্ত ও পাজি এবং তাদের কিছু শেখানো প্রায় অসাধ্য।

আমি তখন তাঁকে বলতে লাগলাম যে, আমি এসেছি সমুদ্রের ওপারে বহু দূরের এক দেশ থেকে, আমার মতো আরো অনেক জীবের সঙ্গে, গাছের অঙ্গ দিয়ে তৈরী একটা ফাঁপা জলযানে চড়ে। আমার সঙ্গীরা আমাকে জোর করে এই দেশে নামিয়ে

দিয়ে চলে গেছে। বেশ কষ্ট করে, নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে তবেই প্রভুকে আমি এসব কথা পুরো বোঝাতে পারলাম।

সব শুনে তিনি উত্তর দিলেন যে হয় আমি ভুল বকছি, নয়তো আমি 'তাই বলছি যা নেই' (তাঁদের ভাষায় 'মিথ্যা' শব্দটা নেই)। তিনি জানতেন যে সমুদ্রের পরপারে দেশ থাকা অসম্ভব, এবং একদল পশুর পক্ষে একটা জলযানকে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ইচ্ছামতো যেদিকে খুশি চালনা করাও সম্ভব নয়। তিনি আরো নিশ্চিত ছিলেন যে, এমন কোনো জীবিত হুঁইঁনহ্‌ম নেই যে এই রকম একটা জলযান তৈরী করতে পারে, বা ইয়াহুদের ওপর বিশ্বাস করে সেটার ভার দিতে পারে।

তাঁদের ভাষায় 'হুঁইঁনহ্‌ম' বলতে বোঝায় 'ঘোড়া'। এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'প্রকৃতির ত্রুটিহীন উৎকর্ষ'।' আমি প্রভুকে বললাম যে এখন পর্যন্ত সমস্ত ভাব প্রকাশ করতে পারছি না; তবে যত দ্রুত সম্ভব আমি উন্নতি করার চেষ্টা করব এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে বিস্ময়কর কাহিনী শোনাতে পারব। তিনি তাঁর নিজের ঘুড়ী ও বাচ্চাদের, এবং ভৃত্যদেরও নির্দেশ দিলেন, সুযোগ পেলেই আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। প্রত্যেক দিন দু'তিন ঘণ্টা তিনি নিজেও আমাকে শেখাতেন।

প্রতিবেশী বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত ঘোড়া ঘুড়ি আমাকে প্রায়ই দেখতে আসতেন, কারণ রটে গিয়েছিল যে এই বাড়িতে একটা আশ্চর্য ইহাহু আছে, যে হুঁইঁনহ্‌মদের ভাষায় কথা বলে এবং যার মধ্যে যুক্তিবুদ্ধির আভাস স্পষ্ট। আমার সঙ্গে কথা বলতে এঁরা খুবই আনন্দ পেতেন; এঁরা আমাকে নানারকম প্রশ্ন করতেন এবং আমার সাধ্যানুযায়ী উত্তর পেতেন। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধে মিলিয়ে আমি এত তাড়াতাড়ি উন্নতি করলাম যে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে প্রতিটি কথা বুঝতে পারতাম, এবং নিজেও বেশ ভালই মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখে গেলাম।

আমার সঙ্গে কথা বলতে যে হুঁইঁনহ্‌মেরা আসত, তাদের বিশ্বাস হ'ত না যে আমি ঠিক জাতের ইয়াহু, কারণ আমার দেহের আবরণটা ছিল অন্য রকম। আমার মাথায়, মুখে ও হাতে ছাড়া দেহের অন্যত্র কোথাও লোম বা চুল নেই দেখে তারা অতীব আশ্চর্য হয়ে যেত। প্রায় দিন পনর আগে কিন্তু আমার প্রভু ঘটনাচক্রে এর রহস্যটা জেনে ফেলেছিলেন।

পাঠকদের আগেই বলেছি যে প্রতি রাত্রে বাড়ির সবাই শুয়ে পড়ার পরে আমি জামা-কাপড় খুলে সেগুলি গায়ে চাপা দিয়ে ঘুমোতাম। একদিন খুব সকালে আমার প্রভু তাঁর টাট্টু ভৃত্যটিকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ডাকতে। তখন আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি। গা থেকে পোশাকগুলো পাশে পড়ে গেছে; টাট্টুর ডাক শুনে উঠে বসতে সে অত্যন্ত গোলমেলে ভাষায় কোনমতে তার যা বলার ছিল তা বলেই ভীত ভাবে প্রভুর কাছে গিয়ে, সে যা দেখেছে, তার একটা এলোমেলো বর্ণনা দিল।

আমি যেতেই প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, টাট্টু যা বলছে তার অর্থ কি? আমি যখন ঘুমোই, আর যখন জেগে থাকি, তখন আমার বিভিন্ন চেহারা হয় কি করে? কারণ

তাঁর ভৃত্য নিশ্চিত করে বলেছে যে আমার দেহের কিছু অংশ সাদা, কিছুটা হলদেটে এবং কিছুটা বাদামী।

আমি বিশ্রী, ইয়াহুগুলোর থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখার জন্য এতদিন আমার পোশাকের রহস্যটা ভাঙিনি। কিন্তু এইবার দেখলাম যে আসল ব্যাপারটা আর চেপে রাখা বৃথা। তাছাড়া আমার জুতো, জামার অবস্থা ইতিমধ্যেই খারাপ হয়ে এসেছে, কিছুদিনের মধ্যেই ওগুলো পরার অযোগ্য হয়ে যাবে; তখন আমাকে ইয়াহু বা অন্য কোন পশুর চামড়া দিয়ে কোন একটা আবরণ তৈরী করতেই হবে, এবং রহস্যটা তখন জানাজানি হয়ে যাবেই। সুতরাং আমি প্রভুকে বললাম, যে দেশ থেকে আমি এসেছি, সেখানে একরকম পশুর লোম থেকে কৌশল করে শিষ্টতা রক্ষার জন্য পোশাক তৈরী করে আমার মতো প্রাণীরা শরীর ঢেকে রাখে এবং এর ফলে শীত-গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে তাদের দেহ রক্ষাও পায়। যদি তিনি আদেশ করেন তো তাঁকে আমি এখনই ব্যাপারটার সত্যতা সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে পারি; শুধু প্রকৃতি আমাদের যে অঙ্গগুলি ঢেকে রাখতে শিখিয়েছে, সেগুলি আমি উন্মুক্ত করব না।

সব শুনে প্রভু বললেন যে আমি যা বললাম তা অতি অদ্ভুত, বিশেষ করে শেষ কথাগুলো। প্রকৃতি যা দিয়েছে, তা প্রকৃতিই আবার ঢেকে রাখতে শেখাবে কেন? তিনি বেশ জোর দিয়ে বললেন, যে তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউই নিজেদের শরীরের কোন অঙ্গ সম্পর্কে লজ্জাবোধ করেন না। যাই হোক, আমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। তখন আমি কোট ও তারপরে এক এক করে ওয়েস্টকোট, জুতো, মোজা ও ব্রীচেস খুলে শার্টটা নিয়ে কোমরে জড়িয়ে আমার নগ্নতা ঢেকে রাখলাম।

আমার পুরো কাজটা প্রভু বেশ কৌতুহল সহকারে দেখলেন। তারপরে আমার প্রতিটি পোশাক নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন এবং আমাকেও চারদিক থেকে খুঁটিয়ে দেখলেন। খুর দিয়ে খুব আস্তে আমার সারা গায়ে বুলিয়ে পরখ করলেন। শেষে বললেন, আমি নিশ্চয়ই একটি নিখুঁত ইহাহু; পার্থক্য হচ্ছে, আমার গায়ের চামড়া মসৃণ, তাতে অত লোম বা চুলও নেই, হয়ত নখর নেই, আর সর্বদা পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়াই বা হাঁটি। বাকি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই রকম। তিনি আর কিছু দেখতে চাইলেন না। আমি ঠাণ্ডায় কাঁপছি দেখে তিনি আমাকে পোশাক পরে নিতে বললেন।

আমাকে তিনি বারবার ইয়াহু বলায় আমি অস্বস্তি প্রকাশ করলাম, কারণ ওই জঘন্য জীবটার সম্বন্ধে আমি চরম ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কিছুই বোধ করতাম না। আমি তাকে অনুরোধ করলাম যে তিনি যেন ওই বিশেষণটা আমার সম্বন্ধে প্রয়োগ না করেন, এবং তাঁর পরিবারের সকলকে ও বন্ধু-অতিথি ইত্যাদিদেরও বারণ করে দেন। আমি আরো অনুরোধ করলাম যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ যেন আপাততঃ আমার পোশাকের রহস্যটা না জানতে পারে। তাঁর টাট্টু ভৃত্যকেও তিনি যেন একথা লুকিয়ে রাখতে নির্দেশ দেন।

সমস্তই আমার প্রভু করতে রাজি হলেন। যতদিন আমার পোশাকগুলো

টিকেছিল, ততদিন আমার গোপন কথাও প্রকাশ পায়নি। ইতিমধ্যে, তিনি নির্দেশ দিলেন যে আমি যেন আরো দ্রুত তাঁদের ভাষা পুরোদস্তুর আয়ত্ত করতে চেষ্টা করি, কারণ আমার শরীরের থেকেও আমার কথা বলার ক্ষমতা এবং যুক্তি বুদ্ধি দেখে তিনি অনেক বেশি আশ্চর্য হয়েছেন। তাছাড়া, যে সব আশ্চর্য বিষয়ের কথা আমি শোনাব বলেছি, সেগুলো শোনার জন্যও তিনি উৎসুক হয়ে আছেন।

সেদিন থেকে তিনি আমাকে ভাষা শেখানোর জন্য দ্বিগুণ সময় ব্যয় করা শুরু করলেন। তিনি নানা প্রকার হুঁইঁনহঁমের সঙ্গে আমাকে মেলামেশা করতে দিলেন এবং তাদের প্রত্যেককে বলে রাখলেন আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে, কারণ তাতে আমার মেজাজ ভাল থাকবে এবং আমি তাদের আরো বিস্ময়ের খোরাক যোগাতে পারব।

প্রত্যেকদিন আমাকে ভাষা শেখানো ছাড়াও আমার সম্পর্কে তিনি নানা প্রশ্ন জিগ্যেস করতেন। আমি যথাসাধ্য যা উত্তর দিতাম, তার মাধ্যমে তাঁর মোটামুটি কিছু ধারণা হয়েছিল, যদিও সেগুলো মোটেই সম্পূর্ণ নয়। তার সঙ্গে কিভাবে স্বাভ্যাবিক কথোপকথন করতে শিখলাম, তা ধাপে ধাপে বর্ণনা করতে গেলে পাঠকের অত্যন্ত একঘেয়ে লাগবে। এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে শিখে আমি নিজের সম্বন্ধে এই রকম বর্ণনা দিয়েছিলাম ঃ

আমি আমারই মতো পঞ্চাশজন জীবের সঙ্গে অনেক দূর দেশ থেকে এসেছি ; আমরা একটা কাঠের তৈরী ফাঁপা জলযানে সমুদ্র পার হয়েছি, সেই জলযানটি তাঁর বাড়ীর চেয়েও বড়। আমি যথাসম্ভব জাহাজটির চেহারার বর্ণনা দিলাম এবং রুমাল দিয়ে বোঝালাম কেমন করে পালে হাওয়া লেগে জাহাজ চলে। তারপরে বললাম যে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় অন্যরা আমাকে এই দেশের তীরে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। আমি না জেনে দেশের অভ্যন্তরের দিকে এগোতে থাকি এবং সেই সময় তিনি দয়া করে জঘন্য ইয়াহুগুলোর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেন।

তখন প্রভু আমাকে জিগ্যেস করলেন, আমার দেশের হুঁইঁনহঁমরা পশুদের হাতে জলযান তৈরী ও তার পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে কেন ?

আমি উত্তর দিলুম যে, এবার যা বলব তাতে আপনি যদি কথা দেন যে রেগে যাবেন না, তবেই আমি আমার কাহিনীর বর্ণনা চালিয়ে যাব এবং নানা আশ্চর্য ব্যাপার সম্বন্ধেও তাঁকে বলব। তিনি রাজি হতে আমি তাঁকে জানালাম যে শুধু জাহাজ নয় আজ অবধি যত দেশে আমি ভ্রমণ করেছি, সব জায়গাতে শুধু আমার মতো জীবেরাই বিচার বুদ্ধিশীল এবং দেশও তারাই চালায় ! তিনি ও তাঁর বন্ধুরা যাকে 'ইয়াহু' বলে থাকেন, তার মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে যতটা অবাক হয়েছেন আমিও হুঁইঁন-হঁমদের বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীবদের মতো আচরণ করতে দেখে ততটাই অবাক হয়েছিলাম। আমাকে ইয়হুদের মতো দেখতে বটে, কিন্তু তাদের নোঙরা, পাশবিক স্বভাবের সঙ্গে আমার কোনই সাদৃশ্য নেই।

আমি আরো বললাম যে, যদি ঈশ্বরের দয়ায় কোনদিন নিজের দেশে ফিরতে পারি,

তবে এই দেশে ভ্রমণের কথা আমি নিশ্চয় বর্ণনা করব, এবং ওখানে সবাই তখন বলবে যে আমি 'এমন জিনিষের কথা বলছি, যা নেই।' সবাই মনে করবে, কাহিনীটা পুরোই উদ্ভট, আমার মস্তিষ্কপ্রসূত। তার প্রতি, তাঁর পরিবারের প্রতি ও তাঁর বন্ধুদের প্রতি সম্মান জানিয়ে, এবং তাঁর রেগে না যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি শেষে বললাম যে, আমার দেশের লোকেরা একথা কল্পনাও করতে পারবে না যে এমন কোন দেশ আছে যেখানে হুঁইন্‌হ্‌মেরা পরিচালক এবং ইয়াহুরা পশু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হুঁইনহ্মদের সত্য-মিথ্যা সম্পর্কিত ধারণা—লেখকের বর্ণনায় তাঁর প্রভুর ক্ষোভ—লেখক নিজের সম্বন্ধে এবং তাঁর সমুদ্রযাত্রার দুর্ঘটনাবলী সম্বন্ধে আরো বিশদ বর্ণনা দিলেন।

আমার বর্ণনা শুনতে শুনতে প্রভুর মুখে একটা বিশেষ অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। কারণ 'সন্দেহ' বা 'অবিশ্বাস এ দুটো জিনিষ ওদেশে এতই অপরিচিত যে, সেরকম পরিস্থিতিতে কেমন ব্যবহার করা উচিত, তা ওখানকার অধিবাসীরা জানে না। আমার মনে আছে যে যখন প্রভুর সঙ্গে মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তখন মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তিনি অনেক কষ্টে বুঝতে পারতেন। যদিও অন্যান্য সব ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ন। তাঁর যুক্তিতে, ভাষা ব্যবহারের তাৎপর্য হ'ল পরস্পরের মনের ভাব বোঝা এবং যা ঘটেছে তার সংবাদ দেওয়া-নেওয়া করা। কিন্তু কেউ যদি 'এমন কিছু বলে, যা নেই,' তাহ'লে এই মূল উদ্দেশ্যগুলো ব্যর্থ হচ্ছে কারণ তাহ'লে আমি সঠিকভাবে তাঁকে বুঝতে অক্ষম এবং সংবাদ গ্রহণের বিষয়ে চরমতম অজ্ঞ। কেননা, একটা 'সাদা' জিনিষকে আমি বিশ্বাস করছি 'কালো' বলে, এবং 'দীর্ঘ'-কে 'হ্রস্ব'। যে মিথ্যাচার ও মিথ্যাভাষণে মানবজাতির প্রায় প্রত্যেকেই পটু, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল ওই রকম।

যাই হোক আসল কথায় ফিরে আসা যাক। যখন আমি প্রভুকে জোর দিয়ে আশ্বস্ত করলাম যে আমার দেশে ইয়াহুরাই একমাত্র পরিচালক, তিনি বললেন, যে ব্যাপারটা তাঁর বোধগম্যতার বাইরে এবং জানতে চাইলেন আমাদের দেশে হুঁইনহ্ম আছে কিনা, এবং তারা কি করে।

আমি বললাম যে, আমাদের দেশে প্রচুর হুঁইনহ্ম আছে। তারা গ্রীষ্মকালে মাঠে চরে বেড়ায় এবং শীতকালে তাদের ঘরে রেখে খড় ও ওট খাওয়ানো হয়। ইয়াহু

ভৃত্যেরা তাদের গা দলাই-মলাই করে, কেশর আঁচড়ে দেয়, খুর থেকে নোংরা বার করে দেয়, খেতে দেয় এবং তাদের বিছানা করে দেয়।

একথা শুনে প্রভু বললেন, এবার তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। তুমি ইয়াহুদের বুদ্ধি সম্পর্কে যাই বলো না কেন, আসলে হুঁই্‌নহ্‌মরাই তোমাদের প্রভু। আমাদের ইয়াহুগুলো যদি এই রকম হ'ত, তবে বড় ভাল হ'ত।

আমি প্রভু মহাশয়কে সম্বোধন করে প্রার্থনা করলাম যে তিনি যেন আর কিছু আমাকে বলতে অনুরোধ না করেন, কারণ আমি নিশ্চিত যে আমার কাহিনী তাঁর ক্রোধের উদ্রেক করবে। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে আদেশ করলেন যে আমি যেন শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট দুটো দিকই তাঁকে জানাই। আমি বললাম যে তাঁর আদেশ আমাকে মানতেই হবে।

আমি বলে চললাম যে আমাদের মধ্যে যে হুঁই্‌নহ্‌মরা আছে, তাদের আমরা বলি 'ঘোড়া।' তাদের মতো উদার ও শান্ত জীব আমাদের আর নেই। শক্তি ও দ্রুততার দিক দিয়েও তারা খুব উচ্চস্তরের। সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের ভ্রমণ, দৌড় ও গাড়ি টানার কাজে লাগান এবং তাদের যথেষ্ট যত্ন ও দয়া সহকারে পালন করেন, যতদিন না রুগ্ন হয়ে পড়ে অথবা তাদের পায়ের জোর কমে যায়। তখন তাদের বিক্রী করে দেওয়া হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারা নানা প্রকার কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে। মৃত্যুর পরে তাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে বেচে দেওয়া হয়, এবং কুকুর ও শকুন তাদের মৃতদেহগুলি ভক্ষণ করে। কিন্তু সাধারণ স্তরের ঘোড়াগুলো এত ভালভাবে জীবন কাটাতে পারেন না। তাদের মালিক হয় চাষী, গাড়োয়ান ইত্যাদি লোকেরা, এবং তারা ঘোড়াদের অনেক বেশি খাটায়। খাবারদাবারও ভাল দেয় না। আমরা কেমন করে ঘোড়ায় চড়ি, তাও আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করলাম। লাগাম, জিন, রেকাব চাবুক এবং গাড়ীর চাকা ইত্যাদির চেহারা ও কাজ বোঝালাম। শেষে বললাম যে ঘোড়ার খুরের তলায় আমরা লোহা নামে একটি শক্ত জিনিষের আবরণ দিয়ে দিই, যাতে আমাদের পাথুরে রাস্তায় চলতে গিয়ে তাদের খুরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

অত্যন্ত ক্রোধ ও ক্ষোভ দেখিয়ে শেষে আমার প্রভু বললেন যে, কোন সাহসে আমারা হুঁই্‌নহ্‌মদের পিঠে চড়ি! কারণ তিনি নিশ্চিত যে, তার দুর্বলতম ভৃত্যটিও সহজেই সবলতম ইয়াহুকেও পিঠ থেকে ঝেড়ে ফিলে দিতে সক্ষম। নয়তো, শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে জন্তুটাকে পিষে মেরে ফেলতেও পারে।

আমি উত্তর দিলাম যে আমাদের ঘোড়াদের তিন চার বছর বয়স থেকে শিক্ষা দিয়ে নিজ নিজ উপযুক্ত কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। যদি তাদের মধ্যে কেউ অসহ্যরকম হিংস্র হয়, তবে তাকে ভাড়াটে গাড়ি টানার কাজে লাগানো হয়। কম বয়সে কোনরকম দুষ্ট কাজ করলে তাদের প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়। পুরুষ ঘোড়াগুলো, যাদের প্রধানতঃ পিঠে চড়ে ঘোরা বা দৌড়ের কাজে লাগানো হয়, তাদের দু'বছর বয়সে পুরুষাঙ্গ কর্তন করে দেওয়া হয়, যাতে তারা সহজেই পোষ

মানে এবং শান্ত হয়ে যায়। কোন কাজে পুরস্কার মেলে এবং কোন কাজে শাস্তি, সেটা তারা ভালই বোঝে। কিন্তু প্রভু দয়া করে এ কথাটা বিবেচনাধীন করুন যে, এদেশের ইয়াহুদের চেয়ে এক বিন্দুও বেশি বুদ্ধি তাদের কারোর নেই।

আমি যা বলছি তা ঠিক করে প্রভুকে বোঝাতে আমাকে নানা ইসারা ও ভাব-ভঙ্গীর আশ্রয় নিতে হ'ত। কারণ তাদের ভাষায় আমাদের মতো শব্দের বৈচিত্র্য নেই, যেহেতু তাদের চাহিদা এবং আবেগ অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও হুঁই"নহ"মদের আমরা যে বর্বরোচিত ভাবে ব্যবহার করি, তা শুনে তাঁর যে প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পেল, তাকে প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার নেই। বিশেষ করে তাদের পুরুষাঙ্গ কর্তন করে বংশবৃদ্ধি রোধ করা এবং তাদের দাসত্বভাব বাড়িয়ে তোলার কথায় তিনি রুদ্ধবাক হয়ে গেলেন। শেষে বললেন যে সত্যিই যদি এমন কোন দেশ থাকে, সেখানে ইয়াহুরাই একমাত্র বুদ্ধিমান জাতি, তবে নিঃসন্দেহে তারাই সে দেশের পরিচালক হবে, কারণ শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির কাছে পশুগুলি হার মানতে বাধ্য। কিন্তু আমার চেহারা দেখে তাঁর সন্দেহ হ'ল যে, এই রকম চেহারার কোনো জীবের পক্ষে জীবনযাত্রায় বুদ্ধি প্রয়োগ করে উন্নত জীবন যাপন সম্ভব নয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার দেশের লোকেরা দেখতে আমার মতো, নাকি তাঁর দেশের ইয়াহুদের মতো ?

আমি তাঁকে জোরের সঙ্গেই বললাম, যে, আমার বয়সী মানুষদের মধ্যে আমার চেহারা সুগঠিতই বলা যেতে পারে। অবশ্য শিশু ও মেয়েদের শরীর আরও নরম ও মসৃণ এবং আমার দেশের মেয়েদের গাত্রবর্ণ দুধের মতো সাদা।

তখন প্রভু বললেন যে সত্যিই আমি ইয়াহুদের থেকে আলাদা—অনেক বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং চেহারাতেও মোটেই অত বিকট নই। কিন্তু সত্যিকারের প্রাকৃতিক সুবিধের দিক দিয়ে বিচার করলে আমার এতে অসুবিধেই বেশি। আমার সামনের বা পেছনের পায়ের নখগুলো কোন কাজে লাগে না। আমার সামনের পা দুটোকে কি বলবেন তা ঠিক ভেবে পাচ্ছিলেন না, কারণ ও দুটো দিয়ে কখনো আমাকে চলতে দেখেন নি। জমিতে চলার পক্ষে ও দুটো বড়ই নরম। সাধারণতঃ আমি ও দুটোকে আবরণহীন করেই রাখি। যে আবরণটা মাঝে মধ্যে দিই, সেটাও আমার পেছনের পায়ের আবরণের মতো শক্ত বা একই রকম দেখতে নয়। তাছাড়া, আমি হাঁটার সময়ে আমার শারীরিক নিরাপত্তাও কম, কেননা আমার একটা পা পিছলে গেলে আমি পড়ে যাব নিশ্চয়।

আমার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও তিনি এরপরে নানা দোষ বার করতে শুরু করলেন। আমার মুখমণ্ডল চ্যাপটা, চোখ দুটো সামনে হওয়ায় মাথা না ঘুরিয়ে দুপাশে দেখতে পাই না। নাকটা অতিরিক্ত উঁচু, সামনের পা দিয়ে খাবার তুলে মুখে না গুঁজলে আমি খেতেও পারি না। আমার পেছনের পায়ের পাঁচখানা খাঁজেরও যে কি প্রয়োজনীয়তা, তা তিনি বুঝতে পারলেন না। পা দুটো এত নরম যে অন্য কোন

জন্তুর চামড়া দিয়ে সেদুটোকে না ঢাকলে শক্ত জমিতে হাঁটতেও পারি না। আমার সারা শরীরকে ঠাণ্ডা ও গরমের প্রকোপ থেকে বাঁচানোর জন্য প্রতিদিন আমাকে বিস্তর ঝামেলা করে একটা আবরণ পরতে হয় ও ফের খুলতে হয়।

শেষতঃ তিনি বললেন যে দেশে যত রকম জীব আছে, প্রত্যেকে ইয়াহুদের ঘৃণা করে। দুর্বলেরা তাদের এড়িয়ে চলে এবং শক্তিশালীরা মেরে তাড়িয়ে দেয়। সুতরাং যদি তিনি ধরেও নেন যে আমাদের যুক্তিবুদ্ধি আছে, তাহ'লেও সব জীবের এই স্বাভাবিক ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাকে জয় করে আমরা কেমন করে এদের পোষ মানাই ও তাদের দিয়ে কাজ করাই, এটা তার বোধগম্য হচ্ছে না। যাই হোক, তিনি বললেন যে এ নিয়ে তিনি আর তর্ক করতে চান না। বরং তিনি আমার জীবন কাহিনী, আমার দেশ, আমার জন্মস্থান, এখানে আসার আগে পর্যন্ত কি কি কাজ করেছি, এইসব জানতে অনেক বেশি উৎসুক।

তিনি আমার জীবন কাহিনী সম্বন্ধে জানতে অনেক বেশী উৎসুক

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে এইসব তাঁকে জানাবার ইচ্ছে আমার খুবই প্রবল। কিন্তু অনেকগুলো জিনিষ তাঁকে কি করে বোঝাব তা ভেবে পাচ্ছি না। কারণ সেগুলোর মতো জিনিষ এদেশে আদৌ নেই, এবং সে কারণে তাঁরও সেগুলো সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। যাই হোক, তুলনা বা সাদৃশ্য বোঝাতে গিয়ে যদি আমি শব্দ খুঁজে না পাই, তাহ'লে তিনি যেন আমাকে সাহায্য করেন। তিনি এতে সানন্দে সম্মতি দিলেন।

আমি বললাম যে, আমি জন্মেছিলাম সৎ মাতাপিতার পরিবারে, ইংল্যান্ড নামে একটি দেশে ; এই দেশটি বহু দূরে এবং প্রভুর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ভৃত্যটিরও সেখানে পৌঁছতে অনেক দিন লেগে যাবে। পেশায় আমি শল্যচিকিৎসক এবং আমার কাজ দুর্ঘটনা বা হিংসাত্মক কাজের দরুণ মানুষের শরীরে যে আঘাত বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে সারানো। আমাদের দেশ পরিচালনা করেন এক নারী, যাকে আমরা 'মহারাণী' বলে অভিহিত করি। আমি ধনদৌলত উপার্জন করবার জন্য এই দেশ ছেড়ে এসেছিলাম, যাতে ফেরার পর আমার পরিবারকে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারি। আমার শেষ সমুদ্রযাত্রায় আমি ছিলাম জাহাজের পরিচালক ; আমার অধীনে যে পঞ্চাশজন 'ইয়াহু' ছিল, তাদের অনেকেই রোগে মারা যাওয়ায় বিভিন্ন দেশের কয়েকজনকে দিয়ে তাদের শূন্যস্থান আমাকে পূরণ করতে হয়েছিল। দুবার আমাদের জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল, একবার প্রচণ্ড ঝড়ে, আর একবার ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে।

এইখানে আমাকে থামিয়ে প্রভু জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার এত ক্ষতি ও বিপদ হওয়া সত্ত্বেও আমি বিভিন্ন দেশের অচেনা লোকেদের কেমন করে আমার সঙ্গে আসতে রাজি করালাম।

আমি বললাম যে এই লোকগুলি অধিকাংশই মরিয়া ধরণের, এবং দারিদ্র্য বা অপরাধের দরুণ স্বদেশ ছেড়ে পলাতক। কেউ মামলায় আসামী সাব্যস্ত হয়েছিল ; কেউ মদ্যপান, কু আমোদ-প্রমোদ এবং জুয়োখেলায় সর্বস্বান্ত ; কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে দেশ থেকে ফেরার ; আরো অনেকে পালিয়েছিল খুন, চুরি, ডাকাতি, জোচ্চুরি, নোট জাল ইত্যাদি অপরাধ করে বাঁচবার জন্য ; কেউ কেউ বিষ খাইয়ে হত্যা বা ষড়যন্ত্রের জন্য ; কেউ বা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বাহিনী ছেড়ে পলাতক। অর্থাৎ বেশির ভাগই জেলভাঙা আসামী। এদের কারোরই নিজের দেশে ফেরার সাহস নেই, কারণ, তাহ'লে তাদের হয় ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, নয়তো জেলে উপোস করে পচে মরতে হবে। সুতরাং এদের অন্য দেশে কাজ করে বেঁচে থাকতে হবেই।

এই কাহিনী বর্ণনার সময় আমার প্রভু মাঝে মাঝেই আমাকে বাধা দিচ্ছিলেন। আমার নাবিকদের অধিকাংশ অপরাধ বোঝাতে আমাকে নানা অঙ্গভঙ্গীর আশ্রয় নিতে হচ্ছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে বেশ পরিশ্রম করে কথাবার্তা চালানোর পর তবেই তিনি পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। এই সমস্ত পাপ কাজ গুলো করার যৌক্তিকতা কি তা ভেবে না-পেয়ে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে আরো পরিষ্কার করতে আমি তাঁকে ক্ষমতা লিপ্সা ও ধনদৌলতের লোভ বিষয়ে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। খুন খারাপী, অপরিমিতাচার, বিদ্বেষ ও ঈর্ষার ভয়ংকর ফলাফলও তাঁকে ব্যাখ্যা করলাম। এরকম সব ব্যাপার তিনি কোনদিন শোনেনও নি, দেখেনও নি ; আমার কাছ থেকে শোনার পর চরম বিস্ময় ও বিতৃষ্ণায় তাঁর চোখ কপালে উঠে যেত। ক্ষমতা, যুদ্ধ, আইন, শাস্তি এবং এরকম আরো হাজার বিষয় ব্যাখ্যা করার মতো কোন শব্দই তাঁদের ভাষায় নেই ; ফলে আমি যা

বলতে চাই তা বোঝানো প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁর বোধশক্তি অত্যন্ত উচ্চস্তরের হওয়ায়, তিনি কিছু কালের মধ্যেই আমার অল্প কথা ও ভাব ভঙ্গীতেই চিন্তা করে বুঝে নিতে পারলেন, আমাদের দুনিয়ায় মানব প্রকৃতি কেমন ও কি ধরণের কাজ করতে সক্ষম। তখন তিনি জানালেন যে 'ইউরোপ' নামে যে ভুখন্ডের কথা বলেছি, এবং বিশেষ করে আমার নিজের দেশের কথা, সে সম্বন্ধে তিনি বিশদ ভাবে জানতে ইচ্ছুক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রভুর আদেশে লেখক তাঁকে ইংল্যাণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলেন—ইউরোপের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধের কারণ বোঝালেন—ইংল্যাণ্ডের সংবিধান ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন।

পাঠক দয়া করে লক্ষ্য করবেন যে নিম্নলিখিত যে বর্ণনা আমি দিচ্ছি, তা আসলে দু'বছরের বেশি সময় ধরে আমার ও প্রভুর মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল, তার সারাংসার। আমি হুঁইনহ্‌ম ভাষায় যত বেশি পারদর্শিকতা লাভ করছিলাম, আমার প্রভু ততই মাঝে মাঝে বেশি করে জানতে চাইতেন। আমার সাধ্যানুসারে আমি তাঁর সামনে ইউরোপের অবস্থাটা তুলে ধরলাম, শিল্প-বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে আলোচনা করতাম ; এবং তাঁর সমস্ত প্রশ্নের আমি যা উত্তর দিতাম, সে সমস্ত কথাবার্তা বলে শেষ করা যাবে না। সুতরাং আমি এখানে শুধুমাত্র আমার স্বদেশ সম্বন্ধে যা কথাবার্তা হয়েছিল, তাকেই সুশৃঙ্খল ভাবে সাজিয়ে সারাংশ দেওয়ার চেষ্টা করছি ; বলা বাহুল্য, এ সমস্তই পুরোপুরি সত্যি। আমার একমাত্র চিন্তা হ'ল যে আমার প্রভুর যুক্তিতর্ক ও আবেগের প্রকাশকে আমি সুবিচার সহকারে বর্ণনা করতে পারব কিনা ; কারণ আমার ক্ষমতার অভাব তো বটেই, উপরন্তু আমাদের বর্বর ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করার ফলেও সেগুলির মূল অর্থের যথেষ্ট হানি হবে।

প্রভুর আদেশ অনুসারে আমি তখন অরেঞ্জ-এর রাজকুমার পরিচালিত বিপ্লবের কথা বর্ণনা করলাম। আরো বললাম ওই রাজা কর্তৃক ফ্রান্সের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, যা তাঁর উত্তরসূরী বর্তমান রাণীও চালিয়ে যাচ্ছেন। খৃস্টান দেশগুলি সবকটিই এতে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাঁর অনুরোধে আমি জানালাম যে অন্ততঃ দশলক্ষ ইয়াহু সুরু থেকে আজ অবধি এই যুদ্ধে মারা পড়েছে। এবং প্রায় একশো শহর অধিকৃত হয়েছে ও আরো পাঁচগুণ সংখ্যক জাহাজ জ্বালিয়ে বা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আমাকে তখন জিজ্ঞেস করলেন, কি কারণে বা উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ এক দেশ আরেক দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

আমি উত্তরে বললাম যে অসংখ্য কারণ আছে, শুধু প্রধান কয়েকটি উল্লেখ করছি। কখনো কারণ হ'ল রাজাদের উচ্চাকাঙ্খা, কারণ যে পরিমাণ লোক বা দেশের উপর তাঁর কর্তৃত্ব বিস্তৃত, তা নিয়ে তাঁর মন ভরে না। কখনো দুর্নীতি পরায়ণ মন্ত্রীরা তাদের শয়তানী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজাদের প্রতিবাদকে দাবিয়ে রাখতে বা তাদের মনোযোগকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দিতে, তাদের রাজাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। মতের বিভেদও লক্ষ লক্ষ প্রাণহানির কারণ হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, 'মাংস'-কে 'রুটি' বলা হবে, নাকি রুটি-কে মাংস। একটি বিশেষ ফলের রস 'রক্ত' হবে নাকি 'মদ্য'। শিস দেওয়া পাপ না পুণ্য। একটি কাষ্ঠদণ্ডকে চুম্বন করা উচিত, নাকি আগুনে ছুঁড়ে ফেলাই ভাল। কোটের সবচেয়ে ভাল রঙ কি—কালো সাদা, লাল না ধূসর। এবং সেটি লম্বা হবে না হ্রস্ব, সরু না চওড়া, নোঙরা না পরিষ্কার। এছাড়া আরো অনেক। মতবিভেদ ছাড়া অন্যান্য লড়াই এত সাংঘাতিক ও রক্তক্ষয়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কখনো দুই রাজায় রাজত্বের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে যুদ্ধ হয়, যে অংশের ওপর কারোরই ন্যায্য দাবী নেই। কখনো এক রাজা অন্য এক রাজার সঙ্গে বিবাদ বাধায়, পাছে সে তার সঙ্গে ঝগড়া করে। আবার কখনো যুদ্ধ শুরু হয়, কারণ শত্রু অতিরিক্ত শক্তিশালী বা বড়ই বেশি দুর্বল।

এ ছাড়াও কখনো আমাদের যা আছে তা আমাদের প্রতিবেশীরা চায়, নয়তো তাদের যা আছে তা আমরা চাই; এবং আমাদের মধ্যে যুদ্ধ চলে, যতদিন না তারা আমাদের জিনিষগুলো নিয়ে নিচ্ছে বা আমরা তাদেরগুলো অধিকার করছি। যদি কোন দেশের মানুষজন দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়, বা মহামারীতে অর্ধমৃত, অথবা নিজেদের মধ্যে কলহে বহুধাবিভক্ত, তবে সেই দেশ আক্রমণ করে যুদ্ধ লাগান বেশ যুক্তিপূর্ণ বলে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের সবচেয়ে নিকটস্থ বন্ধু-রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করাটাও বেশ যুক্তিসম্মত বলে ধরা হয়, যদি তার কোন শহর বা এলাকা আমাদের সীমান্তের এত কাছে থাকে, যেটাকে দখল করলে আমাদের রাজ্যটা বেশ সুআকৃতি সম্পন্ন হবে। যদি কোন রাজা এমন একটা দেশে তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠান, যে দেশের লোকেরা দরিদ্র ও অজ্ঞ, তাহলে আইন সম্মত উপায়েই তিনি তাদের অর্ধেককে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, অন্য অর্ধেককে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারেন, যাতে তাদের বর্বরতা লুপ্ত হয় এবং তারা সুসভ্য হয়ে ওঠে।

আর একটি অত্যন্ত রাজকীয়, সম্মানজনক ও প্রায়শঃই ঘটিত ব্যাপার হ'ল, আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে অপর কোন রাজাকে সাহায্য করা, কিন্তু পরে সেই রাজ্যটি নিজেই দখল করে নেওয়া, এবং যে রাজাকে সাহায্য করতে এসেছিলেন, তাকেই হত্যা, বন্দী বা নির্বাসিত করা। রক্তের সম্পর্ক বা বিবাহ সূত্রে সম্পর্ক থাকলেও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। এবং এই সম্পর্ক যতই নিকট হয়, তাদের কলহ ততই তীব্র

হয়। গরীব জাতিগুলি হ'ল ক্ষুধার্ত, এবং ধনী জাতিগুলি গর্বিত। এবং ক্ষুধা ও গর্ব কোনদিনই মিশ খাবে না। এইসব কারণে-সৈনিকের পেশা আর সমস্ত পেশার চেয়ে অনেক সম্মানজনক বলে মনে করা হয়। কারণ, এক সৈনিক হ'ল এমন একজন 'ইয়াহু' যাকে মাইনে দিয়ে রাখা হয় তার জাতের যতজনকে পারে ঠাণ্ডা মাথায় মেরে ফেলার জন্য, যদিও তারা কখনো তার কোন ক্ষতি করেনি।

আর এক জাতের ভিক্ষুক রাজা আছে, যাদের নিজেদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। তারা ধনী দেশগুলিকে নিজেদের সৈন্যবাহিনী ভাড়া দেয়, এবং প্রতি সৈন্য পিছু যে টাকা পায়, তার তিন-চতুর্থাংশ নিজেরা রেখে দেয়। এই টাকা দিয়েই তাদের বিলাসব্যসনের ব্যয় নির্বাহ হয়। ইউরোপের উত্তরাংশে এমন অনেক রাজ্য আছে।

সব শুনে আমার প্রভু বললেন, তোমাদের যুদ্ধ সম্পর্কে যা বললে, তাতে তোমাদের তথাকথিত যুক্তি বুদ্ধির ফল বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে একটা সুখের কথা এই যে, বিপদের থেকে লজ্জাটাই এ বিষয়ে বেশি। এবং প্রকৃতি তোমাদের পরস্পরের খুব বেশি ক্ষতি করার মতো ক্ষমতা আদৌ দেননি। কারণ তোমাদের মুখ চ্যাপটা হওয়ায়, অপরের সম্মতি ছাড়া তোমরা কেউ কাউকে কামড়াতে পারবে না। তারপরে, সামনের ও পেছনের পায়ের থাবা এত ছোট আর নরম যে আমাদের একটা মাত্র ইয়াহু তোমাদের ডজনখানেক ইয়াহুকে মেরে তাড়িয়ে দিতে পারবে। সুতরাং যুদ্ধে যে বিপুল সংখ্যক লোক মারা যায় বলে তুমি বললে, তা আমার মনে হয় তুমি এমন জিনিষের কথা বলছ, যা নেই'।

তাঁর অজ্ঞতায় আমি মাথা নেড়ে হেসে উঠলাম। যুদ্ধ ও তার কৌশল সম্পর্কে আমারও জ্ঞান বড় অল্প নয়। সুতরাং এবার আমি তাঁকে বোঝাতে ও বর্ণনা দিতে শুরু করলাম। কামান, কালভারিন, বন্দুক, ক্যারাবাইন, পিস্তল, গুলি, গানপাউডার, তলোয়ার, বেয়নেট, যুদ্ধ, অবরোধ, প্রতিরোধ, পশ্চাদ্‌গমন, আক্রমণ, কামানের গোলা মেরে বিধ্বস্ত করা এবং সামুদ্রিক যুদ্ধ কাকে বলে বর্ণনা দিয়ে বোঝালাম। বললাম কেমন করে এক হাজার লোক সহ জাহাজ ডুবে যায়। প্রতি পক্ষে অন্ততঃ বিশ হাজার করে সৈন্য কেমন ভাবে মরে। মুমূর্ষুর আর্তনাদ, গোলার আঘাতে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ধোঁয়া, হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা, ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু। পলায়ন, অনুসরণ ও বিজয়। রণক্ষেত্র জুড়ে ছড়ানো হাজার হাজার মানুষের শব খাচ্ছে শেয়াল, কুকুর, নেকড়ে ও শকুন। লুণ্ঠন, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া ও ধ্বংস করা। এই সমস্ত কিছুরই বর্ণনা দিলাম। এবং আমার দেশের মানুষেরা যে কি দারুণ বীর তা বোঝাতে বললাম যে, আমি নিজের চোখে দেখেছি তারা এক অবরোধের সময় একবারে একশো জন শত্রুকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিয়েছে। এবং আর একবার একটা জাহাজেও একই কাণ্ড সংঘটিত হতে দেখেছি। পুরো জাহাজটা উড়ে যাওয়ার পর শূন্য থেকে টুকরো টুকরো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝরে পড়তে দেখে দর্শকদের কৌতুকপূর্ণ আমোদও আমার চোখে দেখা।

আমি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার প্রভু আমাকে চুপ করতে আদেশ দিলেন। তিনি বললেন যে ইয়াহুদের স্বভাব-প্রকৃতি যে জানে, সে সহজেই বিশ্বাস করবে যে ওই কদর্য জন্তুটির পক্ষে আমার বর্ণিত প্রতিটি কাজই করা সম্ভব, যদি তাদের শক্তি ও ধূর্ততা তাদের বিদ্বেষের সমান হ'ত। আমার বর্ণনা শুনে ইয়াহু জাতটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা আরো বেড়ে গেছে, এবং সেই সঙ্গে তাঁর মনে এমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জন্ম নিয়েছে, যা তিনি আগে কখনো বোধ করেন নি। হয়তো এই কুৎসিত শব্দগুলি শুনতে তাঁর কান কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাঁর বিতৃষ্ণা ও ঘৃণাবোধ কিছুটা কমবে। যদিও তিনি তাঁর দেশের ইয়াহুদের ঘৃণা করেন, কিন্তু তাদের বিশ্রী গুণগুলির জন্য তিনি তাদের একটা 'ন্যাইহ্' (একরকম শিকারী পাখি) বা একটা ধারালো পাথরের চেয়ে বেশি দোষ দেন না। কিন্তু যখন একটা জীব ভান করে যে সে যুক্তি বুদ্ধি সম্পন্ন, অথচ এরকম সব বীভৎস কাণ্ড করতে পারে, তাহ'লে তাঁর ভয় হয় যে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে যখন কেউ দুর্নীতিপূর্ণ কাজ করে, তখন সে কাজ গুলো পাশবিকতাকেও হার মানায়।

সেই জন্য তিনি নিশ্চিত যে যুক্তিবুদ্ধির পরিবর্তে আমাদের যে গুণটি আসলে আছে, সেটি আমাদের স্বাভাবিক পাপ চিন্তাগুলিকেই জোরদার করে তোলে। ঠিক যেমন, একটি স্রোতস্বিনী নদীর জলে আমাদের প্রতিবিম্বিত শরীরটা শুধু বড়ই দেখায় না, সেই সঙ্গে বিকৃতও দেখায়।

তিনি এর পরে বললেন যে যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বহুদিন ধরে বহু কথা শুনলেন। বর্তমানে আর একটি ব্যাপার তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আমি তাঁকে আগে বলেছি আমার জাহাজের কিছু নাবিক দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল, কারণ আইনের কোপে পড়ে তাদের সর্বনাশ হয়েছিল। 'আইন' শব্দটার অর্থ আমি তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করেছি বটে ; কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, যে আইন সব মানুষকে রক্ষা করার জন্য তৈরী হয়, তা আবার কিছু লোকের সর্বনাশ করে কি ভাবে। সুতরাং তিনি জানতে চান যে এই 'আইন' ব্যাপারটা আসলে ঠিক কি, কারা কিভাবে তা প্রয়োগ করে এবং আমার দেশে এর পুরো চেহারাটা কেমন। কারণ তিনি মনে করেন, প্রকৃতি এবং যুক্তি বুদ্ধিই একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর জীবনের উপযুক্ত পথপ্রদর্শক হ'তে পারে, তার কি করা উচিত এবং কি এড়িয়ে চলা উচিত তা সহজেই ব'লে দিতে পারে।

আমি প্রভু মহাশয়কে জানালাম যে আইন একটি বিজ্ঞান এবং আমি সে সম্পর্কে খুব ভাল অবহিত নই। কেবল আমার ওপর যে কয়েকটি অবিচার হয়েছিল, সে ব্যাপারে কয়েকজন আইনজীবীকে আমি নিয়োগ করেছিলাম বটে। যাই হোক, তাঁকে এ ব্যাপারে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব।

আমি বললাম যে আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা যৌবন থেকে শিক্ষা পায় কেমন করে বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক ভাবে শব্দের ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ করতে হয় যে, সাদা হচ্ছে কালো এবং কালো হচ্ছে সাদা। এই কাজের জন্য তাদের টাকা দিতে হয়। এই শ্রেণীর কাছে সমাজের অবশিষ্ট মানুষেরা সকলেই ক্রীতদাস।

উদাহরণ স্বরূপ, যদি আমার প্রতিবেশীর আমার একটি গরুর দিকে নজর থাকে, তবে সে একজন আইনজীবীকে টাকা দিয়ে নিয়োগ করবে একথা প্রমাণ করতে যে, ওই গরুটি তারই পাওয়া উচিত। তখন আমার অধিকার প্রমাণ করতে আমাকেও অবশ্যই একজন আইনজীবীকে নিয়োগ করতে হবে। কারণ আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেই কথা বলা আইনে বারণ। এখন, এই ব্যাপারে আমি, অর্থাৎ সত্যিকার মালিক, দুটি বিরাট অসুবিধের সম্মুখীন হ'ব।

প্রথমতঃ, আমার উকিল প্রায় ছোটবেলা থেকেই মিথ্যের সমর্থনে কথা বলে এসেছে। সেজন্য ন্যায় বিচারের সমর্থনে কথা বলা তার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ এবং কখনো তাকে একাজ করতে হ'লে সে তা করে অত্যন্ত অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে ও মনে ক্রোধ নিয়ে।

দ্বিতীয় অসুবিধে হ'ল, আমার উকিলকে অতি সাবধানে এগোতে হবে ; নতুবা বিচারকেরা তাকে তিরস্কার করবেন ও তার সহকর্মীরা তাকে আইন ব্যবসায়ের ক্ষতি করার জন্য ঘৃণা করবে।

অতএব আমার গরুটিকে নিজের অধিকারে রাখার জন্য আমি দু'টি উপায়ের আশ্রয় নিতে পারি। প্রথমটি হ'ল, আমার শত্রুপক্ষীয় উকিলকে দ্বিগুণ টাকা দিয়ে নিজের দিকে টেনে নেওয়া। তাহ'লে সে তার মক্কেলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং বোঝাবে যে ন্যায় তারই পক্ষে আছে। দ্বিতীয় উপায়টি হ'ল, আমার উকিল আমার কেসটিকে যথা সম্ভব অন্যায় রূপে উপস্থাপিত করবে এবং বোঝাবে যে গরুটি আমার শত্রুরই হওয়া উচিত। যদি এই কাজটি বেশ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে, তাহ'লে বিচারবৃন্দের সহানুভূতি নিশ্চয় অর্জন করা যাবে।

প্রভুর জানা দরকার যে এই বিচারকদের নিযুক্ত করা হয় সব রকম বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করা ও অপরাধীদের বিচার করার জন্য। অত্যন্ত দক্ষ যে সব উকিল বৃদ্ধ ও অলস হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে থেকে বিচারকদের বেছে নেওয়া হয়। সারা জীবন সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে আসার ফলে জুয়াচুরি, মিথ্যাচার ও অত্যাচারের প্রতি তাদের একটা মারাত্মক পক্ষপাতিত্ব থেকেই যায়। আমি অনেক বিচারককে জানি যারা ন্যায়ের পক্ষে যে লোকেরা আছে তাদের কাছ থেকে ঘুষ নিতে অস্বীকার করেছে, কারণ তাদের স্বভাব তথা পেশা ও পদের প্রতিকূল কোন কাজ তারা কিছুতেই করতে চায় না।

আইনবিদদের মধ্যে একটা নীতি চালু আছে যে, যা কিছুই আগে করা হয়েছে, তা ফের আইনসম্মত ভাবে করা যেতে পারে। সেইজন্য তারা অতি যত্ন সহকারে সাধারণ ন্যায় বিচার ও মানবিক বিচারবুদ্ধির বিপক্ষে যে সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখে। এইগুলিকে 'পূর্বঘটিত ব্যাপার' নাম দিয়ে তারা চরম অন্যায় মতকেও আইনানুগ করে তোলার কাজে ব্যবহার করে। বিচারকেরাও সেই অনুসারে রায় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

বক্তব্য উপস্থাপনের সময় তারা বিষয়টির ভাল দিকগুলিকে সযত্নে পরিহার করে

চলে ; বরং অপ্রয়োজনীয় ও সম্পর্ক রহিত নানা ব্যাপার নিয়ে একঘেয়ে ভাবে হিংস্র চিৎকার করে চলে। যে কাল্পনিক মামলাটির কথা বলছিলাম, সেটিকেই ধরা যাক। এই উকিলরা কখনো জানতে চায় না যে আমার বিরুদ্ধবাদী লোকটির আমার গরুর ওপর কিরকম ন্যায্য দাবী বা অধিকার আছে। বরং জানতে চায়, গরুটা সাদা না

বিচারকেরা সেই অনুসারে রায় দিতে দ্বিধা করে না

কালো ; তার শিং-দুটো লম্বা না বেঁটে ; যে জমিতে তাকে চরাই সেটা গোল না চৌকো ; তার দুধ দোওয়ানো হ'ত বাড়ির ভেতরে না বাইরে ; তার কোনো রোগ আছে কি নেই ; এবং ইত্যাদি। এর পরে তারা 'পূর্বঘটিত ব্যাপার' খুঁজে দেখে, কিছুদিন পর পর মামলা মুলতুবি রাখে, এবং দশ, বিশ বা ত্রিশ বছর পরে সিদ্ধান্তের দিকে পেঁছয়।

একই সঙ্গে আর একটা জিনিষ দেখা দরকার। এই শ্রেণীর একটি বিশেষ ধরণের দুর্বোধ্য ভাষা আছে, যা কোন জীবিত প্রাণীর পক্ষে বোঝা অসম্ভব। তাদের সমস্ত আইন এই ভাষায় লেখা এবং তারা সযত্নে এই ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। এর দ্বারা তারা সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়ের মূল কেন্দ্রটিকেই সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট করে দিয়েছে। যার ফলে ত্রিশ বছর লাগে এই কথাটার নিষ্পত্তি করতে যে, আমার ছ'পুরুষের যে জমি আমি ভোগ করছি, তা প্রকৃতই আমার, নাকি তিনশো মাইল দূরের আর এক বাসিন্দার।

রাজদ্রোহের অপরাধে যাদের বিচার হয়, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য বেশ প্রশংসনীয় ও নাতিদীর্ঘ একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বিচারক প্রথমে জেনে নেন, ক্ষমতাশীল

লোকদের দৃষ্টিভঙ্গী ওই অপরাধী সম্পর্কে কি রকম। তার পরে তিনি কঠোরভাবে আইনের সব দিক বজায় রেখে অপরাধীটিকে ফাঁসি দিতে পারেন, বা বাঁচাতেও পারেন।

এইখানে প্রভু আমাকে বাধা দিলেন। তিনি বললেন যে, আমার কথা অনুযায়ী, এই সব আইনজীবীরা অত্যন্ত ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, এরকম অসাধারণ মস্তিষ্ক সম্পন্ন লোকেরা অন্যান্যদের ধী ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে অনুপ্রাণিত হয় না।

এর উত্তরে আমি বললাম যে, এদের নিজেদের পেশার বাইরে অন্য সমস্ত ব্যাপারে এরা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মূর্খ ও নির্বোধ, সাধারণ কথোপকথনে সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং সব রকম জ্ঞান ও শিক্ষার চরম শত্রু; এবং তাদের নিজেদের পেশাগত বিষয় সহ অন্যান্য প্রতিটি বিষয়ে এরা মানবজাতির সাধারণ বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাণী অ্যানের অধীনে ইংল্যান্ডের অবস্থার বর্ণনা অব্যাহত—ইউরোপের রাজসভাগুলির প্রধান মন্ত্রীদের চরিত্র।

আমার প্রভু এখনো কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না যে শুধুমাত্র স্বজাতির ক্ষতি করার জন্য কেন আইনজীবীরা নিজেদের হতবুদ্ধি, অশান্ত ও ক্লান্ত ক'রে অবিচারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তাদের যে কেউ ভাড়া করতে পারে—এ ব্যাপারটাও তিনি বুঝছিলেন না। তখন আমি বহু কষ্টে তাঁকে বোঝালাম 'অর্থ' কাকে বলে, তাকে কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, কি জিনিষ দিয়ে তা তৈরী হয় এবং ধাতুর মূল্য কি রকম। একজন ইয়াহু যখন এই বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে জমিয়ে ফেলে, তখন সে যা খুশি তাই কিনতে পারে। সবচেয়ে ভাল পোশাক, বৃহত্তম বাড়ি, বিশাল জমি ও সবচেয়ে দামী মাংস ও মদ। সে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বউও পছন্দ মতো বেছে নিতে পারে।

সুতরাং আমাদের ইয়াহুদের মতে, যেহেতু একমাত্র অর্থ দ্বারাই উপরোক্ত কাজগুলি করতে পারা সম্ভব, সেহেতু তারা যতই অর্থ জমাক বা খরচ করুক, কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না, এবং তাদের স্বাভাবিক মানসিকতা বিকৃত হয়ে প্রাচুর্যের লালসায় পরিণত হয়েছে। ধনী লোকেরা গরীবদের শ্রমের ফসল ভোগ করে, এবং প্রতি হাজার গরীবের অনুপাতে একজন মাত্র ধনী আছে। আমাদের অধিকাংশ লোক অল্প মাইনেতে প্রতিদিন পরিশ্রম করে ও অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে বাস করে, যাতে অল্প কিছু লোক প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পারে। আমি এই সমস্ত ব্যাপার বেশ ভাল ভাবে খুঁটিয়ে বললাম। কিন্তু প্রভু তবুও সন্তুষ্ট হলেন না।

তিনি বললেন যে, মাটি থেকে যা কিছু ফসল উৎপন্ন হয়, তার ওপর সব জীবেরই দাবী থাকে। বিশেষতঃ যারা অন্যদের ওপর প্রভুত্ব করে। সুতরাং 'সবচেয়ে দামী মাংস' বলতে আমি কি বোঝাতে চাইছি এবং আমাদের কেউ কেউ তা চায়ই বা কেন? তখন আমি যত রকম মাথায় এল, সব রকমই বর্ণনা করলাম এবং সে সবের ড্রেসিঙের নানা পদ্ধতিও বর্ণনা করলাম। এজন্য এবং আরো নানা রকম পানীয়, সস্ ও

বিভিন্ন রকম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য বড় বড় জাহাজ সমুদ্র পেরিয়ে পৃথিবীর নানা বন্দরে এসব আনতে যায়।

আমি প্রভুকে জোরের সঙ্গে জানালাম যে আমাদের একজন ধনী নারী ইয়াহু যে প্রাতরাশ খান বা যে পাত্রে তাঁর খাদ্য রাখা হয়, তার জন্য একটি বাণিজ্য জাহাজ অন্ততঃ তিনবার সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসে।

প্রভু বললেন, যে দেশে তার অধিবাসীদের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় না, সে দেশের অবস্থা নিশ্চয় খুব খারাপ। তাছাড়া, তাঁর আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল এই ভেবে যে, আমি যে সব বিশাল জমির কথা বলছি, সেগুলোয় একটুও সুপেয় জল নেই এবং পানীয়ের খোঁজে জাহাজকে সমুদ্রযাত্রা করতে হয়!

আমি তাঁকে জানালাম যে ইংল্যাণ্ড (আমার প্রিয় জন্মভূমি), তার সমস্ত অধিবাসীরা যা খেতে পারে, তার তিনগুণ ফসল উৎপাদন করে। এই সঙ্গে শস্য থেকে ও কয়েকটি বিশেষ ফলকে পেষাই করেও চমৎকার পানীয় তৈরী হয়। মোটকথা, জীবনধারণের সব ক্ষেত্রেই উৎপাদনের মাত্রা খুব উঁচু। কিন্তু আমাদের পুরুষদের বিলাসপ্রিয়তা ও লালসা এবং নারীদের অহংকারের খোরাক জোগাতে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অধিকাংশই অন্য দেশে পাঠিয়ে, তার বদলে রোগ, উচ্ছৃংখলতা ও পাপের জিনিষপত্র সে সব দেশ থেকে আমদানি করি, ও নিজেদের মধ্যে ব্যায় করি। যার ফলে জীবনধারণের প্রয়োজনেই বহু লোক ভিক্ষা, ডাকাতি, চুরি, লোক ঠকানো, দালালি, তোষামোদি, জালিয়াতি, জুয়া খেলা, মিথ্যাচার, বিষপ্রয়োগ, মানহানি ইত্যাদি নানা পেশা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। উপরোক্ত কথাগুলি প্রত্যেকটি প্রভুকে বোঝাতে অবশ্য আমার বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল।

আমি আরো বললাম যে মদ অন্য দেশ থেকে আমদানি করা হয় জলের অভাব মেটাতে নয়; এর কারণ মদ এক ধরণের তরল পানীয় যা আমাদের স্বাভাবিক চৈতন্য লুপ্ত করে আমাদের স্ফূর্তি বাড়ায়। সমস্ত বিষণ্ণ চিন্তাকে তাড়িয়ে দেয়, মস্তিষ্কে উন্মত্ত চিন্তার জন্ম দেয়, আমাদের আশা বাড়িয়ে তোলে ও ভয়কে নির্বাসিত করে; আমাদের বিচারবুদ্ধিকে সাময়িক ভাবে অবলুপ্ত করে এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবশ করে দেয়, যতক্ষণ না আমরা এক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। অবশ্য এটাও সত্যি যে, এই ঘুম ভেঙে যখন আমরা উঠি, তখন সর্বদাই আমরা অসুস্থ ও বদমেজাজী হয়ে পড়ি। এই পানীয়ের ব্যবহার আমাদের শরীরে নানা রোগের সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের জীবনকে করেছে অস্বস্তিময় ও সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু এসব বাদ দিলে, আমাদের অধিকাংশ লোকই ধনীদের ও পরস্পরের নানা চাহিদার জোগান দিয়ে জীবিকা উপার্জন করে। যেমন, যখন আমি বাড়িতে থাকি এবং উপযুক্ত পোশাক পরে থাকি, তখন আমি আমার দেহে অন্ততঃ একশো জন লোকের নৈপুণ্যের ফসল বহন করি; আমার বাড়ি ও তার আসবাবপত্রের পেছনেও অন্ততঃ আরো একশো লোকের কাজের স্বাক্ষর থাকে; এবং আমার স্ত্রীকে সাজাতে অন্তত এরও পাঁচগুণ লোকের।

আমি তাঁকে এরপর আরেক ধরনের লোকের কথা বললাম, যারা অসুস্থ লোকেদের চিকিৎসা করে জীবন ধারণ করে। আমি এর আগে প্রভুকে অনেকবার বলেছি যে,

এক ধরনের তরল পানীয় আমাদের স্ফূর্তি বাড়ায়

আমার অনেক নাবিক রোগে মারা গিয়েছিল। কিন্তু আমি ঠিক যা বলতে চাইছি, সেটা তাঁকে চরম ঝামেলার পরে বোঝাতে পারলাম। তিনি জানেন যে মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে হুঁইঁনহঁমেরা দুর্বল ও ভারী হয়ে যায়; অথবা কখনো কোন দুর্ঘটনায় তাদের কোন একটি অঙ্গ জখম হতে পারে। কিন্তু তাঁর মতে এটা অসম্ভব যে, যে প্রকৃতি সব জিনিষকে নিখুঁত ভাবে তৈরী করে, সেই আমাদের দেহে রোগের জন্ম দেবে; এই সাংঘাতিক ঘটনার পেছনে কি কারণ কাজ করে, তা তিনি জানতে চাইলেন।

আমি তখন তাঁকে বললাম যে, আমরা হাজার রকম জিনিষ খাই, যেগুলি সব পরস্পরের বিপরীত প্রতিক্রিয়া করে; আমরা ক্ষুধার্ত না হ'লেও খাই; তৃষ্ণার্ত না হ'লেও পান করি; একটুও কিছু না খেয়ে আমরা সারা রাত বসে তীব্র সুরাপান করি; এর ফলে আমরা অলস হয়ে পড়ি; আমাদের শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি হয় এবং আমাদের হজম শক্তি বিঘ্নিত হয়। এরকম অনেক রোগ বাবার থেকে ছেলেরা পায়, যার ফলে বহু শিশু জটিল নানা রোগ সহ জন্মগ্রহণ করে। মানুষের শরীরে যে কত রকম রোগ হয়, তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়; তবে তাদের সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ-ছ'শো হবেই এবং আমাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, তা সে বাইরের বা ভেতরের যাই হোক

না কেন, কিছু না কিছু রোগ আছেই। এর প্রতিকার করতে আমাদের মধ্যে এক ধরণের লোককে শিক্ষা দিয়ে বড় করে তোলা হয়, যারা অসুস্থদের সুস্থ করে তোলার পেশা অবলম্বন করে বা ভান করে। এই বিদ্যায় আমার কিছুটা পারদর্শিতা আছে। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ এর সম্পূর্ণ রহস্য ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করছি।

তাদের বিদ্যার মূল তত্ত্ব হচ্ছে যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয় দেহের 'পূর্ণীকরণ' থেকে ; এর থেকে তারা সিদ্ধান্ত করে যে সম্পূর্ণ 'শূন্যকরণ' প্রয়োজন, হয় স্বাভাবিক ভাবে দূষিত পদার্থ বেরোবার দ্বার দিয়ে, অথবা মুখ দিয়ে। এর পরে তারা লতা, গুল্ম, খনিজ, তেল, শামুক, ঝিনুক, নুন, পাতার রস, শ্যাওলা, বিষ্ঠা, গাছের ছাল, সাপ, ব্যাঙ, মাকড়সা, মৃত মানুষের মাংস ও হাড়, পাখী, পশু ও মাছ থেকে একটা এমন দুর্গন্ধময় ও অখাদ্য একটা ওষুধ তৈরী করে, যেটা যে কোন মানুষের পেট মুহূর্তের মধ্যে চরম ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে, একে ওরা বলে 'বমন'। অথবা ওই সব জিনিষ থেকেই তৈরী আর একটা বিশ্রী জিনিষ ডাক্তারের ইচ্ছে অনুযায়ী মুখ বা মলদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, এটাও পেটের পক্ষে অতি বিরক্তিকর ও অস্বস্তিকর, তবে এ জিনিষটা খুব ভালভাবে পেট পরিষ্কার করে সব নোঙরা পদার্থ বার করে দেয়, ডাক্তাররা একে বলে 'শুদ্ধীকরণ'। এইসব চিকিৎসকদের মতে, মুখদ্বার শ্রেষ্ঠতর হওয়ায় কঠিন ও তরল খাদ্যদ্রব্য এইখান দিয়ে ঢোকানোর জন্যই প্রকৃতি নিয়ম করেছে, এবং মলদ্বার দিয়ে নোঙরা বেরোনোর নিয়ম। চিকিৎসকেরা কিন্তু বলে যে, রোগ হ'লে প্রকৃতির এই নিয়ম আর বজায় থাকে না ; সুতরাং প্রকৃতিকে পুনরায় শরীরে অধিষ্ঠিত করতে হ'লে শরীরের চিকিৎসা করতে হবে ঠিক উলটো নিয়মে, অর্থাৎ এই দুই দ্বারের কাজকে উলটে দিয়েঃ মলদ্বার দিয়ে ঢোকাতে হবে কঠিন ও তরল দ্রব্য এবং নোঙরা বার করতে হবে মুখ দিয়ে।

কিন্তু বাস্তব রোগ ছাড়া অনেক কাল্পনিক রোগেও আমরা আক্রান্ত হই এবং সেগুলির জন্য ডাক্তাররা কাল্পনিক আরোগ্যকরণ আবিষ্কার করেছে। এই সব রোগের এবং তাদের উপযোগী ওষুধগুলির নানারকম নাম আছে ; আমাদের নারী ইয়াহুরা প্রায় সর্বদাই এই সব রোগে পীড়িত হয়ে পড়ে।

এই চিকিৎসক জাতের একটা বিরাট কৃতিত্ব হ'ল রোগের গতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌-বাণী করা, এবং এই কাজে তারা খুব কমই ব্যর্থ হয়। যে কোন রোগ যখনই খারাপের দিকে মোড় নেয়, তারা সাধারণতঃ তখন মৃত্যুর ভবিষ্যদ্‌বাণী করে, কারণ রোগীকে মেরে ফেলা তাদের হাতের মুঠোয়, যদিও সারিয়ে তোলাটা নয়। সুতরাং তাদের রায় দিয়ে দেওয়ার পরে যদি অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তখন জাল ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে প্রতিপন্ন হওয়ার বদলে, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে তারা নিজেদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রমাণ রাখে।

এই একই ভাবে তারা সাহায্য করে সেই সব স্বামী-স্ত্রীদের, যারা পরস্পরকে আর সহ্য করতে পারে না ; বা বুড়ো বাপের বড় ছেলেদের, রাজ্যের বড় মন্ত্রীদের এবং মাঝে মাঝে রাজাদেরও তারা সাহায্য করে।

এর আগে আমি আমার প্রভুর সঙ্গে দেশের সরকার ও তার কাজকর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছিলাম, বিশেষ করে আমার স্বদেশের অসাধারণ সংবিধান সম্পর্কে, যা সারা পৃথিবীর বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করে। কিন্তু এখানে 'রাজ্যের মন্ত্রী' কথাটা উচ্চারণ করতেই প্রভু আমাকে ধরলেন এবং আদেশ করলেন তাঁকে বোঝাতে, কোন জাতের ইয়াহুদের আমি ওই বিশেষণে অভিহিত করছি।

আমি তাঁকে জানালাম যে, রাজ্যের প্রথম বা প্রধান মন্ত্রী এমন একটি প্রাণী, যার মধ্যে আনন্দ, দুঃখ, ভালবাসা, করুণা, ঘৃণা বা রাগ ইত্যাদি কোন আবেগের চিহ্নমাত্র নেই। সে ধনসম্পদ, ক্ষমতা ও খেতাব অর্জনের একটি প্রচন্ড ইচ্ছে ছাড়া অন্য কোন আবেগই প্রকাশ করে না। সে সব রকম ব্যাপারেই কথা বলে, শুধু নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা ছাড়া; সে এমন ভাবে সত্য বলে, যা শুনলে আপনার মনে হবে তা মিথ্যা; এবং মিথ্যা এমন কৌশলের সঙ্গে উপস্থাপিত করে, যে তাকে আপনি বিশ্বাস করবেন সত্য ব'লে। যাদের পেছনে সে দারুণ সমালোচনা করে, নিশ্চিত ভাবে তারাই রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে তার প্রিয়পাত্র। এবং যেদিন থেকে সে আপনার প্রশংসা করতে শুরু করবে, জেনে রাখবেন সেদিন থেকেই আপনার দুরবস্থা আরম্ভ হল। তার কাছ থেকে সর্বাপেক্ষা খারাপ জিনিষ যা পেতে পারেন, তা হ'ল একটি প্রতিজ্ঞা, বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি একটি শপথও থাকে। যে কোন বুদ্ধিমান লোক তখন সব আশা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

তিনটি উপায়ে প্রধান মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। প্রথমটি হ'ল, বিচক্ষণতার সঙ্গে স্ত্রী, কন্যা বা বোনকে কাজে লাগানো। দ্বিতীয়টি হ'ল, পূর্বসূরীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। এবং তৃতীয়টি হ'ল, রাজসভার দুর্নীতি নিয়ে জনসমক্ষে প্রচন্ড চিৎকার ক'রে তাকে আক্রমণ করা। অবশ্য সত্যিকারের বুদ্ধিমান রাজা শেষোক্ত উপায় অবলম্বনকারীদেরই নিয়োগ করা পছন্দ করেন। কারণ এই সব নীতির ধ্বজাধারীরাই দেখা যায় তাদের প্রভুর ইচ্ছে ও আবেগ অনুযায়ী সব থেকে বেশি সহজে ওঠাবসা করে। এই মন্ত্রীদের হাতেই সব রকম চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, এবং তার জোরে তারা সেনেট বা কাউন্সিলের সদস্যদের ঘুষ দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখে। এসব কাজের জন্য কেউ কিন্তু তাদের ছুঁতেও পারে না, কারণ আইনের বলে তারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে; এবং সে কারণে তারা স্বচ্ছন্দে দেশকে লুণ্ঠন ক'রে সেই সব ধনদৌলত সহ অবসর গ্রহণ করে।

প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদটি হ'ল তার নিজেদের পেশায় শিক্ষানবীশদের তৈরী করে তোলার জায়গা। তার ভৃত্য, কুলি ও তোষামুদে ব্যক্তিরা তাদের প্রভুকে সব ব্যাপারে অনুকরণ করে এবং মন্ত্রীত্ব লাভ করে। ক্রমে তারা মন্ত্রীত্বের তিনটি প্রধান মশলা, বেহায়াপনা, মিথ্যে কথা বলা ও ঘুষ দেওয়ায় অত্যন্ত পটু হয়ে ওঠে। সেই অনুসারে অতি উচ্চপদস্থ ও সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তি তাদের গোপনে নিয়মিত টাকা দিয়ে থাকেন, এবং এই মন্ত্রীদের কেউ কেউ কৌশল ও নির্লজ্জতার বলে ধাপে ধাপে উঠে শেষ অবধি তাদের প্রভুর উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়।

প্রধান মন্ত্রীকে আবার শাসন করে কোন বৃদ্ধা অথবা কোন প্রিয় ভৃত্য। এদেরই মাধ্যমে সমস্ত সুবিধে বিতরণ করা হয়, এবং সত্যি বলতে এরাই দেশের শাসক।

একদিন আমার প্রভু, আমার দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা শুনে, আমাকে একটু প্রশংসা করলেন, যার যোগ্য আসলে আমি নই। তিনি বললেন যে নিশ্চয়ই আমিও একটি অভিজাত পরিবারের সন্তান, কারণ তাঁর দেশের সব ইয়াহুদের থেকে চেহারা, গাত্রবর্ণ ও পরিচ্ছন্নতায় আমি অনেক ওপরে, যদিও গায়ের জোর ও তৎপরতায় আমি মোটেই তাদের সমতুল্য নই। এর জন্য অবশ্যই দায়ী এই জন্তুগুলোর থেকে আমার পৃথক জীবনযাত্রা। এ ছাড়াও আমি কথা বলতে পারি তো বটেই, উপরন্তু কিছুটা বিচারবুদ্ধিও আমার আছে, যার জন্য তাঁর সব পরিচিতরা আমাকে অসাধারণ এক সৃষ্টি রূপে দেখে থাকেন।

তিনি আমাকে বললেন যে, হুঁই‌ঁনহ্ঁমদের মধ্যেও সাদা, টাট্টু ও ধূসর রঙের যারা আছে, তাদের চেহারা ছিটছিট ধূসর, কালো ও বাদামীদের মতো নয়। তারা সমান মানসিক প্রতিভা বা বুদ্ধিকে উন্নত করার ক্ষমতা নিয়েও জন্মগ্রহণ করে না। তারা বরাবর ভৃত্য হয়েই থাকে এবং নিজের জাতের ওপরে ওঠার চেষ্টাও কখনো করে না। এদেশে সে রকম কাজ অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে গণ্য হবে।

আমি প্রভু মহাশয়কে আমার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। একই সঙ্গে তাঁকে এও জানালাম যে আমার জন্ম সাধারণ পরিবারে, আমার মাতা-পিতা সাধারণ কিন্তু সৎ, এবং তাঁরা কোনমতে আমাকে শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছিলেন মাত্র। আমি এরপর বললাম যে, আমাদের দেশের অভিজাত সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা আছে, তারা মোটেই সেরকম নয়। আমাদের অভিজাত লোকেরা তাদের ছোটবেলা থেকেই আলস্য ও বিলাসের মধ্যে বেড়ে ওঠে। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া মাত্রই তারা আমোদ-প্রমোদ ও ভোগ বিলাসের সংস্পর্শে এসে তাদের শারীরিক শক্তি হারায় ও নানা বিশ্রী রোগে আক্রান্ত হয়। যখন তাদের টাকা পয়সা প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে, তখন তারা শুধুমাত্র টাকার জন্য কোন একটা নীচু-বংশীয়া, অসভ্য মেয়েকে বিয়ে করে, যদিও তার প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ছাড়া তাদের মনে আর কিছুই থাকে না। তারপর তাদের যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তারা বিকলাঙ্গ বা রুগ্ন হয়। এই জন্য তিন পুরুষের বেশি এই সব পরিবার আর স্থায়ী হয় না। সুতরাং সাধারণ ভাবে অভিজাত বংশের সঠিক চিহ্ন হ'ল একটি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শরীর, শীর্ণ মুখমণ্ডল এবং ফ্যাকাশে গাত্রবর্ণ ; অভিজাত বংশীয় কেউ যদি স্বাস্থ্যবান ও হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহ'লে সেটা অত্যন্ত অমর্যাদাকর ব'লে মনে করা হয়। শরীরের এইসব খুঁতের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে তার মানসিক গঠন ঃ মূর্খামি, অজ্ঞতা, দম্ভ, অসভ্যতা ও চাপল্যের সমষ্টি।

এই ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীটির সমর্থন বা অনুমতি ছাড়া কোন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব নয় ; বদল করা বা প্রত্যাহার করাও অসম্ভব। এবং আপীল ব্যতীতই এরা আমাদের যে কোন সম্পত্তি সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্বদেশের প্রতি লেখকের গভীর ভালবাসা—ইংল্যাণ্ডের সংবিধান সম্বন্ধে সদৃশ ঘটনার উদাহরণ সহ তাঁর প্রভুর অভিমত—মনুষ্য প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রভুর মতামত।

পাঠক হয়তো এই ভেবে বিস্মিত হচ্ছেন যে আমার স্বজাতির সম্পর্কে এরকম একটা আলোচনা আমি কেন করলাম, বিশেষ করে এমন কিছু প্রাণীর সঙ্গে, যারা তাদের দেশের ইয়াহুদের সঙ্গে আমার চেহারার সাদৃশ্য দেখে ইতিমধ্যেই মানুষের সম্পর্কে অত্যন্ত বিশ্রী ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিল। কিন্তু আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে এই চতুষ্পদ প্রাণীদের বেশ কিছু চমৎকার চরিত্রগুণের সঙ্গে মনুষ্য সমাজের দুর্নীতির যে তুলনা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, তাতে আমার চোখ খুলে গিয়েছিল এবং মনুষ্য জাতির কাজকর্ম ও মানসিক আবেগ-ইচ্ছা ইত্যাদিকে আমি এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে শুরু করেছিলাম।

এর ফলে আমার স্বজাতির সম্মান বাড়ানোর কোন চেষ্টা বৃথা মনে হয়েছিল। তাছাড়া, আমার প্রভুর মতো তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে সে রকম চেষ্টা করা অসম্ভব ছিল, কারণ তিনি প্রায় রোজই আমার মধ্যেও একরাশ করে দোষ ও খুঁত দেখিয়ে দিতেন, যে সব দোষ মনুষ্য সমাজে অন্যায় মনে হওয়া দূরে থাক, অক্ষমতা বলেও কারো মনে হয় না। এবং সেগুলো যে আদৌ আমার মধ্যে আছে, তা আমার নিজেরও ধারণায় ছিল না। তাঁকে দেখে আমিও সমস্ত প্রকার মিথ্যা বা সত্য গোপনের চেষ্টাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতে শিখেছিলাম। 'সত্য' আমার কাছে এতো আদরণীয় বলে মনে হ'ত, যে তার জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম।

সমস্ত ব্যাপারটাকে এইরকম খোলাখুলি ভাবে উপস্থাপিত করার পেছনে আমার আরো জোরদার একটা উদ্দেশ্য অবশ্য কাজ করেছিল। এই দেশে এক বছরেরও কম সময় কাটানোর মধ্যেই এর অধিবাসীদের সম্পর্কে আমার এমন ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মেছিল

যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর মনুষ্য সমাজে ফিরব না ; বরং এই প্রশংসনীয় হুইনহ্‌ম জাতির সঙ্গে বাস করে সারা জীবন প্রকৃত ধর্মের চিন্তায় ও অভ্যাসে কাটিয়ে দেব। এর ফলে আমার মন ও জীবন থেকে সমস্ত পাপ চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। কিন্তু আমার চিরশত্রু ভাগ্যদেবী সিদ্ধান্ত নিলেন যে এত মহান সুযোগ আমাকে দেওয়া উচিত হবে না।

যাই হোক, এখন অন্ততঃ এই কথা ভেবে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছি যে, আমার প্রভুর মতো কঠোর পরীক্ষকের সামনে যতখানি সম্ভব ততখানি আমি আমার দেশের মানুষদের দোষগুলো কম করে দেখিয়েছিলাম। কারণ, সত্যি বলতে, এমন কে আছে যে জন্মভূমির প্রতি পক্ষপাত ও সমর্থন দেখাবে না ?

আমি যতদিন আমার প্রভুর সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তার মধ্যে আমাদের যা কথাবার্তা হয়েছিল, তার সারাংশ মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছি। যা লিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশিই বাদ দিয়েছি।

তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর আমার মনে হ'ল যে হয়তো তাঁর কৌতূহলের নিবৃত্তি হয়েছে। একদিন খুব সকালে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে একটু দূরে বসতে বললেন (এর আগে এই সম্মান তিনি আমার প্রতি কখনো দেখান নি)। তিনি বললেন, যে আমার পুরো কাহিনীটা তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছেন। তিনি আমাদের এক জাতীয় পশু হিসেবে দেখছেন। যাদের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা বলে কিঞ্চিৎ বিচারবুদ্ধি ঢুকে গেছে, এবং তার দ্বারা আমরা শুধুমাত্র নিজেদের স্বাভাবিক দুর্নীতিগুলোকে খুঁচিয়ে আরো বাড়িয়ে তুলি এবং নতুন অনেক দুর্নীতি আয়ত্ত করি। প্রকৃতিদেবী আমাদের যে কয়েকটি মাত্র সদ্‌গুণ দিয়েছিলেন, সেগুলিকেও আমরা দূর করে দিয়েছি। আমাদের মূল চাহিদাগুলিকে শতগুণে বাড়িয়ে তুলতে আমরা সফল হয়েছি এবং আমাদের নানা আবিষ্কারের দ্বারা সেগুলিকেই মেটাবার ব্যর্থ চেষ্টায় সারা জীবন কাটিয়ে দিই।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে দেখা যায় যে একটা অতি সাধারণ ইয়াহুর যে ক্ষিপ্রতা ও শক্তি আছে, তার বিন্দুমাত্রও আমার নেই। আমি পিছনের পায়ে ভর দিয়ে অত্যন্ত দুর্বল ভঙ্গীতে হাঁটি। এবং কোন একটা উপায়ে আমার থাবার নখগুলোকে ও গালের চুলগুলোকে উপড়ে ফেলি, যদিও প্রকৃতি সেগুলি দিয়েছে যথাক্রমে আত্মরক্ষার অস্ত্র ও রোদ-বৃষ্টির প্রকোপ থেকে বাঁচবার উপায় হিসেবে। শেষতঃ, এদেশের ইয়াহুদের মতো আমি জোরে দৌড়তেও পারি না, বা গাছে চড়তেও পারি না, যদিও প্রাণী হিসেবে তারা আমার ভ্রাতৃপ্রতিম।

তিনি আরো বললেন যে আমাদের সরকার ও আইন সংক্রান্ত যা কিছু নিয়মাবলী বা প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি সবই আমাদের বিচারবুদ্ধি ও চারিত্র্যগুণের চরম খুঁত থেকে উদ্ভূত। কারণ যে প্রাণীর বিচারবুদ্ধি আছে, তাকে চালিত করতেও বিচার-বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু লাগে না। আমার স্বজাতির যে বর্ণনা আমি দিয়েছি, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এধরণের চরিত্র আমাদের মোটেই নেই। যদিও আমি 'এমন

অনেক জিনিষ বলেছি যা নেই' এবং স্বজাতিকে প্রিয় করে উপস্থাপিত করার জন্য অনেক কথা চেপেও গিয়েছি, তবুও তিনি এ ব্যাপারটা বেশ ভালই বুঝেছেন।

তাঁর এই মত আরো দৃঢ় হ'ল কারণ, ইয়াহুদের সঙ্গে আমার সাদৃশ্য কেবল চেহারাতেই নয়; আমাদের জীবনযাত্রা, ভাবভঙ্গী, কাজকর্ম ইত্যাদির যে বর্ণনা আমি তাঁকে দিয়েছি, তাতে ইয়াহুদের সঙ্গে আমাদের মানসিক সাদৃশ্যও প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি বললেন, একথা সকলেই জানে যে ইয়াহুরা অন্য প্রাণীদের চেয়ে পরস্পরকে অনেক বেশি ঘৃণা করে। এর কারণ সাধারণতঃ মনে করা হয় এই যে, তারা স্বজাতির অন্তর্গত অন্যদের বিশ্রী ও কুৎসিৎ চেহারাকে ঘৃণা করে, কিন্তু নিজেদেরও যে ওই একই চেহারা, তা দেখতে পায় না বা বুঝতেও পারে না।

সেইজন্য আগে প্রভু মনে করতেন যে আমাদের শরীর ঢেকে রাখার পদ্ধতিটা বেশ বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে, কেননা এর দ্বারা আমরা পরস্পরের কাছ থেকে নিজেদের শরীরের অনেক খুঁত লুকিয়ে রাখতে পারি, যা নগ্নভাবে দেখা গেলে ঘৃণার উদ্রেক করত। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে তাঁর ওই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। ইয়াহুদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদও আমাদেরই মতো কারণ সমূহ থেকে উদ্ভূত। উদাহরণ স্বরূপ, যদি পাঁচটা ইয়াহুর মধ্যে পঞ্চাশজনের মতো খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় তাহ'লে তারা শান্তিপূর্ণ ভাবে ভাগ করে না খেয়ে পরস্পরের মধ্যে চরম মারামারি শুরু করে দেবে, কেননা প্রত্যেকেই পুরো খাবারটা তার একার জন্য চাইবে।

সেই জন্য ওদের যখন খেতে দেওয়া হয়, একজন ভৃত্যকে তখন কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, এবং প্রত্যেকটা ইয়াহুকে আলাদা আলাদা খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। যদি একটা গরু বুড়ো হয়ে বা দুর্ঘটনার ফলে মারা যায়, তবে কোন হুঁইনহ্‌ম যদি তাড়াতাড়ি এসে সেটাকে তার নিজের ইয়াহুদের জন্য সরিয়ে রাখতে পারল, তো ভাল। নতুবা, আশপাশের অঞ্চল থেকে দলে দলে ইয়াহুরা এসে সেই একটা গরুর জন্য নিজেদের মধ্যে সাংঘাতিক মারপিট শুরু করে দেয় এবং তাদের নখ দিয়ে পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। অবশ্য আমাদের মতো মারণাস্ত্র তাদের না থাকার ফলে কাউকে নিহত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

অন্য অনেক সময়ে দেখা গেছে বিভিন্ন অঞ্চলের ইয়াহুরা পরস্পরের মধ্যে ভীষণ লড়াই বাধিয়েছে, যদিও আপাত দৃষ্টিতে তার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এক অঞ্চলের ইয়াহুরা সর্বদা অন্য অঞ্চলের ইয়াহুদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের শারীরিক ক্ষতি করবার ফন্দী আঁটে। যদি কোন কারণে তাদের এই ফন্দী কার্যকর না করা যায়, তখন তারা (আমার কথানুযায়ী) 'গৃহযুদ্ধে' লিপ্ত হয়।

তাঁর দেশে কয়েকটি জায়গায় মাঠের মধ্যে এক ধরণের নানা রঙের চকচকে পাথর পাওয়া যায়, সেগুলো ইয়াহুরা প্রচণ্ড ভালবাসে। যখন এই পাথরগুলো মাটির নীচে থাকে, ইয়াহুরা সারাদিন ধরে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেগুলোকে বার করে এবং তাদের গর্তে বা খোঁয়াড়ে সেগুলোকে স্তুপীকৃত করে লুকিয়ে রাখে। সর্বদা তারা এগুলোর

প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পাছে তাদের সংগীদের মধ্যে কেউ জানতে পেরে যায় এই গুপ্তধনের কথা।
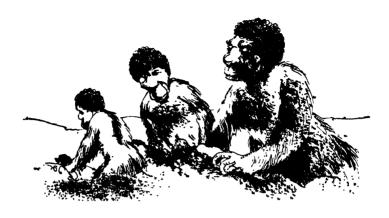
ইয়াহুরা সারাদিন ধরে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেগুলোকে বার করে

প্রভু বললেন যে, এই অস্বাভাবিক চাহিদার কারণ তিনি কিছুতেই আবিষ্কার করতে পারেন নি এতদিন। কিন্তু এখন তিনি বুঝতে পারছেন যে এর মূলে আছে 'লোভ', যা আমি মনুষ্যজাতির মধ্যেও আছে বলে বর্ণনা করেছি।

একবার তিনি নিছক পরীক্ষা করার জন্য একটা ইয়াহুর গর্ত থেকে একরাশ এই পাথর সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। দেখা গেল যে, নোংরা জানোয়ারটা তার গুপ্তধন হারিয়ে শোক-দুঃখে এমন উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে শুরু করল, যে পুরো ইয়াহুর পাল তার চারপাশে এসে জড়ো হয়ে গেল। ইয়াহুটা প্রথমে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল ও তারপরে সংগী-সাথীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত-নখ দিয়ে তাদের ক্ষতবিক্ষত করতে শুরু করে দিল।

এরও পরে দেখা গেল, সে কিছু খাচ্ছে না, ঘুমোচ্ছে না, কোন কাজও করছে না। শেষে প্রভু তাঁর একটি ভৃত্যকে ডেকে বললেন, গোপনে পাথরগুলো সেই একই গর্তে ফের লুকিয়ে রেখে আসতে। ইয়াহুটা পাথরগুলো ফিরে পেয়ে সংগে সংগে স্বাভাবিক মেজাজ ফিরে পেল, কিন্তু পাথরগুলো নিয়ে সে এবারে আরো ভাল জায়গায় লুকিয়ে রাখল। সেই থেকে সে বেশ ভালই কাজকর্ম করছে।

প্রভু আরো বললেন, এবং আমি নিজেও পরে দেখলাম, যে সব প্রান্তরে এই চকচকে পাথরগুলো পাওয়া যায়, সেখানে প্রায়ই ইয়াহুদের মধ্যে সাংঘাতিক লড়াই হয়ে থাকে, এবং সর্বদাই প্রতিবেশী ইয়াহুরা তাতে যোগ দেয়।

তিনি জানালেন যে, প্রায়ই দেখা যায় দুটো ইয়াহু কোন একটা পাথরের স্বত্ব নিয়ে মারামারি করছে, এবং সেই সুযোগে তৃতীয় একটা ইয়াহু এসে পাথরটা নিয়ে চম্পট দেয়। প্রভু বললেন, এই ব্যাপারটার সংগে আমাদের আদালতের মামলার বেশ

মিল আছে। আমি ভেবে দেখলাম, এ ব্যাপারটায় তাঁকে ঠকানোটা ঠিক হবে না। কারণ ইয়াহুদের যে ঘটনার কথা তিনি বললেন, তাতে শেষ অবধি মূল বাদী ও বিবাদীর শুধুমাত্র পাথরটা ছাড়া আর কিছুই খোয়া যায় না। কিন্তু আমাদের মহান আদালতে মামলা বছরের পর বছর চলতেই থাকে, যতদিন না বাদী ও বিবাদী দুজনেই সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

আমার প্রভু বলে চললেন। ইয়াহুদের সবচেয়ে কুৎসিত জিনিষ হ'ল তাদের ক্ষুধা। তারা সামনে যা পায় তাই খায়, তা সে লতা, গুল্ম, মূল, বেরী, মৃত পশুর পচা মাংস, যাই হোক না কেন এবং তাদের স্বভাবের আর একটা অদ্ভুত দিক এই যে, তারা অনেক দূরে গিয়ে হিংস্রতা বা চুরির দ্বারা যা পায়, বাড়ির উৎকৃষ্ট খাবারের চেয়েও তা খেতে বেশি ভালবাসে। যদি তাদের শিকার বড়সড় হয়, তাহ'লে তারা এত বেশি খায়, যেন পেট ফেটেই মারা যাবে। কিন্তু প্রকৃতির দয়ায় তারা এমন একটা শেকড় চেনে, যেটা খেলে তাদের পেট বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়।

আর এক রকম শেকড় আছে, যেগুলো রসে ভর্তি। ইয়াহুরা এগুলো চুষতে খুব ভালবাসে। আমাদের ওপর মদের যে প্রতিক্রিয়া হয়, এই শেকড়ের রস ইয়াহুদের মধ্যেও সেই একই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এর ফলে তারা কখনো পরস্পরকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে, কখনো বা মারামারি করে। এই রস খেয়ে তারা চেঁচায়, হাসে, বকবক করে, মাটিতে গড়াগড়ি দেয় এবং শেষে কাদার মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি বাস্তবিক দেখেছিলাম যে এদেশে ইয়াহুরাই একমাত্র প্রাণী যারা রোগে আক্রান্ত হয়। অবশ্য আমাদের সমাজে ঘোড়াদের যত রকম রোগ হয়, তার চেয়ে এদের রোগের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু এই রোগগুলো তাদের কোন রকম অত্যাচারের দরুণ হয় না। এগুলোর জন্য দায়ী শুধুমাত্র তাদের নিজেদের নোঙরামি ও লোভ। এই রোগগুলোকে বোঝানোর জন্য হুঁইনহ্‌ম ভাষাতে কোন শব্দও নেই; সাধারণভাবে এগুলোকে বলা হয় 'হ্নিয়া ইয়াহু' অর্থাৎ ইয়াহুদের পাপ। এর একমাত্র ওষুধ হিসেবে ইয়াহুদের নিজেদেরই মল ও মূত্র একসঙ্গে মিশিয়ে জোর করে তাদের গলায় ঢেলে দেওয়া হয়। এই ওষুধ অনেক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলে আমি জানি। সুতরাং আমি জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সকলকে এই ওষুধ খেতে বলি, কেননা 'পুনর্ভোজন' ঘটিত যে কোন রোগ এতে সারবেই।

শিক্ষাদীক্ষা, সরকার, কলাবিদ্যা, কারখানা ইত্যাদি নানা ব্যাপারে অবশ্য আমার প্রভু স্বীকার করলেন যে তাঁর দেশের ইয়াহুদের সঙ্গে এসব ব্যাপারে আমাদের কোন মিলই নেই। তিনি শুধু আমাদের স্বভাবের মিলগুলিই লক্ষ্য করেছেন। তিনি অবশ্য কোন কোন হুঁইনহ্‌মের কাছে শুনেছেন যে প্রত্যেক ইয়াহুর দলেও নাকি একটা করে সর্দার ইয়াহু থাকে (যেরকম আমাদের পার্কে হরিণের দলে একটা সর্দার মদ্দা হরিণ থাকে) দলের অন্য সকলের থেকে এই সর্দার ইয়াহুটাকে দেখতে অনেক বেশি কুৎসিৎ এবং সে অনেক বেশি পাজিও বটে। এই সর্দারের একটি প্রিয়পাত্র থাকে, সে স্বভাবে তারই মতো। তার কাজ হ'ল তার প্রভুর পা চাটা এবং তার চাহিদা

মতো সবকিছু তাকে যোগানো। একাজের জন্য সে মাঝে মাঝে এক খণ্ড গাধার মাংসের টুকরো পায়। পুরো দল কিন্তু এই প্রিয়পাত্রটিকে ঘৃণা করে। সেইজন্য নিজেকে বাঁচাতে সে সর্বদা তার প্রভুর কাছাকাছি থাকে। সাধারণতঃ যতদিন তার চেয়েও বদ কাউকে না পাওয়া যায়, ততদিন তার এই পদ বজায় থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার প্রভু তাকে তাড়িয়ে দেয়, তখনি তার উত্তরাধিকারী সেই অঞ্চলের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সকলকে সঙ্গে নিয়ে এসে তার সর্বাঙ্গে সকলে মিলে মলত্যাগ করে। এই ব্যাপারের সঙ্গে মনুষ্যজাতির রাজসভা, রাজার প্রিয়পাত্র এবং রাজ্যের মন্ত্রীদের কতখানি মিল আছে, তা আমিই বিচার করতে পারব, বললেন আমার প্রভু।

এই বিদ্বেষ মাখা তুলনার কোন জবাব আমি দিতে পারলাম না। আমার প্রভু যা ইঙ্গিত করলেন, তাতে বোঝায় যে মানুষের বুদ্ধি ও বোধশক্তি একটা কুকুরের চেয়ে বেশি নয়, কারণ কুকুরও খুব সহজেই তার দলের সবচেয়ে শক্তিশালী কুকুরের ডাক শুনে তার পিছু নিতে কখনো ভুল করে না।

আমার প্রভু বললেন যে ইয়াহুদের মধ্যে আর একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস দেখতে পাওয়া যায়, যেটা মনুষ্য জাতির মধ্যে আছে কিনা তা আমি উল্লেখ করিনি। তিনি বললেন যে অন্য জন্তুদের মতো ইয়াহুদের নারীরাও একজনের সঙ্গে ঘর করে না, সকলের সঙ্গেই ঘোরে-ফেরে। এবং পুরুষগুলো যেমন পরস্পরের সঙ্গে, তেমনি নারীদের সঙ্গেও হিংস্রভাবে ঝগড়া ও মারামারি করে। এরকম বীভৎস নিষ্ঠুর ব্যাপার অন্য কোন চেতনাসম্পন্ন প্রাণী কখনো করে না।

ইয়াহুদের মধ্যে আরও একটা জিনিষ তাঁকে বিস্মিত করে—তা হ'ল, নোংরামি ও ধুলো-ময়লার প্রতি তাদের অদ্ভুত আকর্ষণ। কারণ আর সমস্ত জন্তুর মধ্যেই তিনি পরিচ্ছন্নতার প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা সর্বদা লক্ষ্য করেছেন।

প্রথমের অভিযোগের কোন উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে গেলাম, কারণ এ ব্যাপারে আমার জাতের সমর্থনে কোন কথা বলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, যদিও অতীতে আমি সর্বদাই স্বেচ্ছায় তা করেছিলাম। তবে শেষ বিষয়টিতে মনুষ্যজাতিকে একমাত্র ওই স্বভাবযুক্ত প্রাণী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা আমি ব্যর্থ করে দিতে পারতাম, যদি ওদেশে শুয়োর থাকত (আমার দুর্ভাগ্য, ওদেশে শুয়োর পাওয়া যায় না)। কারণ যদিও হয়তো ইয়াহুর চেয়ে চতুষ্পদ প্রাণী হিসেবে শুয়োরকে অনেকের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু নোংরার প্রতি আকর্ষণের দিক দিয়ে দুজনেই সমান একথা মানতেই হয়। আমার প্রভুও নিশ্চয়ই একথা মানতেন, যদি তিনি শুয়োরদের নোংরা খাওয়া এবং কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দেওয়া ও ঘুমোনো দেখতেন।

ইয়াহুদের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও প্রভু উল্লেখ করলেন, যেটা তাঁর অনেক ভৃত্যই লক্ষ্য করেছে, এবং যেটার কারণ বা অর্থ কিছুই তাঁর কাছে আদৌ পরিষ্কার নয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় এক একটা ইয়াহুর মাথায় কি খেয়াল চাপে, সে এক কোণে সরে গিয়ে শুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে কাঁদে বা গোঙায়, এবং তার কাছে যে আসে তাকেই খেঁকিয়ে উঠে তাড়িয়ে দেয়, যদিও সে তরুণ ও হৃষ্টপুষ্ট, এবং খাবার

বা জল কোনটারই তার দরকার নেই। তাঁর ভৃত্যরাও বুঝতে পারে না ইয়াহুটার কষ্ট বা অস্বস্তির কারণ কি। এই রোগ সারাবার একমাত্র উপায়, ইয়াহুটাকে কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগিয়ে দেওয়া। তাহ'লেই সে কিছুক্ষণের মধ্যে ধাতস্থ হয়ে যায়। স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতবশতঃ এখানেও আমি চুপ করে রইলাম। কিন্তু এখানে আমি অলস, বিলাসী ও নিষ্কর্মা ধনীদের বেশ চিনতে পারলাম। যদি তাদের ওপরেও একই ওষুধ প্রয়োগ করা যেত, তবে তাদের সব বদ খেয়াল আমি ঘুচিয়ে দিতে পারতাম।

প্রভু আবারও বললেন যে নারী ইয়াহুরা যদি কখনো কোন অচেনা নারী ইয়াহুকে তাদের মধ্যে পায় তো চার-পাঁচজন নারী মিলে তার চারপাশে জড়ো হয়ে তাকে খুঁটিয়ে দেখে, নিজেদের মধ্যে বকবক করে, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গীতে হাসে এবং তার সর্বাঙ্গ শোঁকে। কিছুক্ষণ এই রকম করার পর তারা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী করে চলে যায়।

এরও মধ্যে আমি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে ঢং, বদনাম করা ও কুৎসিৎ ব্যবহারের যে উদাহরণ আমাদের নারীদের মধ্যে দেখতে পাই, তার ছায়া দেখতে পেলাম। প্রভু যাকে অস্বাভাবিক ভাবছেন, তা যে আমাদের মধ্যে কত প্রচলিত, তা বলতে পারলাম না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইয়াহুদের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা—হুইনহুমদের মহান গুণাবলী—তাদের তরুণদের শিক্ষা ও অনুশীলন—তাদের সাধারণ বিধান-সভা।

আমার প্রভুর চেয়ে মনুষ্যচরিত্র অনেক ভাবে বোঝা আমার পক্ষে স্বভাবতঃই সহজ ছিল; কাজেই ইয়াহুদের চরিত্রের যে বর্ণনা তিনি দিলেন, তাকে আমার ও আমার দেশবাসীর সম্পর্কে প্রয়োগ করতে আমার বিশেষ অসুবিধে হ'ল না। আমি এও বুঝলাম যে নিজে লক্ষ্য করলে ইয়াহুদের সঙ্গে আমাদের আরো মিল খুঁজে পাব। সেইজন্য প্রায়ই আমি প্রভুকে অনুরোধ করতাম প্রতিবেশীদের ইয়াহুদের মধ্যে আমাকে যেতে দিতে; তিনি সর্বদাই সম্মতি দিতেন, কারণ তিনি জানতেন যে ওই জন্তু-গুলোকে এত ঘৃণা করি যে ওদের সংস্পর্শে এসে আমার স্বভাব নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

তিনি তাঁর একটি সৎ ও শক্তিশালী টাট্টু ভৃত্যকে আমার প্রহরী রূপে সঙ্গে দিতেন। তাকে ছাড়া ইয়াহুদের মধ্যে যাবার কথা আমি ভাবতেও পারতাম না। আমি এদেশে পদার্পণ করার পরেই তারা আমার যে হেনস্তা করেছিল, তার বর্ণনা তো আগেই দিয়েছি। পরেও তিন-চারবার প্রহরী ছাড়া একটু দূরে গিয়ে এদের হাতে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, তাদের মাঝে মাঝে মনে হ'ত যে আমিও প্রাণী হিসেবে তাদেরই স্বজাতি, কারণ আমার প্রহরীর সঙ্গে থাকাকালীন আমি প্রায়ই জামার আস্তিন গুটিয়ে এবং বোতাম খুলে নগ্ন হাত ও বুক দেখাতাম। সেই সময়ে ইয়াহুরা যতটা সম্ভব আমার কাছে ঘেঁষে এসে বাঁদরদের মতো আমার অঙ্গভঙ্গী অনুকরণ করত। কিন্ত সর্বদাই তাদের হাবেভাবে প্রকাশ পেত তীব্র ঘৃণা। ঠিক যেমন বন্য দাঁড়কাকদের মধ্যে টুপি-মোজা পরিহিত একটা দাঁড়কাক ঢুকে পড়লে চরম দুর্দশায় পড়ে।

ইয়াহুরা ছোটবেলা থেকেই শারীরিক ভাবে অত্যন্ত চটপটে হয়। একবার আমি

একটা তিন বছর বয়স্ক ছেলেকে ধরে নানা ভাবে আদর করে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেই ক্ষুদে পাজিটা এমন দুর্দান্ত ভাবে চেঁচিয়ে, খিমচে, কামড়ে ছটফট করতে লাগল, যে শেষ অবধি তাকে আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। ছেড়ে না দিলে বিপদে পড়তাম, কেননা একদল ইয়াহু তার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাটাকে নিরাপদ দেখে এবং আমার টাট্টু প্রহরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তারা আর কাছে এগোতে সাহস করল না। আমি ইতিমধ্যে অনুভব করেছিলাম যে বাচ্চাটার গা থেকে একটা প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছাড়ছিল, অনেকটা শেয়ালের গায়ের গন্ধের মতো. কিম্বা তার থেকেও বিশ্রী। তাছাড়া ক্ষুদে বদমায়েসটাকে যখন ধরে ছিলাম, তখন সে আমার জামা-কাপড়ের ওপরেই পাতলা হলুদ রঙের বিশ্রী দুর্গন্ধ মল ত্যাগ করে দিয়েছিল। ভাগ্যে কাছাকাছি একটা ঝর্ণা ছিল, তার জলে যতটা পারি কাপড়-চোপড় ধুয়ে আমি একটু ভদ্রস্থ হ'তে পেরে-ছিলাম। কিন্তু জামা-কাপড় ভালোভাবে না শুকোনো পর্যন্ত আমি প্রভুর সামনে যেতে সাহস করিনি।

আমি সব মিলিয়ে যা দেখলাম, তাতে মনে হ'ল যে ইয়াহুরা সামান্যতম কিছু শিক্ষা পাওয়ারও অযোগ্য এবং তাদের দিয়ে মোট বওয়ানো ছাড়া অন্য কিছু কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। তবুও কিন্তু আমার মতে, তাদের এই চরিত্রগত খুঁতের প্রধান উৎস তাদের বিকৃত, অস্থির মেজাজ। কারণ তারা যথেষ্ট ধূর্ত, বিদ্বেষপরায়ণ, বিশ্বাস-ঘাতক এবং প্রতিহিংসা পরায়ণ। শারীরিক দিক দিয়ে তারা বেশ শক্তিশালী ও কষ্ট-সহিষ্ণু, কিন্তু ভীতু হওয়ার ফলে বেহায়া, নিষ্ঠুর ও কোপন স্বভাব। বিশেষ করে লালচুলো ইয়াহুগুলো অন্যদের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী ও কর্মক্ষম. এবং একই সঙ্গে ঢের বেশি পরিমাণে নিষ্ঠুর ও পাজি।

কিছু ইয়াহুকে খাটানোর জন্য হুইনহমরা নিজেদের বাড়ির কাছেই রেখে দেয়। কিন্তু বাকি সব ইয়াহুকে তারা দূরে প্রান্তরে তাড়িয়ে দেয়। সেখানে তারা মাটি খুঁড়ে কন্দমূল তুলে খায়, ও সেই সঙ্গে মৃত পশু, ভাম ও লুহিমুহ্ (এক জাতের বন্য ইঁদুর) খুঁজে ভক্ষণ করে। প্রকৃতির কাছে তারা শিখেছে একটু উঁচু জমির গায়ে নখ দিয়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে সেখানে একা শুয়ে থাকতে। শুধু নারীদের গর্তগুলো বেশ বড়, যাতে দু'-তিনটে বাচ্চার জায়গা হয়।

বাল্যকাল থেকেই তারা ব্যাঙের মতো সাঁতার কাটতে পারে, এবং জলের নীচে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। নারীরা প্রায়ই মাছ ধরে নিয়ে যায় তাদের শিশুদের খাওয়াবার জন্য। এই সুযোগে আমি একটা অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনা করছি।

একদিন টাট্টু প্রহরীর সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম ; দিনটা ছিল প্রচণ্ড গরম। আমি তাকে অনুরোধ করলাম কাছাকাছি একটি নদীতে আমাকে স্নান করতে দেওয়ার জন্য। সে রাজি হওয়ায় আমি জামা-কাপড় খুলে সম্পূর্ণ ধীরে ধীরে জলে নামলাম। কাছেই একটা ইয়াহু দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করেছিল। সে হঠাৎ কেন যেন ক্ষেপে গিয়ে ছুটে এসে আমার থেকে গজ পাঁচেক দূরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি জীবনে এর আগে

কখনও এত সাংঘাতিক ভয় পাইনি। টাট্টু প্রহরী তখন একটু দূরে চরছিল। স্বভাবতই সে কোন বিপদাশঙ্কা করেনি। ইয়াহুটা এসে আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরতেই আমি যত জোরে পারি চিৎকার করে উঠলাম ; সঙ্গে সঙ্গে টাট্টু ছুটে আসতেই ইয়াহুটা আমাকে চরম অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দিয়ে অপর পারে লাফিয়ে উঠে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগল। আমি দ্রুত পোষাক পরে নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলাম।

ইয়াহুটা আমাকে জড়িয়ে ধরতেই আমি চিৎকার করে উঠলাম

এই ঘটনাটি প্রভু ও তাঁর পরিবারের কাছে যেন কৌতুকের কারণ হ'ল, তেমনি আমার মর্মপীড়া উদ্রেক করল। কারণ আমি আর অস্বীকার করতে পারলাম না যে আমিও বাস্তবিক একটি ইয়াহু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও চেহারা সর্বদিক দিয়েই। তা না হ'লে ওই ইয়াহুটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হ'ত না। তাছাড়া এর চুলও লাল ছিল না (যাতে তার নিষ্ঠুরতা একটু অস্বাভাবিক ব'লে মনে হতে পারে), বরং কুচকুচে কালো, এবং তার মুখশ্রীও অন্যদের মতো ভীষণ কুৎসিৎ নয় ; আমার মনে হয় তার বয়স খুব বেশি হবে না।

এই দেশে ইতিমধ্যে আমার তিন বছর থাকা হয়ে গেছে ; পাঠক নিশ্চয়ই আশা করছেন যে, অন্যান্য ভ্রমণকারীর মতো আমিও এদেশের অধিবাসীদের রীতি নীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেব ; সত্যি বলতে কি, এ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এই মহান হুইনহ্‌মরা প্রকৃতির বরে শুধুমাত্র সদ্‌গুণের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, এবং বিচারবুদ্ধিশীল জীবের মধ্যে পাপ কি ক'রে থাকতে পারে সে সম্বন্ধে তাদের

কোন ধারণাই নেই। সুতরাং তাদের মহান নীতি হ'ল, শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির চর্চা করা এবং শুধু তারই দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

তাদের মধ্যে বিচারবুদ্ধি আমাদের সমাজের মতো সমস্যাকীর্ণও নয়। কারণ আমরা মানুষেরা যে কোন প্রশ্নের সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা দু'দিক নিয়েই তর্ক করে থাকি। কিন্তু এদের মধ্যে যুক্তিসম্মত সব কিছু মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিত ভাব মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে; কারণ তা আবেগ বা নিজের কোন বিশেষ আগ্রহের প্রভাবে অস্পষ্ট বা বিকৃত হয়ে ওঠে না।

আমার মনে আছে যে 'মত' শব্দটির অর্থ আমার প্রভুকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি এও বেশ কষ্টে বুঝেছিলেন যে, মনুষ্য সমাজে যে কোন একটা ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক হতে পারে সেটা ঠিক কি ভুল। কারণ আমাদের বিচারবুদ্ধি কেবলমাত্র আমরা যেখানে নিশ্চিত, সেই বিষয়কে স্বীকার বা অস্বীকার করতে শিখিয়েছে মাত্র; এবং তা আমাদের জ্ঞানের অতীত হ'লেই আমরা তার কোনটাই আর করতে পারি না।

সেই কারণে মতবিরোধ, তর্কবিতর্ক, দর কাষাকষি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো হুঁই'নহ'মদের মধ্যে একেবারেই অজানা। একই কারণে, আমি যখন প্রভুর কাছে আমাদের দর্শনতত্ত্বের নানা দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে গেলাম, তিনি পুরো ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন; কেননা, তাঁর মতে যে প্রাণীর নিজের বিচারবুদ্ধি আছে, তার যে কোন জ্ঞানার্জনের জন্য অন্য লোকের অনুমানভিত্তিক জ্ঞানের ওপর নির্ভর করা মোটেই উচিত নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি সক্রেটিস ও প্লেটোর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন; আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিস সম্বন্ধে এটা একটা বিরাট সম্মান বলেই আমি বিশ্বাস করি।

বন্ধুত্ব ও পরোপকারিতা হুঁই'নহ'মদের মধ্যে সর্বপ্রধান দুটি গুণ। এ দুটি বিশেষ কয়েকটি বস্তুতেই সীমায়িত নয়, বরং সমগ্র জাতির মধ্যেই বিস্তৃত। দেশের দুর্গমতম অঞ্চল থেকে কোন আগন্তুক এলে সকল প্রতিবেশীই তাকে সমান মর্যাদার সঙ্গে আপ্যায়ন করে এবং সব বাড়িকেই সে নিজের বাড়ি বলে ভাবে। শিষ্টতা ও ভদ্রতা ওই দুটি গুণ অত্যন্ত উচ্চস্তরে তাদের মধ্যে বিরাজ করে, কিন্তু আড়ম্বর ও জাঁকজমক ব্যাপারটা তাদের সম্পূর্ণ অজানা।

তাদের বাচ্চাদের সম্পর্কে বিশেষ কোন আদর দেখানো লক্ষ্য করিনি কোনদিন। কিন্তু যে যত্ন নিয়ে বাচ্চাদের তারা শিক্ষা দেয়, তা সম্পূর্ণই বিচারবুদ্ধি প্রসূত। আমি এও দেখেছিলাম যে, নিজের বাচ্চাদের প্রতি আমার প্রভুর যে মমতা, প্রতিবেশীর বাচ্চাদের প্রতিও ঠিক তাই। তাদের মতে, প্রকৃতির শিক্ষা হ'ল পুরো জাতের প্রত্যেকটি প্রাণীকে ভালবাসা, এবং প্রাণীতে প্রাণীতে পার্থক্যের কারণ শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষের তারতম্য; যার বিচারবুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ, সে সমাজে তত সমাদৃত।

মা ঘোড়া যদি একটি ঘোড়া ও একটি ঘুড়ীর জন্ম দেয়, তাহ'লে সে আর সন্তান

ধারণ করে না (যদি না একটি বাচ্চা হঠাৎ মারা যায়)। যদি দুর্ঘটনায় কেউ সন্তানহারা হয়, এবং সেই মা যদি আর সন্তানের জন্ম দিতে অসমর্থ হয়, তাহ'লে অন্য কোন দম্পতি নিজেদের একটি সন্তান এদের দিয়ে দেয়, এবং নিজেরা আবার সন্তানের জন্ম দেয়।

এই সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, যাতে দেশে জনসংখ্যার আধিক্য না ঘটে এবং দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে। কিন্তু নীচ শ্রেণীর যে হুঁইঁনহ্ম্‌রা ভৃত্যের কাজ করে, তারা এই ব্যাপারটা অত কঠোরভাবে মেনে চলে না। এদের অনুমতি দেওয়া হয় তিনটি করে মেয়ের জনক হ'তে। এই সন্তানেরা পরে বড় হ'লে অভিজাত পরিবারে ভৃত্যের কাজ পায়।

তাদের বিবাহের বিষয়ে তারা খুব যত্ন নিয়ে এমন রঙ পছন্দ করে, যাতে সন্তানের মধ্যে কোন মিশ্রণ না ঘটে। পুরুষের ক্ষেত্রে শারীরিক শক্তি এবং নারীর ক্ষেত্রে শান্ত ভাবই প্রধান গুণ বলে বিবেচিত হয়। জাতের যাতে কোন অধঃপতন না হয়, সে-দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখা হয়। যেমন, যদি দেখা যায় একটি নারীর শক্তি বেশি, তাহ'লে তার জন্য একটি শান্ত বর বেছে দেওয়া হয়। তাদের মনোজগতে প্রাক্‌-বিবাহ মেলামেশা, উপহার, দেনাপাওনা ইত্যাদির স্থান নেই। স্বভাবতঃই তাদের ভাষাতেও এই ব্যাপারগুলি বোঝাবার মতো কোন শব্দ নেই।

এক জোড়া তরুণ-তরুণী পরস্পরকে বিয়ে করে ঘর করে, কারণ তাদের মাতাপিতা ও বন্ধুরা সেই রকম ঠিক করেছে। এ রকমটি তারা সমাজে হ'তে দেখে, এবং এটিকে বিচারবুদ্ধিশীল জীবের পক্ষে প্রয়োজনীয় দিক বলেই ভেবে থাকে। বিবাহে কোন অনাচার বা ব্যভিচার কখনও কোথাও ঘটে না। বিবাহিত দম্পতি সারা জীবন কাটায় এক প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও ঔদার্যের মধ্যে, যে মনোভাব তারা স্বজাতির অন্য সকলকেও একই মাত্রায় দেখিয়ে থাকে। তাদের ঈর্ষা, বিবাদ, অসন্তোষ বা ভালবাসার আধিক্য কোনটাই নেই।

সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের পদ্ধতি অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং আমাদেরও তার অনুকরণ করা উচিত। আঠার বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত, কয়েকটি বিশেষ দিন ছাড়া তাদের কাউকে এক দানাও ওট খেতে দেওয়া হয় না। দুধও খুব কম দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে তারা সকালে ও বিকেলে দু'ঘণ্টা করে তাদের মাতা পিতার সামনে ঘাসের ওপর চরে বেড়ায়। কিন্তু ভৃত্যদের এর অর্ধেকের বেশি সময় দেওয়া হয় না। এবং বেশ কিছু পরিমাণ ঘাস বাড়িতে নিয়ে আসা হয়, যা তারা সুবিধাজনক সময়ে বা কাজের অবসরে নিশ্চিন্তে খেতে পারবে।

পরিশ্রম, অনুশীলন, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির শিক্ষাও ছেলে-মেয়ে উভয়কেই সাফল্যের সঙ্গে দেওয়া হয়। আমরা যে ছেলেদের থেকে মেয়েদের পৃথক শিক্ষা দিই, (শুধুমাত্র গৃহপরিচালনার কয়েকটি বিষয় ছাড়া), এ ব্যাপারটা আমার প্রভুর কাছে এক সাংঘাতিক অবিচার বলে মনে হ'ল। তিনি বললেন যে এর ফলে আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে শেখে না। এরকম কিছু

নিষ্কর্মা জীবের হাতে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেড়ে দেওয়া পাশবিকতারই নামান্তর।

হুঁইহ্নহ্মরা তাদের বালক—বালিকাদের খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বা কঠিন পাথুরে জমির ওপর দিয়ে দৌড় করিয়ে তাদের শক্তিশালী, দ্রুতগতি-সম্পন্ন ও কষ্টসহিষ্ণু করে তোলে। যখন তাদের সারা গা ঘামে ভিজে যায়, তখন তাদের আদেশ দেওয়া হয় নদী বা পুকুরের জলে মাথা নীচু করে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বছরে চারবার কয়েকটি করে অঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা সমবেত হয়ে দৌড়, লাফ এবং অন্যান্য শক্তি ও ক্ষিপ্রতায় তাদের নৈপুণ্য দেখায়; জয়ীকে উপহার দেওয়া হয় তার প্রশস্তিতে রচিত একটি গান। এই উৎসবের সময় ভৃত্যেরা একদল ইয়াহুর ঘাড়ে খড়, ওট ও দুধের জালা বোঝাই করে মাঠে নিয়ে যায়, যাতে হুঁইহ্নহ্মরা ক্লান্তি বিনোদন করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গেই ভৃত্যেরা ফের ইয়াহুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, পাছে তারা কিছু গোলমাল বাধায়।

প্রতি চার বছর অন্তর, সূর্যের দক্ষিণায়ণের সময়, সারা দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভা আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এক জায়গায় মিলিত হয়, এবং পাঁচ-ছয় দিন দেশের নানা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চালায়। তারা প্রতিটি জেলা ও অঞ্চল সম্পর্কে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নেয়; খড়, ওটের পরিমাণে ঘাটতি বা গরু ও ইয়াহুর সংখ্যায় তাদের কমতি আছে কিনা জেনে নেওয়া হয়।

যদি কোথাও কোন অভাবের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় (যা অবশ্য অতি বিরল), তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সকলে একমত হয়ে প্রত্যেকের সমপরিমাণে দান দিয়ে সে অভাব মিটিয়ে দেয়। একই ভাবে এই সভায় সন্তান নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন হুঁইহ্নহ্মের দুটো পুরুষ বাচ্চা থাকে, সে তাহ'লে একটাকে বদলে নেয় এমন একজনের সঙ্গে, যার দুটি বাচ্চাই মেয়ে। এবং যদি দুর্ঘটনায় কোন সন্তান মারা যায়, এবং মার যদি আর সন্তান ধারণের ক্ষমতা না থাকে, তাহ'লে সেই জেলায় কোন্ পরিবারের ওপর আর একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে এই ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাও ঠিক করা হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

হুঁইনহ্‌মদের সাধারণ বিধানসভায় একটি বিরাট বিতর্ক ও তার শেষ নিষ্পত্তি—হুঁইনহ্‌মদের পাণ্ডিত্য—তাদের বাড়ি তৈরী—তাদের কবর দেওয়ার পদ্ধতি—তাদের ভাষার খুঁত।

আমি হুঁইনহ্‌মদের দেশ থেকে চলে আসার তিন মাস আগে তাদের একটি সাধারণ সভা মিলিত হয়েছিল এবং আমার প্রভু তাতে আমাদের অঞ্চলের প্রতিনিধি রূপে যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় ফের শুরু হ'ল তাদের এক বহু পুরোনো বিতর্ক। বস্তুতঃ তাদের দেশে এই একটি মাত্র ব্যাপারেই তর্কবিতর্ক হ'ত; আমার প্রভু এই বিতর্কের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাকে দিয়েছিলেন।

যে প্রশ্নটির উপর বিতর্ক হয়েছিল তা হ'ল, ইয়াহুদের এই পৃথিবীর বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হবে কিনা। নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পক্ষপাতী এক সদস্য অত্যন্ত জোরদার বেশ কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে প্রকৃতি যত জীব সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে ইয়াহুরা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বেশি নোংরা, বিকৃত দর্শন এবং হট্টগোল—সৃষ্টিকারী। এই জন্য এরা কিছুতেই পোষ মানে না, তাদের স্বভাব অত্যন্ত ধূর্ত ও পাজি এবং বিদ্বেষপরায়ণ। তারা গোপনে হুঁইনহ্‌মদের গরুর বাঁট থেকে দুধ চুষে খেয়ে নেয়। তাদের বেড়ালগুলোকে মেরে খায় এবং তাদের ওট ও ঘাস পাহারায় যদি একটু অসতর্কতা দেখা যায়, তবে সেই সুযোগে সেগুলোকে মাড়িয়ে পিষে শেষ করে দেয়। এছাড়াও আরো বহু রকম বদমায়েসির দ্বারা ইয়াহুরা হুঁইনহ্‌ম সমাজের ক্ষতি করে।

তিনি ওই দেশের একটি প্রচলিত উপকথার উল্লেখ করলেন। এই উপকথায় জানা যায় যে এদেশে ইয়াহুরা চিরকাল ছিল না। বহু যুগ আগে দুটো ইয়াহু কোত্থেকে একটা পাহাড়ের ওপর আবির্ভূত হয়। তাদের সৃষ্টি ঠিক কি করে হয়েছিল তা কেউই সঠিক বলতে পারে না; কেউ মনে করে পচা পাঁক ও কাদার ওপরে সূর্যের প্রচণ্ড তাপের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাদের জন্ম হয়েছিল। কারোর বা ধারণা, সমুদ্রের নোংরা

ময়লা ও তলানি কাদার সংমিশ্রণই তাদের জনক। এই দুটো ইয়াহু থেকেই বংশবৃদ্ধি হতে থাকে, এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে সমগ্র হুঁইঁনহ্ঁম জাতি বিপন্ন হয়ে পড়ে।

শেষ অবধি এই মহাপাপকে বিদায় করতে এক বিরাট হুঁইঁনহ্ঁম বাহিনী দেশব্যাপী শিকারে বেরোয় এবং বহু চেষ্টার পর ইয়াহুর দলকে বন্দী করতে সক্ষম হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াহুগুলোকে নিধন করে তারপর প্রত্যেক হুঁইঁনহ্ঁম দুটি ক'রে বাচ্চা ইয়াহুকে খোঁয়াড়ে পুরে রেখে দেয় এবং এমন বর্বর একটি জানোয়ারকে যতটা পোষ মানানো সম্ভব, ততখানি পোষ মানিয়ে তাদের গাড়ি টানা ও মোট বওয়ার কাজে লাগানো হয়।

এই উপকথার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ সত্য আছে ব'লে মনে হয়, এবং এই জন্তুগুলো নিঃসন্দেহে 'ঈলহ্ঁহিঁয়ামশি' (অর্থাৎ দেশের আদিবাসী) নয়। কারণ হুঁইঁনহ্ঁমরা সহ ওদেশের সকল প্রাণীই ইয়াহুদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে। অবশ্য তাদের বদমায়েস স্বভাব এই ঘৃণা উদ্রেক করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণেই দায়ী ; কিন্তু তা এত তীব্র হয়ে উঠত না কখনোই, যদি তারা আদিবাসী হ'ত, কারণ তাহ'লে তারা বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

প্রতিনিধিটি আরো বললেন যে, ইয়াহুদের কাজে লাগাতে গিয়ে অধিবাসীরা অত্যন্ত অবিবেচকের মতো গাধাদের বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি, যদিও প্রাণী হিসেবে গাধা অনেক শান্ত, সহজে পোষ মানে, সুশৃংখল এবং তাকে রাখাও অনেক সহজ ও নিরাপদ। গাধাও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে পারে, যদিও তারা হুঁইঁনহ্ঁমদের মতো শারীরিক দিক দিয়ে এতটা ক্ষিপ্র নয়। তাদের ডাক অবশ্য মোটেই শ্রুতিমধুর নয়, কিন্তু ইয়াহুদের বীভৎস চিৎকারের চাইতে ঢের ভাল।

আরো অনেকে নানা ভাবে এই একই কথা বললেন। এই সময়ে আমার প্রভু উঠে দাঁড়িয়ে সভার কাছে প্রস্তাব দিলেন যে এই ব্যাপারে তিনি সবিস্তারে কিছু বলতে চান (এই রকম করার ধারণাটা তিনি আমার কাছ থেকেই জেনেছিলেন)। তাঁর আগে মাননীয় সদস্য যে উপকথাটির উল্লেখ করেছেন, সেটি তিনি সমর্থন করলেন। এর পরে তিনি জোর দিয়ে বললেন, যে দুটি ইয়াহুকে প্রথম এদেশে দেখা গিয়েছিল, তারা সমুদ্রে ভেসে এখানে এসেছিল। ডাঙায় এসে সঙ্গী বিহীন অবস্থায় তারা পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকে এবং ক্রমে দীর্ঘদিন সভ্য জীবের সংস্পর্শে না এসে তাদের বংশধরেরা অধঃপতিত হ'তে হ'তে এমন বর্বর এক জাতে পরিণত হয়, যা সেই প্রথম দু'জন ইয়াহু কল্পনাও করতে পারত না। তাঁর এই মত প্রচারের কারণ হ'ল, তাঁর অধীনে একটি চমকপ্রদ ইয়াহু আছে (অর্থাৎ আমি), যার কথা অনেকেই শুনেছে, এবং অনেকে চোখে দেখেওছে।

তারপর প্রভু বর্ণনা দিতে লাগলেন, প্রথম কি করে তিনি আমাকে পেয়েছিলেন। আমার শরীর কেমন অন্য প্রাণীর চামড়া ও লোম থেকে তৈরী এক কৃত্রিম আবরণে ঢাকা। আমি আমার নিজের এক ভাষায় কথা বলি এবং হুঁইঁনহ্ঁমদের ভাষা আমি

সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে ফেলেছি। যে দুর্ঘটনার ফলে আমি এখানে এসেছি, তা আমি তাঁর কাছে বর্ণনা করেছি। যখন আমাকে তিনি কৃত্রিম আবরণ ছাড়া দেখেছেন, তখন লক্ষ্য করেছেন যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমি একটি নিখুঁত ইয়াহু, শুধু রং আরো ফর্সা, গায়ে লোম অনেক কম এবং থাবা ও নখর অনেক ছোট।

তিনি আরো বললেন যে, কেমন করে আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে আমার নিজের ও অন্যান্য দেশে ইয়াহুরাই বিচার বুদ্ধিশীল, শাসক জাতি এবং হুঁইন্হ্মরা তাদের ভৃত্য। তিনি এও বলেন যে ইয়াহুদের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই তিনি আমার মধ্যে উপস্থিত দেখেছেন, শুধু সেগুলির ওপর একটু বোধবুদ্ধির প্রলেপ মাখানো। কিন্তু এই বোধবুদ্ধি হুঁইন্হ্মদের বিচারবুদ্ধির তুলনায় ততোটাই নিম্ন জাতের, যতোটা আমার তুলনায় এদেশের ইয়াহুরা।

তিনি সভাকে জানালেন যে, কথাবার্তায় অনেক জিনিষের মধ্যে আমি তাঁকে আমাদের দেশের একটি প্রথার কথা বলেছি। সেটি হ'ল, আমাদের হুইন্হ্মদের শান্ত ও সহজে পোষ মানানোর জন্য আমরা তাদের ছোটবেলায় একটি সহজ ও নিরাপদ শল্য চিকিৎসার দ্বারা তাদের প্রজনন ক্ষমতা রোধ করে দিই। এই চিকিৎসাটি এখানকার তরুণ ইয়াহুদের ওপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাতে তারা আরও পরিশ্রমী হবে তো বটেই, উপরন্তু কালক্রমে তাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে তারা এদেশ থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে।

তিনি সভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, বিদেশী ইয়াহুটা পশু হলেও, তার কাছ থেকে এই বিদ্যাটা শিখে নিতে দোষ নেই, কারণ তাঁরা তো পিঁপড়েকে দেখে পরিশ্রম করতে এবং সোয়ালোকে দেখে বাড়ি বানাতে শিখেছেন। ইতিমধ্যে হুঁইন্হ্মদের উচিত গাধাদের বংশবৃদ্ধি ঘটানো, কারণ সর্বদিক দিয়েই তারা পশু হিসেবে অনেক আদরণীয়। তাদের দিয়ে কাজ করানোর আর একটা সুবিধে হ'ল যে তারা পাঁচ বছর বয়সেই কাজের উপযোগী হয়ে ওঠে, যেখানে একটা ইয়াহুকে দিয়ে বারো বছর বয়সের আগে কাজ বিশেষ পাওয়া যায় না।

সাধারণ বিধানসভায় যা কিছু হয়েছিল, তার এইটুকুই আমার প্রভু তখনকার মতো আমাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমার বিষয়ে একটা কথা তিনি চেপে গিয়েছিলেন, এবং তার থেকেই আমার ওদেশে এর পববর্তী কালে সমস্ত দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়েছিল। পাঠককে যথাস্থানে আমি সে কথা বলব।

হুঁইন্হ্মদের কোনো অক্ষর বা লিপি নেই, এবং এর ফলে তাদের সমস্ত জ্ঞান পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত। তাদের ইতিহাস অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত এবং তাদের স্মৃতিভাণ্ডারকে একটুও ভারাক্রান্ত করে না, কারণ তাদের দেশে খুব কমই বড় মাপের ঘটনা ঘটেছে; কেননা তারা অত্যন্ত একতা বদ্ধ জাতি, সম্পূর্ণরূপে বিচারবুদ্ধি দ্বারা চালিত এবং অন্যান্য কোন দেশের সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। তাদের শরীরে কোন রোগও নেই, যার জন্য তাদের ডাক্তারেরও প্রয়োজন হয় না। অবশ্য

দুর্ঘটনার ফলে হঠাৎ ঘটে যাওয়া ক্ষত, আঘাত বা ভাঙাচোরার জন্য তাদের বন্য লতাগুল্ম থেকে তৈরী অতি চমৎকার কিছু ওষুধ আছে।

তারা সূর্য ও চন্দ্রের গতি দেখে বছর হিসেব করে, কিন্তু সপ্তাহে বছরকে ভাগ করে না। সূর্য চন্দ্রের গতিবিধি সম্পর্কে তারা বেশ ভালই বোঝে এবং গ্রহণ কেন হয় তাও জানে। তাদের জোতির্বিদ্যার চরম উন্নতি এইটুকু পর্যন্তই হয়েছে।

কবিতা রচনায় তারা অত্যুৎকৃষ্ট। তাদের উপমা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং ক্ষুদ্র ব্যাপারেও চেতনার প্রাশ অননুকরণীয়। তাদের কবিতায় এই গুণগুলো খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। কবিতার বিষয় বস্তু সাধারণতঃ বন্ধুত্ব ও পরোপকারের মহিমা, অথবা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্রশস্তি। তাদের বাড়িগুলো খুবই সাদাসিধে এবং প্রায় আদিম, কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম থেকে তাদের খুব ভালভাবেই সেগুলো রক্ষা করে।

এদেশে এক রকম গাছ আছে, যেগুলোর চল্লিশ বছর বয়স হলেই শিকড় আলাদা হয়ে যায় এবং প্রথম ঝড়েই ভূপাতিত হয়। এই গাছগুলো একদম খাড়া বেড়ে ওঠে; এর গুঁড়িগুলোকে পাথরের ঘায়ে (হুঁইঁনহঁমরা লোহার ব্যবহার জানে না) ছুঁচলো করে দশ ইঞ্চি করে তফাতে মাটিতে একটা দিক পুঁতে দিয়ে, তারপর সেগুলোর মধ্যে হুঁইঁনহঁমরা ওটের খড় বা কঞ্চি বুনে দেয়। ছাদ ও দরজাও এই একই ভাবে তৈরী করা হয়।

হুঁইঁনহঁমরা তাদের সামনের পায়ের খুরের মাঝখানে যে ফাঁকা অংশটা আছে, সেটার জোরে খুরটাকে আমাদের হাতের আঙুলের মতো ব্যবহার করে, এবং তারা এতো নিপুণ যে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। প্রভুর পরিবারের একটি ঘুড়ীকে আমি ছুঁচে সুতো পরাতে পর্যন্ত নিজের চোখে দেখেছিলাম (ছুঁচটা আমারই দেওয়া)। তারা গরুর দুধ দোয়া, ফসল কাটা এবং হাত দিয়ে যা কিছু কাজ করা সম্ভব, সবই ওই জোড়া খুর দিয়ে করে। কুড়ুল বা হাতুড়ির জায়গায় তাদের এক রকম শক্ত ও ধারালো পাথর আছে, যেগুলো বড় পাথরের ওপর ঘষে ঘষে তারা নানা রকম কাজের
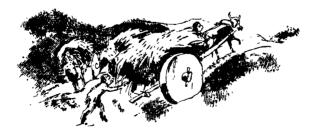
ইয়াহুরা আঁটি বেঁধে শস্য ঘরে নিয়ে যায়

যন্ত্র তৈরী করে। এই সব জিনিষ দিয়ে তারা খড় ও ওট কাটে, যা তাদের মাঠে মাঠে স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায়। ইয়াহুরা আঁটি বেঁধে শস্য ঘরে নিয়ে যায় এবং

ভৃত্য ঘোড়াটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে শস্য থেকে দানা বার করে গোলায় ভর্তি রাখে। তারা একরকম আদিম জাতীয় মাটির ও কাঠের পাত্র এবং জালাও তৈরী করতে পারে।

যদি তারা দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলতে পারে, তাহ'লে কেবলমাত্র বুড়ো হ'লেই তারা মরে, এবং তখন তাদের সকলের চোখের আড়ালে একটা কোন জায়গায় কবর দেওয়া হয়। তার মৃত্যুতে বন্ধু বা আত্মীয়রা আনন্দ বা দুঃখ কিছুই প্রকাশ করে না। মুমূর্ষু ঘোড়াও পৃথিবী ছেড়ে যেতে হচ্ছে ব'লে বিন্দুমাত্র শোকসন্তপ্ত হয় না, বরং মনে হয় যেন সে এক প্রতিবেশীর বাড়ি বেড়ানো শেষ করে ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

আমার মনে আছে, একবার আমার প্রভু তাঁর এক বন্ধু ও তাঁর পরিবারকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন বাড়িতে আসবার জন্য। নির্দিষ্ট দিনে বন্ধুপত্নী ও তাঁর দুই ছেলেমেয়ে অনেক দেরী করে এলেন। দেরীর জন্য তিনি দুটি কৈফিয়ৎ দিলেন। প্রথমটি হ'ল তাঁর স্বামী সেদিন সকালেই 'ল্হুঁওয়্হ' হয়েছেন। তাদের ভাষায় শব্দটি অত্যন্ত গভীর অর্থবাহী, এবং ইংরেজীতে একে অনুবাদ করা মুশকিল ; এর তাৎপর্য হ'ল, 'প্রথম মাতার আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া।' তাড়াতাড়ি না আসার দ্বিতীয় কৈফিয়ৎটি ছিল, সুবিধাজনক জায়গার সন্ধান, যেখানে তাঁর স্বামীকে কবর দেওয়া চলে, তার পেছনে তাঁর বহু সময় চলে গেছে। আমি সেদিন দেখেছিলাম যে, সেই ঘুড়ীটি অন্যান্যদের মতোই প্রফুল্ল আচরণ করলেন। এর প্রায় তিন মাস বাদে তিনিও মারা যান।

হুঁই"নহ"মরা সাধারণতঃ সত্তর-প'চাত্তর বছর অবধি বাঁচে। আশি বছর বয়স হওয়ার ঘটনা বিরল। তাদের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে তারা সর্বাঙ্গে জরার আবির্ভাব অনুভব করে, কিন্তু কোন বেদনা বা যন্ত্রণা অনুভব করে না। এই সময়ে তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রা তাদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করে, কারণ তারা আর অভ্যাসগত স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে বাইরে ঘুরতে পারে না। যাই হোক, মৃত্যুর দিন দশেক আগে (তাদের এ ব্যাপারে কখনো হিসেবের ভুল হয় না) তারা নিকটস্থ প্রতিবেশীদের সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে সৌজন্যের প্রতিদান দেয়।

এই সময় তারা ইয়াহুদের টেনে নিয়ে যাওয়া স্লেজ জাতীয় একটি গাড়িতে করে যাতায়াত করে ; বৃদ্ধ হ'লে বা দুর্ঘটনায় খোঁড়া হয়ে গেলে তারা এই গাড়িটি ব্যবহার করে। এই শেষ সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের সময় মুমূর্ষু হুঁই"নহ"ম তার বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছে গম্ভীর ভঙ্গীতে বিদায় প্রার্থনা করে, যেন সে দূর দুর্গম কোন স্থানে তার জীবনের শেষ ক'টি দিন কাটাবে ব'লে চলে যাচ্ছে।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করি ঃ হুঁই"নহ"মদের ভাষায় 'পাপ' শব্দটা নেই। মন্দ কিছু বোঝাতে হ'লে তারা ইয়াহুদের কোন দোষ বা বিকৃতির উপমা দেয়। সেইজন্য, কোন ভৃত্যের ভুলত্রুটি, কোন শিশুর কাজের খুঁত, যে পাথরে পা কেটে যায়, টানা ও দীর্ঘস্থায়ী বিশ্রী আবহাওয়া, ইত্যাদি সবকিছু বোঝাতেই তারা শেষে

ইয়াহ্ন শব্দটা যোগ করে। যেমন, 'হ্‌ইহ্ম্‌ ইয়াহ্ন', 'হোয়াহল্ম্‌ ইয়াহ্ন', ইঁন্হম্‌-
ডুইহল্‌মা ইয়াহ্ন', এবং বিশ্রীভাবে তৈরী বাড়ি বোঝাতে 'ই্হল্ম্‌হ্নমরোহল্‌নৌ
ইয়াহ্ন'।

এই চমৎকার জাতিটির জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার ও সদ্‌গুণ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমি বলে যেতে পারতাম। তবে কিছুদিনের মধ্যেই কেবলমাত্র এই বিষয়ের ওপরেই একটা বই প্রকাশ করব ব'লে এখানে একটু ইঙ্গিত দিলাম। ইতিমধ্যে আমার নিজস্ব বিপর্যয় সম্বন্ধে কিছুটা বর্ণনা দিচ্ছি।

দশম পরিচ্ছেদ

হুঁইঁনহঁমদের মধ্যে লেখকের সুখী অবস্থা—তাদের সংগে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর প্রভূত উন্নতি—তাঁদের কথোপকথন—লেখককে তাঁর প্রভু কর্তৃক দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আদেশ দান—তিনি দুঃখে অচেতন হলেন, কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণ করেন—তিনি পরিকল্পনা ক'রে কোন মতে একটি নৌকো তৈরী করেন একটি ভৃত্যের সাহায্যে, এবং সমুদ্রে ভেসে পড়েন।

আমি প্রাণের আশা মিটিয়ে আমার নিজের সংস্থান তৈরী করে নিয়েছিলাম। আমার প্রভু তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ছ'গজ দূরে তাঁদের মতোই একটি ঘর আমার জন্য তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। ঘরের মেঝে ও দেওয়ালে আমি মাটির পলস্তরা লাগিয়ে নিয়েছিলাম এবং মেঝেয় নিজেরই তৈরী ঘাসের মাদুর বিছিয়ে নিয়েছিলাম। এক ধরণের বন্য পাট থেকে তোষকের টিকিন তৈরী ক'রে নানা রকম পাখীর পালকে ভর্তি করে নিয়েছিলাম। এই পাখীগুলোক আমি ইয়াহুদের চুল থেকে তৈরী জালের ফাঁদ পেতে ধরেছিলাম। খাবার হিসেবেও পাখীগুলো চমৎকার ছিল।

এছাড়া আমার ছুরি দিয়ে দুটো চেয়ার তৈরী করেছিলাম। এতে বেশি খাটুনির কাজগুলো টাট্টু ভৃত্যটিই করেছিল। আমার পোশাকগুলা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গিয়েছিল। আমি আরো কিছু পোশাক তৈরী করে নিলাম খরগোসের চামড়া এবং সুন্দর নরম লোমে ঢাকা 'নুহুনোহ্' নামে আর একটি ছোট জন্তুর চামড়া দিয়ে। এই লোম দিয়ে কাজ চালানোর মতো একজোড়া মোজাও বুনে নিয়েছিলাম। জুতোর সোল ক্ষয়ে গেলে সেখানে আমি কাঠের চিলতে লাগিয়ে নিলাম। যখন জুতোর ওপরের চামড়া ছিঁড়ে গেল, তখন রোদে শুকনো ইয়াহুদের চামড়া দিয়ে তা সারিয়ে নিলাম। ফাঁপা গাছ থেকে মাঝে মাঝে আমি মধু সংগ্রহ ক'রে রুটি দিয়ে বা জলে মিশিয়ে খেতাম।

দুটি সত্যের মর্যাদা আমি নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। 'প্রকৃতি

অতি সহজেই তুষ্ট হয়' এবং 'প্রয়োজনই আবিষ্কারের জন্মদাতা।' আমার শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কোন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা বা কোন শত্রুর আঘাতের ভয় আমার ছিল না। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা তার তোষামুদে কারও কাছ থেকে কিছু আদায়ের জন্য আমাকে ঘুষ দেওয়া, খোসামোদ করা, বা দালালি করার কোন দরকার আমার হ'ত না। প্রবঞ্চনা বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ তৈরী করার দরকার ছিল না। এখানে আমার শরীর নষ্ট করার জন্য কোন ডাক্তারও নেই, সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য কোন উকিলও নেই। কোন চর নেই যে আমার প্রতিটি কথা ও কাজ লক্ষ্য করবে, অথবা কারো ভাড়া খেটে আমার বিরুদ্ধে জাল সাক্ষী দেবে।

এই সুন্দর দেশে কোনও পকেটমার, ডাকাত, চোর, উকিল, ভাঁড়, জুয়াড়ি, দালাল, রাজনীতিক, খুনী, লম্পট, বাজে-বকা লোক, তর্কবাজ কেউই নেই। কোন নেতা, দল বা দলবাজি নেই। পাপ কাজে উৎসাহ দেবারও কেউ নেই। নেই কোন জেল, কুঠার, চাবুক বা অত্যাচারের যন্ত্র। লোক ঠকানো দোকানদার বা মন্ত্রীও নেই। কোন গর্বান্ধতা বা অহংকার নেই। কোন ফুলবাবু গুণ্ডা, মাতাল বা অসতী নেই। কোন নির্লজ্জ, খরচে বা চেঁচানো স্ত্রী নেই। কোন বোকা, গর্বিত পণ্ডিত নেই। নেই ঝগড়াটে, গোলমেলে, আত্মপ্রবঞ্চক, শূন্যমস্তিষ্ক, গাধার মতো চেঁচানো সঙ্গীবৃন্দ। রাস্তার নোঙরা থেকে উঠে আসা, পাপে লিপ্ত বদমায়েসরা নেই। কোন লাট, জজসায়েব বা নাচের মাষ্টারও নেই।

বহু হুঁইঁনহ্ঁম আমার প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে এলে আমার সঙ্গেও সাক্ষাৎ করত। আমার প্রভু সৌজন্য বশতঃ আমাকে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা ও আলোচনা শুনতে দিতেন। তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা মাঝে মাঝেই আমাকে নানা প্রশ্ন করতেন ও উত্তর পেতেন। কখনো প্রভুর সঙ্গে তাঁর পরিচিত বন্ধুদের বাড়ি যাওয়ার সম্মানও আমার লাভ হ'ত। আমি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া এমনিতে কোন কথা বলতাম না। তাও করতে আমার অন্তরে দুঃখ অনুভব করতাম, কারণ তাতে আমার আত্মোন্নতির সময় নষ্ট হ'ত। তবুও কিন্তু আমার অসীম আনন্দ হ'ত এই রকম কথোপকথনে শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতে পেরে, কারণ প্রয়োজনীয় বিষয় অল্প কথায় আলোচনা করা ছাড়া কোন বাজে বকুনি কোনদিন শুনতে হ'ত না। কোন নকল আপ্যায়নের ভাব না দেখিয়ে সর্বোত্তম শিষ্টতা উভয় পক্ষের দ্বারাই রক্ষিত হত। কেউ এমন কথা বলত না যাতে তার নিজের ও উপস্থিত সকলের সন্তোষ লাভ না হয়; এবং কথোপকথনে কোন অনাবশ্যক বাধাপ্রদান, মেজাজ গরম করা বা মতবিরোধ ইত্যাদিও হ'ত না।

তাদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে, মাঝে মাঝে স্বল্পকালীন নীরবতা কথোপকথনের মান উন্নত করে। এই ব্যাপারটা আমার মতে খুবই সত্যি; কারণ কথাবার্তার মাঝখানে এই সংক্ষিপ্ত বিরতির সময় মাথায় নতুন সব ধারণার জন্ম হয় এবং তার প্রভাবে কথাবার্তা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাদের আলোচনার বিষয়

সাধারণতঃ বন্ধুত্ব ও পরোপকার ; শৃংখলা ও সমাজনীতি ; কখনো বা প্রকৃতির দৃশ্যমান কাজকর্ম, অথবা প্রাচীন ঐতিহ্য ; সদ্‌গুণের সীমা ও প্রকৃতি ; বিচারবুদ্ধির অভ্রান্ত নিয়মাবলী ; অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা নিয়ে আলোচনা, যা হয়তো আগামী সাধারণ সভায় বিবেচনা করা হবে। এবং প্রায়শই তাঁদের বিষয় হ'ত কবিতা ও তার বিবিধ চমৎকারিত্ব।

এখানে কোন অহংকার না করেই বলতে পারি যে, আমার উপস্থিতি প্রায়ই তাঁদের আলোচনার রসদ জোগাত, কারণ তাহলেই আমার প্রভু আমার দেশ ও তার ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বন্ধুদের অবহিত করতেন, এবং তখন তাঁরা সকলে মিলে যে আলোচনা শুরু কবতেন, তা অবশ্য মনুষ্য জাতির পক্ষে বিশেষ সুখপ্রদ নয়। সেইজন্য তাঁদের কথার পুনরাবৃত্তি আমি করব না।

শুধু একটা কথা বলা উচিত, যে আমার প্রভু অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবে আমার চেয়ে ইয়াহুদের স্বভাব অনেক ভাল বুঝতেন। তিনি আমাদের প্রতিটি পাপ ও দোষ নিয়ে কথা বলতেন এবং অনেকগুলো দোষ এমন খুঁজে বার করেছিলেন, যেগুলোর কথা আমি তাঁর কাছে উল্লেখ করিনি। তিনি শুধু ধরে নিতেন যে তাঁর দেশের একটা ইয়াহু কিছুটা বিচারশক্তি লাভ করলে কি ধরণের কাজ করতে পারে। এবং তার থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পেঁাছেছিলেন যে এরকম একটি প্রাণী অত্যন্ত নোঙরা-প্রকৃতি অসুখী।

আমি সোজাসুজি স্বীকার করছি যে, আমার বর্তমানে যেটুকু সত্য জ্ঞান আছে, তা সবই আমি লাভ করেছি আমার প্রভুর বক্তৃতা ও তাঁর বন্ধুদের আলোচনা শুনে। ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানীগুণীর সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার থেকে উপরোক্ত আলোচনা শোনার অধিকার পেলে আমি অনেক বেশি গর্বিত বোধ করব।

ওদেশের অধিবাসীদের শক্তি, শান্ত স্বভাব ও গতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল, এবং এরকম বিনয়ী ও শিষ্টস্বভাব ব্যক্তিদের মধ্যে এত সব মহৎ গুণের সমাবেশ আমার মনের মধ্যে এক বিরাট বোধের জন্ম দিয়েছে।

সত্যি বলতে কি, গোড়ার দিকে তাদের প্রতি ইয়াহুদের মতো স্বাভাবিক একটি প্রচণ্ড বিস্ময়বোধ আমার মধ্যে বেড়ে শেষ অবধি একটি সশ্রদ্ধ ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতায় পরিণত হয়েছিল, কারণ তাঁরা যে আমাকে আমার স্বজাতিভুক্ত অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছেন এজন্য আমার নিজেকে ধন্য মনে হ'ত।

যখন আমি আমার পরিবার, বন্ধু বান্ধব, স্বদেশবাসী, তথা সমগ্র মনুষ্য জাতির কথা চিন্তা করতাম, তখন তারা ঠিক যা, সেই ভাবেই তাদের আমি দেখতাম। চেহারা ও মেজাজে ইয়াহু, হয়তো একটু বেশি সভ্য এবং কথা বলতে সক্ষম। কিন্তু এদেশে তাদের জাতভাইদের মধ্যে প্রকৃতির দেওয়া যে পাপগুলি পরিলক্ষিত হয়, এবং তাদের মধ্যেও আছে, সেগুলিরই পরিবর্ধন ছাড়া আর কোনও কাজে বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করেনি কখনো।

কোন সরোবর বা পুকুরের জলে যখন আমি নিজের প্রতিবিম্ব দেখতাম, তখন

নিজের প্রতি এক ভয়াবহ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় আমি মুখ ফিরিয়ে নিতাম। বরং একটা সাধারণ ইয়াহুকে আমি নিজের চেয়ে বেশি সহ্য করতে পারতাম। হুঁইঁনহ্ঁমদের সঙ্গে সর্বদা কথা বলতে এবং তাদের প্রতি সানন্দে দৃষ্টিক্ষেপ করতে করতে, আমি তাদের ভাবভঙ্গী ও হাঁটা—চলা নকল করতে শুরু করলাম। এখন সেটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আমার বন্ধুরা অনেকে তাদের স্বাভাবিক ভোঁতা ভঙ্গীতে বলে যে আমি 'ঘোড়ার মতো দৌড়ে চলি।' আমি এটাকে প্রশংসা রূপেই গ্রহণ করি।

আমার এও স্বীকার করতে বাধা নেই যে, কথা বলার সময় হুঁইঁনহ্ঁমদের কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গী আমার মধ্যে এসে যায় এবং তজ্জনিত বিদ্রূপ শুনে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা হয়না।

আমার এই সুখের সময়ে, যখন আমি ভাবতে শুরু করেছি যে চিরদিন এদেশেই থেকে যাব, সেই সময় একদিন প্রভু আমাকে প্রত্যেকদিনের চেয়ে একটু আগেই ডেকে পাঠালেন। তাঁর মুখ দেখেই আমি বুঝলাম যে তিনি একটু বিশেষ চিন্তায় পড়েছেন, এবং যা বলার আছে, সেটা কি ভাবে শুরু করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন যে, তিনি যা বলতে যাচ্ছেন, তাতে আমার কি প্রতিক্রিয়া হবে তা তিনি জানেন না। তিনি জানালেন যে, গত সাধারণ সভায় সকলে তাঁর ওপর বিরূপ হয়েছে, কারণ তিনি একটা ইয়াহুকে (অর্থাৎ আমি) সাধারণ পশুর মতো না রেখে একজন হুঁইঁনহ্ঁমের মতো যত্নে রেখেছেন। একথা সকলের জানা যে, তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, যেন আমার সঙ্গ তাঁকে কোন বিশেষ সুবিধে বা আনন্দ দেয়। এরকম অভ্যাস বিচারশক্তি ও প্রকৃতি উভয়েরই বিরোধী এবং এমন ব্যাপার তাদের মধ্যে কখনো ঘটেছে ব'লে কেউ কখনো শোনেনি। সভা সুতরাং তাঁকে উপদেশ দিয়েছে যে, হয় তিনি আমাকে অন্যান্য ইয়াহুদের মতো কাজে লাগান, আর নয়তো আমি যেন যেখান থেকে এসেছি, সেখানেই সাঁতরে ফিরে যাই।

তবে প্রথমটি বিস্তর আলোচনার পর সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কারণ যে সব হুঁইঁনহ্ঁমরা আমাকে বাড়িতে এসে দেখেছে, তারা একযোগে বলেছে, যেহেতু আমার একটু বিচারবুদ্ধি আছে, সুতরাং আমাকে ইয়াহুদের সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দিলে আমি হয়তো তাদের ফুসলে নিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকব এবং তারপর দল বেঁধে এসে রাতে হুঁইঁনহ্ঁমদের গরু মোষগুলোকে খেয়ে শেষ করব। কারণ স্বাভাবিক ভাবেই আমার জাতি হিংস্র খাদক এবং শ্রমবিমুখ।

আমার প্রভু আরো বললেন যে, প্রতিদিন তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর উপর চাপ দিচ্ছে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করার জন্য, এবং তাঁর পক্ষে তাদের আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাঁর অবশ্য ঘোরতর সন্দেহ আছে, আমি সাঁতার কেটে দূর স্বদেশে ফিরতে পারব কি না। সেইজন্য তাঁর ইচ্ছে আমি যেন আমার বর্ণনানুযায়ী কোন একটা জলযান তৈরী করে নিই, যাতে চড়ে সমুদ্র পার হওয়া সম্ভব হবে। এই কাজে তাঁর ভৃত্যেরা আমাকে সাহায্য করবে।

শেষে তিনি বললেন যে তিনি স্বচ্ছন্দে আমাকে আমার বাকি জীবন তাঁর কাছে রাখতে রাজি ছিলেন, কারণ তিনি দেখেছেন যে আপ্রাণ চেষ্টা করে, আমার নিম্নজাতীয় স্বভাবে যতোটা সম্ভব ততোটা হুঁইনহমদের অনুকরণ করে, আমি নিজের বেশ কয়েকটি বদ অভ্যাস দূর করতে পেরেছি।

এখানে পাঠককে আমার জানানো দরকার যে, ওদেশে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তকে বলা হয় 'হ্‌হ্লআই' যার মোটামুটি মানে করা চলে 'উপদেশ' বা 'পথনির্দেশ।' কারণ ওদেশে কেউ ভাবতেই পারে না যে, একজন বিচারবুদ্ধিশীল ব্যক্তিকে আদেশ দিয়ে জোর করে বাধ্য করার দরকার হ'তে পারে। তাই তারা শুধু উপদেশ দেয়, কারণ কোন ব্যক্তিই সঠিক যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারে না। যদি করে, তাহ'লে বুঝতে হবে সে বোধশক্তি হীন।

প্রভুর কথায় আমার মনে যে গভীর দুঃখ ও হতাশা উপস্থিত হ'ল তা কহতব্য নয়। সেই প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আমি চেতনা হারিয়ে তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তখন তিনি জানালেন যে তিনি ধরে নিয়েছিলেন আমি মরেই গিয়েছি (কারণ হুঁইনহমরা কেউ এরকম অজ্ঞান হয় না কখনো)।

আমি ক্ষীণ স্বরে উত্তর দিলাম যে মৃত্যু এক্ষেত্রে অত্যন্ত সুখকর হত। কারণ যদিও আমি সাধারণ সভার উপদেশ বা তাঁর বন্ধুদের তাগাদা দেওয়াকে দোষ দিতে পারি না, তবুও আমার দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিচারবুদ্ধিতেও মনে হচ্ছে যে বিচার আর একটু কম কঠোর হওয়া উচিত ছিল। আমি একটানা আধ লীগও সাঁতরাতে পারি না, এবং এখান থেকে নিকটতম দেশের দূরত্বও অন্ততঃ একশো লীগ বা তারও বেশি। সমুদ্র পার হওয়ার উপযোগী একটা ছোট জলযান তৈরী করতে গেলেও যে-সব জিনিষপত্র লাগে, তার অধিকাংশ এদেশে পাওয়াই যায় না, যদিও প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ আমি যেমন হোক একটা জলযান তৈরী করবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমার ধারণা সেরকম জলযান তৈরীও অসম্ভব এবং সেইজন্য মনে মনে নিজেকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়েছি। কারণ অস্বাভাবিক মৃত্যুকে আমি বিশেষ গুরুতর দুর্ভাগ্য ব'লে ভাবিই না। কিন্তু যদিই কোনভাবে আমি বেঁচে যাই, তাহ'লে আমাকে তো ফের সেই ইয়াহুদের মধ্যে ফিরে গিয়ে বাস করতে হবে এবং সদ্‌গুণের কোন উদাহরণ চোখের সামনে না থাকার ফলে আবার আমি দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়ব। আমি খুব ভালই জানি যে আমার মতো সামান্য ইয়াহুর সাধ্য নেই যে জ্ঞানী হুঁইনহমদের দৃঢ় বিচারশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকে এতটুকু টলাই।

সুতরাং তাঁর ভৃত্যদের সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতির জন্য বিনীত ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জলযান বানাবার মতো কঠিন কাজের জন্য যুক্তিসম্মত একটা সময় প্রার্থনা করলাম। এবং যদি কোনদিন ইংল্যাণ্ডে ফিরতে পারি, তাহ'লে হুঁইনহমদের প্রশংসা ছড়িয়ে এবং মানবজাতিকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করানোর চেষ্টা করে আমি দুনিয়ার উপকার করার চেষ্টা করব।

আমার প্রভু অল্প কথায় আমাকে অতি সৌজন্যমূলক একটি উত্তর দিলেন এবং আমার কাজ শেষ করার জন্য দু'মাস সময় দিলেন। তারপর তিনি তাঁর টাট্টু ভৃত্যকে ডেকে আমার নির্দেশ মতো কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আমি আগেই প্রভুকে বলেছিলাম শুধু টাট্টুর সাহায্য হ'লেই চলবে, কারণ আমার প্রতি তার কিছুটা ভালবাসা ছিল।

টাট্টুর সংগে প্রথমেই আমি গেলাম যেখানে আমার বিদ্রোহী নাবিকেরা আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল, সেখানে। আমি একটা উঁচু জায়গায় উঠে সমুদ্রের এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে শেষে দূরে একটা ছোট দ্বীপ দেখতে পেলাম মনে হ'ল। আমার পকেট-দূরবীনটা বার করে চোখে লাগাতেই দ্বীপটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মনে হ'ল দ্বীপটা প্রায় পাঁচ লীগ দূরে হবে। টাট্টুর কাছে কিন্তু দ্বীপটা মনে হ'ল একটা নীল মেঘ, কারণ নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশও যে আছে সেরকম কোন ধারণাই তার নেই, এবং সেইজন্য সমুদ্রে আমাদের মতো দূরের জিনিষ দেখে বুঝতে পারা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এই দ্বীপটাকে আবিষ্কার কবার পর কি হবে তা নিয়ে আমি আর ভাবলাম না। ঠিক করলাম যে ওই দ্বীপটি হবে আমার নির্বাসিত অবস্থার প্রথম বাসস্থান এবং পরে ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

বাড়িতে ফিরে টাট্টুর সংগে আলোচনার পর আমরা একটি বনে গিয়ে আমার ছুরি ও তার পাথরের কুঠার দিয়ে বেশ কয়েকটি ওক গাছের ডাল কেটে নিলাম। আমার কলাকৌশলের বিবরণ দিয়ে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। এটুকুই বলা যথেষ্ট হবে যে টাট্টু ভৃত্যের সাহায্যে ছ'সপ্তাহের মধ্যে আমি একটা ভারতীয় ডিঙি নৌকো তৈরী করে ফেললাম। তারপরে আমারই তৈরী চটের সুতো দিয়ে সেলাই করা শুকনো ইয়াহুর চামড়া দিয়ে নৌকোটিকে আবরিত করলাম। ওই একই চামড়া দিয়ে একটা পালও তৈরী করলাম এবং ওক গাছের ডাল থেকে চারটে বৈঠা। নৌকোর মধ্যে সেদ্ধ করা খরগোস ও পাখীর মাংস বেশ খানিক নিলাম এবং এছাড়া রইল এক পাত্র দুধ ও এক পাত্র জল।

আমার প্রভুর বাড়ির কাছে একটা পুকুরে আমি নৌকোটাকে প্রথম ভাসিয়ে পরীক্ষা করে দেখে তার ছোটখাটো ত্রুটিগুলো ঠিক করে নিলাম। সব ফাঁক ফোকরগুলো ইয়াহুর চর্বি দিয়ে বুজিয়ে শেষ অবধি দেখলাম নৌকোটা আমার ও মালের ভার বেশ ভালই বইতে পারছে। যখন আমি বেশ সন্তুষ্ট হলাম, তখন টাট্টু ও আরেকটি ভৃত্যের তত্ত্বাবধানে একটা গাড়িতে চড়িয়ে ইয়াহুরা সেটাকে টেনে সমুদ্রের তীরে নিয়ে গেল।

ক্রমে আমার যাত্রার দিন এসে গেল। আমি প্রভু ও প্রভুপত্নীর কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেলাম। আমার চোখে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছিল এবং হৃদয় দুঃখে যেন ফেটে যাচ্ছিল। কিন্ত আমার প্রভু কৌতুহল ও হয়তো দয়াবশতঃ আমাকে নৌকোয় চড়ে যেতে দেখবেন ঠিক করলেন। তিনি তাঁর কয়েকজন প্রতিবেশীকেও সংগে নিলেন।

জোয়ারের জন্য আমাকে প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হ'ল। তারপরে সৌভাগ্য

ক্রমে অন্য দ্বীপটির দিকে বাতাস বইছে দেখে আমি দ্বিতীয়বার প্রভুর কাছে বিদায় নিলাম। এই সময় আমি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে তাঁর সামনের পায়ের খুর চুম্বন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি সৌজন্যভরে আমার মুখের সামনে পা'টি তুলে ধরলেন।

তিনি সৌজন্যভরে আমার মুখের সামনে পাটি তুলে ধরলেন

এই শেষ ঘটনাটি উল্লেখ করার জন্য আমাকে বহু ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু হুঁইন্হম্দের মহত্ত্বের সম্যক পরিচয় পেলে এই সমালোচকেরা বহু আগেই স্তব্ধ হয়ে যেত। যাই হোক, উপস্থিত সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমি নৌকোয় উঠে বৈঠা দিয়ে ঠেলে অকুল সমুদ্রে ভেসে পড়লাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ
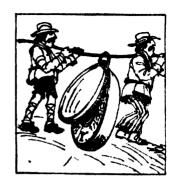
লেখকের বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রা—এসে পৌঁছলেন নিউ হল্যাণ্ডে, সেখানে থাকার আশায়—বাসিন্দাদের একজনের তীরের ঘায়ে আহত—তাঁকে ধরে জোর করে তুলে নিল এক পর্তুগীজ্ জাহাজ—কাপ্তেনের চরম ভদ্রতা ও শিষ্ট ব্যবহার—লেখক পৌঁছলেন ইংল্যাণ্ডে।

হুঁই‌ন‌হ‌্মদের দেশ থেকে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭১৪-১৫, সকাল ন'টায়। বাতাস বেশ অনুকূল ছিল; তবুও প্রথমে আমি শুধু দাঁড় বেয়ে চললাম; কিন্তু কিছু পরে ভেবে দেখলাম এতে আমি শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তাছাড়া বাতাসও হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে; সুতরাং আমার ছোট পালটি সাহস ক'রে খাটিয়ে দিলাম; এইভাবে, জোয়ার ও বাতাসের সহায়তায়, মোটামুটি ঘণ্টায় দেড় লীগ করে এগোতে লাগলাম। যতক্ষণ না আমি চোখের বাইরে গেলাম, ততক্ষণ প্রভু ও তাঁর সঙ্গীরা তীরে দাঁড়িয়ে রইলেন; মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম প্রিয় বন্ধু টাটু ভৃত্যটির ডাক, 'হ্নুই ইল্লা নিহা মাইআহ্ ইয়াহু' (শান্ত ইয়াহু, নিজের যত্ন নিও)।

আমার পরিকল্পনা ছিল একটি ছোট দ্বীপ খুঁজে বার করা; যেখানে কেউ থাকে না, কিন্তু পরিশ্রম করে যেখানে আমি নিজের খাওয়া পরাটুকু কোনমতে চালিয়ে নিতে পারব; ইউরোপের সবচেয়ে বড় দরবারের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার চেয়ে এতে আমি অনেক বেশি শান্তি পাব। ইয়াহুদের সমাজে ও তাদের পরিচালিত সরকারের অধীনে ফিরে যাওয়ার কথা আমার বীভৎস বলে মনে হচ্ছিল। নির্জন কোন দ্বীপে একাকীত্বের মধ্যে আমি অন্ততঃ নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারব এবং অননুকরণীয় হুঁই‌ন‌হ‌্মদের সব সদ্‌গুণের কথা মনে করে এক স্বর্গীয় আনন্দ পাব; আমার নিজের জাতের দুর্নীতি ও পাপের মধ্যে ফের অধঃপতিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আমার আর থাকবে না।

পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে যে, আমার জাহাজের নাবিকেরা কিভাবে বিদ্রোহ করে

আমাকে কেবিনে আটকে রেখেছিল; কেমন করে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা কোনদিকে যাচ্ছিলাম, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না; এবং যখন তারা আমাকে নৌকো করে তীরে নামিয়ে দিল, তারা তখন শপথ করে বলেছিল যে পৃথিবীর কোন অংশে তারা তখন আছে, তা তারা জানে না। যাই হোক, আমি তখন ধারণা করেছিলাম যে আমরা উত্তমাশা অন্তরীপের দশ ডিগ্রি দক্ষিণে অর্থাৎ প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছি। এই বিশ্বাস যদিও পুরোপুরি অনুমান নির্ভর, তবু তার ওপরেই ভিত্তি করে আমি পূর্বদিকে নৌকো চালানো স্থির করলাম, এই আশায় যে সোজা গেলে নিউ হল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে, অথবা তার পশ্চিমদিকে কোন দ্বীপে গিয়ে পেঁছিতে পারব। জোরে বাতাস বইছিল পশ্চিমদিকে, এবং সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে হিসেব করে দেখলাম প্রায় আঠার লীগ চলে গিয়েছি; এই সময়ে আধ লীগ দূরে একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখতে পেয়ে সেদিকে নৌকোর মুখ ঘোরালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পেঁছে দেখলাম দ্বীপটা আসলে একখণ্ড বিরাট পাথর মাত্র এবং তার মধ্যে দিয়ে একটা নালা প্রবাহিত। পাথরের আড়ালে নালায় নৌকো রেখে একটু উঁচুতে উঠে দেখলাম পায়ের তলায় দক্ষিণ থেকে উত্তরে ডাঙা প্রসারিত। আমি সারা রাত নৌকোতে শুয়ে রইলাম. পরদিন ভোরবেলা যাত্রা শুরু করে সাত ঘণ্টার মধ্যে নিউ হল্যান্ডের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে এসে পেঁছিলাম। এতে আমার দীর্ঘদিনের একটি বিশ্বাস দৃঢ়মূল হ'ল, যে মানচিত্রে ও চার্টে এই দেশটিকে তার আসল অবস্থানের অন্ততঃ তিন ডিগ্রি পূর্বে দেখানো হয়ে থাকে; এই কথাটা অনেক দিন আগে আমি আমার বন্ধু শ্রী হারম্যান মলকে যুক্তি সহ বলেছিলাম, কিন্তু তিনি অন্য লেখকদেরই অনুসরণ করেছেন।

যেখানে নামলাম, সেখানে কোন অধিবাসী নজরে পড়ল না। সঙ্গে অস্ত্র না থাকায় আমি বেশি ভেতরে যেতে ভয় পেলাম। তীরের কাছেই কিছু মাছ ধরে কাঁচাই খেয়ে ফেললাম, পাছে আগুন জ্বালালে আবার অধিবাসীরা আকৃষ্ট হয়। এইভাবে তিনদিন ধরে শুক্তি ও ছোট মাছ দিয়ে খিদে মেটালাম, যাতে আমার নিজের ভাণ্ডারে টান না ধরে; সৌভাগ্যক্রমে কাছেই একটা চমৎকার সুপেয় জলের ঝর্ণা পেয়ে আমি শারীরিক স্বস্তিও পেলাম।

চতুর্থ দিনে একটু বেশি দূরে গিয়ে আমি বিশ-ত্রিশ জন অধিবাসীকে দেখতে পেলাম, আমার থেকে পাঁচশো গজ দূরে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে পুরুষ, নারী ও শিশু সবাই ছিল; তারা গোল হয়ে অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের একজন আমাকে দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন পুরুষ আমার দিকে তেড়ে এল। আমি প্রাণপণে দৌড়ে গিয়ে নৌকোয় চেপে তাড়াতাড়ি ভেসে পড়লাম। বর্বর-গুলো আমার পেছনে তাড়া করে আসছিল। আমি সমুদ্রে বেশি দূর যাবার আগেই তাদের একজনের নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে আমার বাম হাঁটুর নীচের দিকে বিঁধে গেল (মৃত্যু পর্যন্ত এই ক্ষতের দাগ আমার শরীর থেকে মেলাবে না)। আমার ভয় হ'ল যে হয়তো তীরটা বিষ মাখানো; তাদের

তীরের নাগালের বাইরে গিয়েই নৌকো থামিয়ে আমি টিপে ক্ষত থেকে যতটা সম্ভব রক্ত বার করে দিয়ে জায়গাটাকে বেঁধে ফেললাম। আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না, কারণ ওই দ্বীপে আর ফেরার সাহস আমার ছিল না; হাওয়া বিপরীতে উত্তর-পশ্চিমে বইছিল, কাজেই আমাকে খুব জোরে বৈঠা বাইতে হচ্ছিল। একটি নিরাপদ অবতরণের জায়গা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখলাম উত্তর উত্তর-পূর্বে একটা পাল, প্রতি মিনিটেই ক্রমশঃ বড় হচ্ছে; আমি জাহাজটার জন্য অপেক্ষা করব কিনা বুঝতে পারছিলাম না। শেষে কিন্তু ইয়াহু জাতির প্রতি আমার ঘৃণাই জিতল এবং নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে আমি দক্ষিণ দিকে বৈঠা বেয়ে এগোতে লাগলাম এবং শীঘ্রই সকালে যে নালা থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেখানেই পৌঁছলাম; ইউরোপীয়ান ইয়াহুদের চেয়ে অসভ্য-বর্বরদের সঙ্গ অনেক শ্রেয় বলে মনে হ'ল। আমি তীরের খুব কাছে নৌকো রেখে সুপেয় জলের ঝর্ণাটির পাশে একটা পাথরের পেছনে লুকিয়ে পড়লাম।

জাহাজ নালার থেকে আধ লীগ দূরে এসে থামল এবং পানীয় জল সংগ্রহের জন্য একটি নৌকো নামিয়ে দিল (মনে হয় জায়গাটা নাবিকদের খুবই পরিচিত); কিন্তু নৌকো যখন তীরের একেবারে কাছে এসে পড়েছে, তখন আমি সেটাকে দেখতে পেলাম; ততক্ষণে আরেকটা লুকোবার জায়গা খুঁজে বার করার আর সময় নেই। নাবিকেরা নেমেই আমার নৌকোটাকে দেখে ছুটে গিয়ে সেটার ভেতর-বাইরে তন্নতন্ন করে খুঁজল এবং বুঝতেই পারল যে নৌকোর মালিক খুব বেশি দূরে নেই। তাদের মধ্যে চারজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চতুর্দিকে আনাচে-কানাচে খুঁজতে খুঁজতে শেষে পাথরের আড়ালে আমাকে আবিষ্কার করল। তারা কিছুক্ষণ আমার অদ্ভুত, নোঙরা পোশাকের দিকে তাকিয়ে রইল; আমার পশুচর্মের কোট, কাঠের সোলওয়ালা জুতো এবং লোমের মোজা; এর থেকে তারা বুঝতে পারল যে আমি ওখানকার অধিবাসী নই, কারণ বর্বরগুলো সারাক্ষণ নগ্ন হয়ে থাকে। একজন নাবিক পর্তুগীজ ভাষায় আমাকে উঠে দাঁড়াতে বলল ও জিজ্ঞেস করল আমি কে। আমি তাদের ভাষা বেশ ভালই বুঝতে পারলাম এবং উঠে দাঁড়িয়ে বললাম যে, আমি হুঁইঁনহ্ম্দের দেশ থেকে নির্বাসিত এক হতভাগা ইয়াহু এবং দয়া করে তারা যেন আমাকে চলে যেতে দেয়। তারা আমার মুখে পর্তুগীজ ভাষা শুনে অবাক হয়ে গেল এবং আমার গাত্রবর্ণ দেখে বুঝল যে আমি নিশ্চয়ই ইউরোপীয়ান; কিন্তু 'ইয়াহু' ও 'হুঁইঁনহ্ম' শব্দ দুটি শুনে তারা একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেল; পর মুহূর্তেই তারা হেসে গড়িয়ে পড়ল, কারণ আমার কথা বলা ঘোড়ার চিঁহিঁ ডাকের মতো শোনাচ্ছিল। আমি ভয় ও ঘৃণায় কাঁপছিলাম; ফের যাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে আমি ধীরে ধীরে ডিঙির দিকে এগিয়ে গেলাম; কিন্তু নাবিকেরা আমাকে ধরে প্রশ্ন করা শুরু করল: আমি কোন দেশের লোক, এখন কোথা থেকে আসছি ইত্যাদি। আমি উত্তর দিলাম যে আমার জন্ম ইংল্যাণ্ডে, যেখান থেকে পাঁচ বছর আগে আমি যাত্রা করেছিলাম; সেই সময় পর্তুগাল ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তি বজায় ছিল। সুতরাং আমি আশা করলাম যে তারা আমাকে শত্রু রূপে

দেখবে না, কারণ আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না; আমি একটি হতভাগ্য ইয়াহু, যে একটি নির্জন জায়গা খুঁজছে যেখানে তার দুর্ভাগ্যময় জীবনের বাকি অংশটুকু কাটিয়ে দেওয়া যায়।

যখন তারা কথা বলতে শুরু করল, আমার মনে হ'ল আমি জীবনে কখনো এত অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি বা শুনিনি। ইংল্যাণ্ডে একটা কুকুর বা গরু, নয়তো হুইনহমদের দেশে একটা ইয়াহু যদি কথা বলতে শুরু করে, তাহ'লে সকলে যেমন আশ্চর্য হয়ে যাবে, আমারও এসময় ঠিক তাই মনের ভাব হ'ল। পর্তুগীজ নাবিকগুলিও আমার বিচিত্র পোশাক ও অদ্ভুত কথা বলার ভংগীতে সমান অবাক হয়েছিল, যদিও আমার কথা তারা বেশ বুঝতে পারছিল। তারা গভীর মানবতাবোধ নিয়ে আমার সংগে কথা বলল এবং জানাল যে তাদের কাপ্তেন নিশ্চয় আমাকে লিসবন পর্যন্ত নিয়ে যাবেন, এবং সেখান থেকে আমি সহজেই স্বদেশে ফিরতে পারব। দু'জন নাবিক এখনই জাহাজে গিয়ে এ ব্যাপারে কাপ্তেনের নির্দেশ জেনে আসবে; ইতিমধ্যে, আমাকে শপথ করে বলতে হবে যে পালাব না, নচেৎ তারা আমাকে বেঁধে আটকে রাখবে। আমি তাদের কথা মেনে চলা ছাড়া উপায় দেখলাম না। তারা আমার কাহিনী জানতে খুবই উৎসুক ছিল, কিন্তু আমি তাদের ইচ্ছে করেই বিশেষ সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলাম না। তারা শেষ অবধি সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, দীর্ঘদিনের দুঃখকষ্টে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যে নৌকোটা জলভর্তি পাত্রগুলি নিয়ে জাহাজে গিয়েছিল, সেটি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে এল এবং তার নাবিকেরা জানাল যে কাপ্তেনের আদেশে আমাকে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হাঁটু মুড়ে বসে পড়লাম। কিন্তু সবই বৃথা হ'ল; লোকগুলো আমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে প্রথমে নৌকোয় ও পরে জাহাজে তুলল এবং ঠেলে কাপ্তেনের কেবিনে ঢুকিয়ে দিল।

কাপ্তেনের নাম পেড্রো ডি মেনডেজ্; তিনি অতি উদার ও শিষ্টাচারী ভদ্রলোক। তিনি আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে এবং জানতে চাইলেন আমি কি খাব। তিনি ক্রমাগত আমাকে এত আপ্যায়ন করতে লাগলেন যে, আমি একটা 'ইয়াহু'-র কাছে এত উচ্চস্তরের ভদ্রতার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। যাই হোক, আমি একটি কথা না বলে মুখ গোঁজ করে বসে রইলাম। তাঁর এবং তাঁর লোকেদের গায়ের গন্ধে আমার চেতনা লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। শেষে আমি আমার ডিঙি থেকে কিছু খাবার নিয়ে খেতে চাইলাম; কিন্তু তিনি আমার জন্য কিছু মুরগীর মাংস-ও উৎকৃষ্ট মদ্য আনতে আদেশ দিলেন এবং এও হুকুম দিলেন যে আমাকে যেন একটা পরিষ্কার কেবিনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। আমি পোশাক না ছেড়েই এবং ওপরের চাদর না তুলেই বিছানার ওপর শুয়ে পড়লাম। আধঘণ্টা পরে যখন মনে হ'ল নাবিকেরা সবাই খেতে বসেছে, আমি চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়লাম। জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি জলে লাফিয়ে পড়ে পালাবার উপক্রম করছিলাম; কিন্তু হঠাৎ একটা নাবিক এসে আমাকে ধরে ফেলল। কাপ্তেনের কাছে এই খবর যাবার পর আমাকে কেবিনের মধ্যে শিকলে বেঁধে রাখা হ'ল।

খাওয়া হয়ে গেলে ডন পেড্রো এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এরকম মরিয়া হয়ে পালাবার চেষ্টা আমি করেছিলাম কেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁর দ্বারা আমার যতখানি উপকার হওয়া সম্ভব, তা তিনি করবেন। তিনি এত আবেগের সঙ্গে সব কথা বললেন যে, অবশেষে আমি তাঁকে কিঞ্চিৎ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পশু হিসেবে

হঠাৎ একটা নাবিক এসে আমাকে ধরে ফেলল

বিবেচনা করতে সম্মত হলাম। আমি তাঁকে খুব সংক্ষেপে আমার সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দিলাম ; তাছাড়া, আমার বিরুদ্ধে নাবিকদের ষড়যন্ত্র এবং তারা যে দেশে আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল, সেখানে আমার পাঁচ বছরের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও সংক্ষেপে জানালাম। তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম যে তিনি পুরো ব্যাপারটাকেই একটা স্বপ্ন বা খেয়াল ব'লে মনে করছেন। এতে আমি প্রচন্ড রেগে গেলাম। কারণ পৃথিবীর সমস্ত ইয়াহুদের মধ্যে যে মিথ্যে কথা বলা ও অন্যদের সত্যভাষণকে মিথ্যা বলে সন্দেহ করার প্রবণতা আছে, তা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম যে তাঁর দেশে 'যে জিনিষ নেই, তা বলা' রেওয়াজ কি না। 'মিথ্যা' বলতে কি বোঝায়, তা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ; এবং বাস্তবিক, হুঁইনহ্মদের দেশে আমি যদি এক হাজার বছরও থাকতাম, তাহলে কোন ভৃত্যের মুখ থেকেও আমি একটা মিথ্যে শুনতে পেতাম না নিঃসন্দেহে। সুতরাং কাপ্তেন আমার কথা বিশ্বাস করেন বা না করেন, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। তবুও তিনি আমার যে উপকার করেছেন, তার প্রতিদান স্বরূপ আমি তাঁর যে কোন সন্দেহ মেটাবার চেষ্টা করব ; কারণ তাঁর প্রকৃতিই দুর্নীতিগ্রস্ত, যদিও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি হয়তো সত্য আবিষ্কার করতে পারেন।

মানুষ হিসেবে কাপ্তেন যথেষ্ট বিচক্ষণ ; তিনি অনেক চেষ্টা করলেন, যদি আমার কাহিনীতে কোথাও আমি হোঁচট খাই, তা ধরে ফেলার জন্য, কিন্তু পারলেন না ; শেষ অবধি তিনি আমার কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দিগ্ধ হলেন। কিন্তু তিনি বললেন যে সত্যের প্রতি আমি যখন এতই অনুরক্ত, তখন আমাকে কথা দিতে হবে যে, এই সমুদ্রযাত্রায় আমি যেন তাঁর সঙ্গেই থাকি এবং নিজের প্রাণনাশের কোন চেষ্টা না করি ; নচেৎ তিনি লিসবন পেঁাছোনো পর্যন্ত আমাকে বন্দী করে রাখতে বাধ্য হবেন। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম বটে, কিন্তু একই সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললাম যে ইয়াহুদের মধ্যে গিয়ে বসবাস করার চেয়ে জীবনে চরম কষ্ট পেতেও আমি রাজি আছি।

আমাদের সমুদ্রযাত্রা নির্বিঘ্নেই কাটল। কাপ্তেনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ ও তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধের মর্যাদা রাখতে আমি মাঝে মাঝে তাঁকে সঙ্গ দিতাম, যদিও আমার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মনুষ্য জাতির বিরুদ্ধে আমার ঘৃণা থেকে থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ত। অবশ্য তিনি এ বিষয়ে কোন রকম মন্তব্য করতেন না। দিনের অধিকাংশ সময় আমি কেবিনের মধ্যেই থাকতাম, যাতে নাবিকদের কাউকে দেখতে না হয়। কাপ্তেন প্রায়ই আমাকে বর্বর পোশাকটি খুলে ফেলে তাঁর সবচেয়ে ভাল জামা কাপড় পরতে অনুরোধ করতেন। কিন্তু কোন ইয়াহুর পরিহিত পোশাক পরতে আমার এত ঘৃণা হ'ত যে তার অনুরোধ আমি সমানেই প্রত্যাখ্যান করতাম। আমি তাঁর কাছ থেকে শুধু শার্ট নিয়েছিলাম, কারণ তিনি পরার পরে সে দুটো কাচা হয়েছিল ; সুতরাং ও দুটো আমাকে বিশেষ অপবিত্র করতে পারবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস ছিল। দু'দিন অন্তর শার্ট বদল ক'রে আমি নিজের হাতে কাচতাম।

৫ই নভেম্বর, ১৭১৫ সালে আমরা লিসবন পেঁাছলাম। নামবার সময় কাপ্তেন জোর করে তাঁর ক্লোকটি পরিয়ে সারা শরীর আচ্ছাদিত করে দিলেন, যাতে আজেবাজে লোকজন আমার চারপাশে ভিড় না করে। তিনি আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং আমার বারংবার অনুরোধে বাড়ির ওপরতলায় সবচেয়ে পিছনের ঘরটিতে আমার থাকার বন্দোবস্ত করলেন। আমি তাঁকে মিনতি করে বললাম যে হুঁইঁনহঁমদের সম্পর্কে তাঁকে যা কিছু বলেছি, তা যেন তিনি ঘুণাক্ষরেও কারো কাছে প্রকাশ না করেন ; কারণ এরকম একটি কাহিনীর আভাসমাত্র পেলেই শত শত লোক ভিড় করে আমাকে দেখতে আসবে ; উপরন্তু, আমাকে হয়তো জেলে পুরে তারপর 'ইনকুইজিশন' (রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিচারক গোষ্ঠী) জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। কাপ্তেন অবশেষে একটি নতুন তৈরী স্যুট পরতে আমাকে রাজি করালেন। কিন্তু আমি দর্জির কাছে গিয়ে মাপ দিতে কিছুতেই সম্মত হলাম না। তবে ডন পেড্রো ও আমার শারীরিক গঠন প্রায় একই হওয়ার ফলে তাঁর মাপে তৈরী পোশাক আমার পরণে বেশ মানানসই হ'ল। তিনি অন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষও আমাকে নতুন কিনে দিলেন ; কিন্তু অন্ততঃ চব্বিশ ঘন্টা খোলা হাওয়ায় রেখে না দিয়ে তার একটিকেও আমি ব্যবহার করিনি।

কাপ্তেন ছিলেন অবিবাহিত, এবং তাঁর তিনজন ভৃত্যের কেউই আমাদের খাওয়ার সময় কাছে আসত না ; এছাড়া তাঁর পুরো আচার-ব্যবহার এত হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল এবং সত্যিকার মানবিক বোধবুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে আমি বাস্তবিকই তাঁকে পছন্দ করে ফেললাম। তিনি আমাকে এতদূর প্রভাবিত করলেন যে কিছুদিন পরে আমি পিছনের জানলা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দৃশ্য দেখাও শুরু করলাম। আস্তে আস্তে কিছুকাল পরে আমাকে আরেকটি ঘরে স্থানান্তরিত করা হ'ল ; জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তার দৃশ্য দেখেই আমি ভয়ের চোটে ফের মাথা ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সদর দরজা অবধি নিয়ে গেলেন। এর পরে ধীরে ধীরে আমার ভয় কমতে লাগল, কিন্তু আমার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য বেড়ে গেল। শেষে সাহসভরে আমি কাপ্তেনের সঙ্গে রাস্তায় হাঁটাও শুরু করলাম, কিন্তু তামাক দিয়ে আমার নাক আমি ভালভাবে বন্ধ করে রাখতাম।

ডন পেড্রোকে আমি এর আগে আমার পরিবার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলাম। দিন দশেক পরে তিনি আমাকে বললেন, আত্মসম্মান ও বিবেকের খাতিরে আমার স্বদেশে ফিরে গিয়ে স্ত্রী-ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসবাস করা উচিত। তিনি জানালেন যে বন্দরে একটা ইংরেজ জাহাজ শীঘ্রই যাত্রা করবে এবং তিনি সমস্ত দরকারী জিনিষপত্র আমাকে দিয়ে দেবেন। এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার যে-সব তর্কবিতর্ক হয়েছিল, তা বলতে গেলে পাঠকের বিরক্তিকর লাগবে। মোটকথা, তিনি বললেন, আমি যেরকম পুরো নির্জন দ্বীপ খুঁজছি, সেরকম পাওয়া অসম্ভব ; কিন্তু আমার সংসারকে আমি নিজের নির্দেশ মতো চালাতে পারি এবং ইচ্ছে অনুযায়ী সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে পারি।

শেষ অবধি উপায়ান্তর না দেখে আমি তাঁরই মতে সায় দিলাম। আমি ২৪ শে নভেম্বর একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজে রওনা হলাম, কিন্তু এর কাপ্তেন কে তা জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করলাম না। ডন পেড্রো আমার সঙ্গে জাহাজ পর্যন্ত গেলেন এবং আমাকে কুড়ি পাউন্ড ধার দিলেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ভঙ্গীতে বিদায় নেবার সময় তিনি আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আমি কোন মতে তাঁর আলিঙ্গন সহ্য করলাম। এই শেষ সমুদ্র-যাত্রার সময় আমি জাহাজের কাপ্তেন বা তার লোকেদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না করে অসুখের অজুহাতে সারাক্ষণ কেবিনের মধ্যে রয়ে গেলাম। ৫ই ডিসেম্বর, ১৭১৫ সকাল নটায় আমরা নোঙর ফেললাম এবং বিকেল তিনটের সময় আমি রেডরিফ-এ আমার বাড়িতে পেঁছে গেলাম।

আমার স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা আমাকে দেখে বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, কারণ তাদের ধারণা হয়েছিল যে আমি নিশ্চিত মারা গিয়েছি। কিন্তু আমাকে এখানে সরাসরি স্বীকার করতেই হবে যে, তাদের দেখে আমার মন শুধু প্রচণ্ড ঘৃণা, তাচ্ছিল্য ও বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হয়ে গেল ; এই অনুভূতি আরও তীব্র হ'ল যখন আমি তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা চিন্তা করলাম। কারণ, যদিও হুইনহম্‌দের দেশ থেকে আমার দুর্ভাগ্যজনক নির্বাসনের পর আমি ইয়াহুদের

মোটামুটি সহ্য করতে নিজেকে বাধ্য করেছিলাম, তবু আমার মনপ্রাণ সেই মহান হুইনহমদের অসাধারণ গুণাবলীর স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল। এবং আমি যখন ভেবে দেখলাম যে এই ইয়াহু জাতির একজনকে বিয়ে করে আমি আরও কয়েকটি ইয়াহুর পিতা হয়েছি, তখন চরম লজ্জা, বিদ্বেষ ও ভীতিতে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম।

আমি বাড়িতে ঢোকামাত্র আমার স্ত্রী আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন; এই বিশ্রী জীবটির সংস্পর্শ থেকে এত বছর আমি দূরে ছিলাম যে স্ত্রীর স্পর্শে আমি প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। এই কথাগুলি লেখার সময়ে আমার ইংল্যান্ডে প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে তার পর থেকে। প্রথম বছরে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের গায়ের গন্ধ এত অসহনীয় লাগত যে তাদের উপস্থিতি আমি আদৌ সহ্য করতে পারতাম না; এমন কি তাদের সঙ্গে এক ঘরে বসে খেতে পর্যন্ত পারতাম না। এই মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা কেউ আমার খাবার ছুঁতে বা একই পাত্র থেকে পান করতে সাহস করে না; আমিও কখনও আজ পর্যন্ত ওদের কাউকে আমার হাত পর্যন্ত ধরতে দিইনি। আমি প্রথম পয়সা খরচ করে দু'টি বাচ্চা ঘোড়া কিনেছিলাম; তাদের আমি একটা অত্যন্ত ভাল আস্তাবলে রাখি; তাদের বাদ দিলে আমার একমাত্র প্রিয়পাত্র হচ্ছে তাদের সহিস, কারণ সে সব সময় আস্তাবলে থাকার জন্য তার গায়ে ঘোড়ার গন্ধ লেগে থাকে। আমার ঘোড়া দুটি আমার মনোভাব মোটামুটি ভালই বুঝতে পারে; আমি প্রতিদিন অন্ততঃ চারঘণ্টা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। লাগাম ও জিন তাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা বস্তু; তাদের সঙ্গে আমি পারস্পরিক পরম ভালবাসা ও মিত্রতার সম্পর্ক নিয়ে বাস করি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লেখকের সত্যপরায়ণতা—এই গ্রন্থ প্রকাশ করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য—যে ভ্রমণকারীরা সত্য বিকৃত করে, তাদের নিন্দা—এই লেখার ব্যাপারে তাঁর কোনো কুমতলব সম্বন্ধে সন্দেহ দূরীকরণ—একটি আপত্তির উত্তর—উপনিবেশ তৈরীর পদ্ধতি—তাঁর স্বদেশের প্রশংসা—লেখক বর্ণিত দেশসমূহের উপর ইংল্যান্ডের রাজার অধিকারের যৌক্তিকতা—সেই দেশগুলি জয়ের পথে বাধাসমূহ—পাঠকের কাছ থেকে লেখকের শেষ বিদায় গ্রহণ—ভবিষ্যতে জীবনযাপনের প্রস্তাবিত পদ্ধতি—শুভ উপদেশ দান ও সমাপ্তি।

সুতরাং, হে সুভদ্র পাঠক, আমি আপনাকে এতক্ষণ ধরে ষোল বছর সাত মাসের ওপর স্থায়ী আমার বিভিন্ন ভ্রমণের সত্য ও বিশ্বস্ত একটি বর্ণনা দিলাম। এই বর্ণনায় অলংকার ব্যবহারের চেয়ে সত্যকথনের প্রতিই আমি বেশি নজর দিয়েছি। হয়তো আমি অন্যদের মতো আপনাকে বিচিত্র ও অসম্ভব সব কাহিনী বর্ণনা করে চরম বিস্মিত করে দিতে পারতাম; কিন্তু তা না করে আমি সহজতম ভাষায় ও ভঙ্গীতে সোজাসুজি ঘটনার বর্ণনা দেওয়াই বেশি পছন্দ করেছি। কারণ আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে কিছু ঘটনা জানানো, প্রমোদ দান নয়।

আমরা যারা দুর্গম দূরদেশে ভ্রমণ করতে যাই, যেখানে কোন ইংরেজ বা ইউরোপীয় খুব কমই গেছে, তাদের পক্ষে জলেস্থলে আশ্চর্য সব জন্তুজানোয়ারের কথা বলা খুবই সহজ। কিন্তু একজন প্রকৃত ভ্রমণকারীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষকে অধিকতর জ্ঞানী ও মহত্তর হতে সাহায্য করা এবং তাদের বর্ণিত ভিনদেশগুলির ভাল ও মন্দ দু'রকমই উদাহরণ দ্বারা মানবজাতির মানসিক উন্নতি ঘটানো।

আমি মনেপ্রাণে ইচ্ছে করি যে এমন একটি আইন প্রণীত হোক, যার বলে যে কোন ভ্রমণকারী তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করার আগে লর্ড হাই চ্যান্সেলরের সামনে শপথ করতে বাধ্য থাকবে যে, সে যা কিছু ছাপতে যাচ্ছে, তা তার চরম জ্ঞানানুসারে নির্ভুল ও নির্ভেজাল সত্য। কারণ তাহলে দুনিয়ার লোক সাধারণতঃ যেরকম

ঠকে, সেরকম ঠকবে না ; অসতর্ক জনসাধারণের মধ্যে বেশি চালাবার জন্য কিছু লেখক যেমন চরম মিথ্যা ভাষণে বই ভর্তি করে ফেলে, তাও বন্ধ হবে। আমি ছোটবেলায় অনেকগুলি ভ্রমণবৃত্তান্ত অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পড়েছিলাম ; কিন্তু তারপর থেকে পৃথিবীর অধিকাংশ নিজেই ঘুরে দেখার ফলে, নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনেকগুলি চমকপ্রদ বর্ণনা যে আসলে মিথ্যে, তা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি। এই সব কারণে, বই পড়ার বিরুদ্ধে আমার একটা তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে এবং মনুষ্য-জাতির বিশ্বাস করার প্রবণতাকে এত নির্লজ্জভাবে অবমানিত করতে দেখে একটা ক্রোধও অনুভব করি। সুতরাং, যেহেতু আমার পরিচিত ব্যক্তিরা ধরেই নিয়েছিলেন যে আমার প্রচেষ্টা এদেশে মোটেই সমাদৃত হবে না, আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম যে সত্যের প্রতি আমি কঠোরভাবে অনুরক্ত থাকব, কিছুতেই তার থেকে নড়ব না ; কোন লোভই আমাকে টলাতে পারবে না, কারণ আমার মহান প্রভু ও অন্যান্য বিখ্যাত হুঁইঁনহ্‌মদের যেসব কথাবার্তা আমি শুনেছিলাম, সেগুলি সবই আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা থাকবে।

কিছু লেখা আছে, যাতে প্রতিভা বা উচ্চশিক্ষার বিশেষ দরকার পড়ে না, শুধু ভাল স্মৃতিশক্তি বা নিখুঁত একটি দিনপঞ্জী থাকলেই চলে ; এ ধরণের লেখায় খ্যাতি বিশেষ লাভ করা যায় না। একইভাবে, ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখকেরা, অভিধান রচয়িতাদের মতো, জনসাধারণের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায় ; যারা যত পরে লেখে, তারা তত বেশিদিন স্মৃতিপটে জাগরূক থাকে। আমার বর্ণিত দেশগুলিতে যদি আরো কিছু ভ্রমণকারী কখনো যায় এবং আরো নতুন কিছু জিনিষ সেখানে আবিষ্কার করে বা আমার কিছু ভুল ধরে, তাহলে তারা আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে। যদি আমি খ্যাতি পাওয়ার জন্য লিখতাম, তাহলে আমার উপরোক্ত ঘটনায় খুব কষ্টই হ'ত। কিন্তু আমার একমাত্র উদ্দেশ্য সমাজের মঙ্গলসাধন এবং সে কারণে আমি বিশেষ হতাশ হ'ব না। মহান হুঁইঁনহ্‌মদের সদ্‌গুণগুলির বর্ণনা পড়ে কে না নিজের পাপের কথা মনে করে আত্মগ্লানির শিকার হবে ? বিশেষতঃ সে যখন নিজেকে এই দেশের পরিচালক, বিচারবুদ্ধিশীল জীব হিসেবে বিবেচনা করে ? যে সব দুর্গম দেশে ইয়াহুরাই পরিচালক, সে সব দেশ সম্পর্কে আমি কিছু বলব না ; এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম দুনীর্তিগ্রস্ত জাতি হ'ল 'ব্রবডিংন্যাগিয়ান'-রা ; সুনীতি ও সরকার পরিচালনার বিষয়ে তাদের নিয়মগুলি মেনে চললে আমরাও সুখী হতে পারি।

আমার লেখার যে কোন নিন্দা হবে না, তাতে আমি খুবই খুশী। কারণ যে সব দূর দেশের সঙ্গে আমাদের কোন রকম সম্পর্কই নেই, তার সম্বন্ধে কিছু ঘটনার বর্ণনা লিপিবন্ধ করার জন্য একজন লেখকের বিরুদ্ধে কিই বা আপত্তি তোলা যেতে পারে ? সাধারণ ভ্রমণকাহিনী লেখকেরা যে সব দোষে আক্রান্ত, সেগুলিকে আমি সযত্নে এড়িয়ে গেছি। তাছাড়া কোন রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আমি কোন কথা বলিনি এবং কোন লোক বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও ঙ্মা, বিদ্বেষ বা মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে লিখিনি। আমি লিখেছি অতি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে, মানবজাতিকে

সুনির্দেশ ও সুসংবাদ দিতে, কারণ সমস্ত বিনয় সত্ত্বেও আমি বলতে পারি যে, মহান হুঁই"নহ"মদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুবাদে আমি মানুষ হিসাবে কিছুটা উচ্চস্তরের বটে। কোন আর্থিক লাভ বা প্রশংসা আদায়ের উদ্দেশ্যেও আমি লিখিনি। আমি এমন একটিও কথা লিখিনি যা কারো অসূয়া উদ্রেক করতে পারে। সুতরাং আশা করি আমি নিজেকে একজন সম্পূর্ণ নির্দোষ লেখকরূপে চিহ্নিত করতে পারি।

আমি স্বীকার করছি যে কানাঘুষো শুনেছিলাম যে ইংল্যাণ্ডের প্রজা হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমার অভিবাদন জানানো উচিত ছিল, কারণ দেশের প্রজার আবিষ্কৃত যে কোন দেশই রাষ্ট্রের সম্পত্তি। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে যে, নগ্ন আমেরিকানদের যেমন সহজে ফার্ডিনাণ্ডো কর্টেজ জয় করেছিল, তেমন সহজে এই দেশগুলো জয় করতে পারা যাবে কিনা। লিলিপুটিয়ানদের পরাজিত করতে অবশ্য নৌ বা সেনাবাহিনীর আক্রমণের প্রয়োজন নেই; কিন্তু ব্রবডিংনাগিয়ানদের আক্রমণ করতে যাওয়াটা বিচক্ষণ বা নিরাপদ কাজ হবে কিনা সন্দেহ আছে; অথবা 'উড়ন্ত দ্বীপটি' মাথার ওপর থাকলে ইংরেজ সৈন্যেরা বিশেষ স্বস্তি বোধ করবে কিনা তাও ভেবে দেখার বিষয়। হুঁই"নহ"মরা অবশ্য যুদ্ধের ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ এবং মারণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। তবুও, আমি যদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হতাম তো তাদের আক্রমণ করার পরামর্শ আমি কিছুতেই দিতাম না। তাদের বিচক্ষণতা, একতা, নির্ভীকতা ও দেশপ্রেম আমাদের সামরিক কলাকৌশলের সমস্ত ত্রুটি সহজেই উন্মুক্ত করে দেবে। একবার কল্পনা করুন, কুড়ি হাজার হুঁই"নহ"ন কোন একটি ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর ভিতর ঢুকে পড়েছে এবং পেছনের পায়ের ভয়ঙ্কর লাথিতে যোদ্ধাদের মুখ চটকে, রথ উলটে, সাধারণ সেনাদের মধ্যে কি ভীষণ ত্রাসের সৃষ্টি করছে! এই মহান জাতিটিকে যুদ্ধে পরাজিত করার পরিবর্তে আমার মনে হয় ইউরোপকে সভ্য করে তোলার জন্য ওদেশের একদল বাসিন্দাকে নিমন্ত্রণ করে আনলে ভাল হয়। তারা আমাদের সম্মান, ন্যায়বিচার, সত্য, মিতাচার, মানসিক শক্তি, সতীত্ব, বন্ধুত্ব, পরোপকার ও বিশ্বস্ততার মূল নীতিগুলি আমাদের শেখাতে পারত। এই সমস্ত সদ্গুণগুলির নাম পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই উপস্থিত এবং আধুনিক ও প্রাচীন উভয় কালেরই লেখকেরা এগুলির উল্লেখ বারংবার করেছেন; আমার নিজের সীমিত পড়াশোনা থেকে এটুকু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি।

কিন্তু আমার আবিষ্কৃত দেশগুলি যোগ করে সম্রাটের এলাকা না বাড়ানোর পিছনে আর একটি কারণও ছিল। সত্য বলতে, এই ধরণের উপলক্ষে রাজাদের বিচার সম্পর্কে আমার একটু মন্দ ধারণা আছে। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একদল জলদস্যু ঝড়ের তাড়নায় সমুদ্রের বুকে অজানা কোথাও ভেসে গেছে; কিছুদিন পরে মাস্তুলের ওপরে বসা বালকটি ডাঙা দেখতে পায়; তারা ডাকাতি ও লুণ্ঠন করবার জন্য তীরে নামে; তারা একটি নিরীহ জাতির সম্মুখীন হয়, তাদের দ্বারা আপ্যায়িত হয়, তারা দেশের একটা নতুন নাম দেয়, রাজার নামে দেশটি অধিকার করে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে

একটা পচা তক্তা বা পাথর খাড়া পুঁতে দেয়, দু'তিন ডজন অধিবাসীকে হত্যা করে, ডজন দুই বাসিন্দাকে জোর ক'রে নমুনা হিসেবে নিজেদের দেশে ধরে নিয়ে আসে এবং দেশে ফিরে রাজার ক্ষমা ও করুণা লাভ করে। এইবার 'স্বর্গীয় অধিকার'-এর বলে সাম্রাজ্যের একটি নতুন রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রথম সুযোগেই সেই দেশে জাহাজ ভর্তি সৈন্য পাঠানো হয়; সোনার জন্য অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া বা মেরে ফেলা হয় এবং তাদের রাজাদের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়; যাবতীয় সব রকমের অমানুষিক ও কামনাতুর কাজ চালিয়ে যাওয়ার অবাধ পরোয়ানা জারী করা হয়; সে দেশের মাটি অধিবাসীদের রক্তে ভিজে যায়। এবং তখন এই জঘন্য কসাইয়ের দলকে ধার্মিক আখ্যায় ভূষিত ক'রে বলা হয় যে তারা একটি আধুনিক উপনিবেশ স্থাপন ক'রে একটি বর্বর ও পৌত্তলিক জাতিকে সুসভ্য ক'রে তুলছে।

কিন্তু একথাও আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ইংরেজ জাতির ক্ষেত্রে উপরোক্ত বর্ণনাটি আদৌ প্রযোজ্য নয়। উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান, যত্ন ও ন্যায়বিচারের জন্য ইংরেজরা সারা পৃথিবীর আদর্শ হ'তে পারে। ধর্ম ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তারা উদারভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য তারা বাস্তবিকই ধর্মপরায়ণ ও সক্ষম পাদ্রীদের বেছে পাঠায়। মাতৃভূমি থেকে উপনিবেশে লোক পাঠানোর সময় যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে সুস্থমতি ও স্বাভাবিক জীবনযাপনকারী মানুষদের খুঁজে বার করা হয়। ন্যায়বিচার বিতরণে তারা অত্যন্ত কঠোর এবং সরকারী কাজকর্মে সমস্ত উপনিবেশে তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, মানসিক ক্ষমতাবান ও দুর্নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করে। এবং সবার উপরে, তারা এমন সব ব্যক্তিকে প্রধান শাসক নিযুক্ত করে, যারা তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন ও সৎ। শাসিত জাতির মানুষদের সুখবর্ধন ও তাদের প্রভু রাজাধিরাজের সম্মান রক্ষা ছাড়া তারা আর কিছু ভাবে না।

কিন্তু আমার বর্ণিত দেশগুলির একটিরও মানুষদের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করা, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া, নিহত হওয়া বা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার কোন কামনা নেই; এসব দেশে সোনা, রুপো, চিনি বা তামাকের প্রাচুর্যও নেই; সুতরাং আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে তারা আমাদের আগ্রহ, বীরত্ব বা কৌতূহলের উপযুক্ত নয়। তবুও যদি কেউ অন্য মত পোষণ করেন, তাহলে আমি আইনসম্মতভাবে আহ্বান পাওয়ার পরে ঘোষণা করতে রাজি আছি যে, আমার আগে কোন ইউরোপীয় এসব দেশে পদার্পণ করেনি; অন্ততঃ যদি ওই সব দেশের বাসিন্দাদের কথা বিশ্বাস করতে হয়।

কিন্তু সম্রাটের নামে দেশের দখল নেওয়ার চিন্তা একবারও আমার মাথায় আসেনি। যদি বা আসত, তাহলে আমার তখন যা অবস্থা, তাতে সুবিবেচনা ও আত্মরক্ষার্থে আমাকে যে কাজ করার জন্য আরও অনেক উত্তম সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ত।

সুতরাং ভ্রমণকারী হিসেবে আমার বিরুদ্ধে একমাত্র যে-আপত্তি উত্থাপিত হ'তে

পারে, তার যথোচিত জবাব দেওয়া শেষ করে আমি এইবার আমার বিনয়ী পাঠকদের কাছে শেষবারের মতো বিদায় নিচ্ছি ও রেডারিফে আমার ছোট্ট বাগানে নিজের চিন্তাজগতে মগ্ন হয়ে সুখশান্তি উপভোগ করার অনুমতি চাইছি। হুইনহমদের কাছ থেকে যে অসাধারণ সদ্‌গুণগুলি শিখেছি, সেগুলি আমার নিজের পরিবারের ইয়াহুদের শেখাতে চাই; এবং চাই মাঝে মাঝে আয়নায় নিজেকে দেখতে, যাতে 'মানুষ' নামক প্রাণীটির চেহারা দেখতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠি। আমাদের দেশে হুইনহমদের যেরকম পাশবিকভাবে ব্যবহার করা হয় তার প্রতিবাদস্বরূপ ও আমার প্রভু হুইনহম, তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব তথা গোটা হুইনহম জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ, আমি আমার ঘোড়াদের সর্বদা সম্মানজনকভাবে দেখব।

আমার স্ত্রীকে একটি লম্বা টেবিলের অপর প্রান্তে খেতে অনুমতি দিচ্ছি

গত সপ্তাহ থেকে আমার স্ত্রীকে একটি লম্বা টেবিলের অপর প্রান্তে আমার সঙ্গে একসাথে খেতে অনুমতি দিচ্ছি; আমি যে কয়েকটি প্রশ্ন করি, তার অতি সংক্ষিপ্ত জবাবও সে দেয়। তবুও ইয়াহুর গায়ের গন্ধ এত কদর্য লাগে যে, আমি আমার নাক সর্বদা ল্যাভেন্ডার নয়তো তামাকপাতা দিয়ে বন্ধ করে রাখি। যদিও বেশি বয়সে অভ্যাস পালটানো খুবই শক্ত, তবু আমার আশা আছে যে অদূর ভবিষ্যতে কোনদিন একটা ইয়াহুর পাশেই বসতে পারব; এবং তখন তার নখ-দাঁতের কথা আমার মনে থাকবে না।

সাধারণভাবে ইয়াহু জাতির সঙ্গে মিলেমিশে থাকাটা আমার পক্ষে খুব শক্ত হবে না, কারণ প্রকৃতি তাদের যেসব পাপ ও ত্রুটি দিয়েছে, তারা সেগুলি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। উকিল, পকেটমার, কর্ণেল, বোকা, লর্ড, জুয়াড়ী, রাজনীতিক, লম্পট, চিকিৎসক, জাল সাক্ষী, অ্যাটর্নি, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি ইয়াহুদের দেখলে

আমার বিন্দুমাত্রও চিত্তচাঞ্চল্য হয় না। এদের চরিত্র অনুযায়ী এদের জীবন গঠিত। কিন্তু যখন আমি বিকৃত-বিকলাঙ্গ বা দেহে-মনে রোগাক্রান্ত অথচ গর্বিত কাউকে দেখি, সঙ্গে সঙ্গে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। এই রকম একটা জন্তু ও এই রকম একটা পাপ কি ক'রে একসঙ্গে থাকে তাও আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। একটি বিচারবুদ্ধিশীল প্রাণীর যা কিছু গুণ থাকা উচিত, জ্ঞানী ও সচ্চরিত্র হুঁইনহমদের তার প্রত্যেকটি আছে। কিন্তু তাদের ভাষায় এই পাপকে বোঝাবার মতো কোন শব্দ নেই। প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ সম্পর্কিত কোন শব্দই তাদের ভাষায় নেই, শুধু ইয়াহুদের ঘৃণ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া। এই জন্য তারা 'গর্ব' শব্দটির অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারে না, কারণ মানবজাতির চরিত্র তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বোঝে না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আরো বেশি হওয়ায়, বন্য ইয়াহুদের মধ্যেও আমি গর্বের মূল লক্ষ্য করেছিলাম।

কিন্তু হুঁইনহমরা বাস করে বিচারবুদ্ধির অধীনে এবং সেই জন্য তারা নিজেদের অসাধারণ গুণগুলির জন্য আদৌ গর্বিত বোধ করে না। আমি এই বিষয়টি নিয়ে অনেক কিছু বললাম; কারণ আমার ইচ্ছে আছে যে ইংরেজ ইয়াহুদের সমাজটিকে অন্ততঃ কিছুটা সমর্থনযোগ্য করে তুলতে পারব। সেইজন্য এই 'গর্ব' যাদের মধ্যে আছে, তাদের আমি অনুরোধ করছি তারা যেন আমার চোখের সামনে না আসে।

॥ সমাপ্ত ॥